সংকলিত সমর সেন

স ম্পা দ না

সব্যসাচী দেব
সোমেশ চট্টোপাধ্যায়

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ —১৩৫৭

মুদ্রক ঃ
শ্রীরণজিৎ সামুই
বাণী-শ্রী প্রিণ্টার্স
৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

স্বীকৃতি

এই সংকলন সমর সেনের ছড়িয়ে-থাকা নানা রচনাকে একজায়গায় আনার একটি প্রয়াসমাত্র ; তাঁর অন্য যে-সব বই পূর্বেই প্রকাশিত, তার সঙ্গে এই বই একটি সংযোজন, ভবিষ্যতে এইসব রচনাগুলি মিলে হয়ত তৈরি হতে পারবে সমর সেন সমগ্র।

ছড়ানো কবিতা অংশের কয়েকটি লেখা ইতিপূর্বে অন্যান্য বই-এ প্রকাশিত হলেও এখানে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হলো সমর সেনের সব কবিতাকে একজায়গায় আনার প্রয়াসের অংশ হিশেবেই। 'অন্যভাষার কবিতা' বিভাগের অনুবাদ-কবিতাগুলিও সেই পরিকল্পনারই অন্তর্গত। এর ফলে সমর সেনের যাবতীয় কবিতাই এখন পাঠকের সামনে উপস্থিত করা গেল, এমন আশা করা যাচ্ছে, যদিও এখানে-ওখানে দু-একটি লেখা ছড়িয়ে থাকতেই পারে ; সে-সম্ভাবনার কথা আমরা মনে রাখছি। এই সম্পূর্ণতার সন্ধানেই সমর সেনের নিজের করা কবিতার ইংরেজি অনুবাদও এখানে রাখা হলো।

শুধু জীবিকার দায়েই সমর সেন যে অজস্র গল্প-উপন্যাস অনুবাদ করেছিলেন, তা কোনো সংকলনে আনা সম্ভব নয়, এখানে তিনটি গল্প রাখা হলো 'অন্যদেশের গল্প' বিভাগে শুধু অনুবাদক সমর সেনের কিছুটা পরিচয় বোঝার জন্য।

কবিতা-বিষয়ে মাত্র তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন সমর সেন, কবিতাভাবনা অংশে রইল সে-লেখাগুলি। পরবর্তীকালে সাংবাদিকতার সূত্রে প্রধানত ইংরেজিতে নানাধরনের লেখা লিখলেও, তারি ফাঁকে অল্প-কয়েকটি বাংলা লেখাও লিখে-ছিলেন তিনি, তার প্রায় সবই ইতিমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অন্য গ্রন্থে। বাকি কয়েকটি রইল এখানে, 'নানালেখা' পর্বে ; তাদের বিষয়ে বৈচিত্র্য থাকলেও, প্রায় সব লেখাতেই আসছে শিল্পসাহিত্যের কথা, 'মস্কোর জীবন'-এ তিনি মনে করান রুশ কবিতা বা ব্যালের কথা, 'প্রসঙ্গ কলকাতা'য় এসে যায় চলচ্চিত্র, নাটক বা লিটল ম্যাগাজিনের কথা।

গ্রন্থ-সমালোচনাগুলি সংকলনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ নীতি অনুসৃত হয়েছে। স্বতন্ত্র লেখাগুলিকে এখানে একসঙ্গে বাঁধার চেষ্টা করা হয়েছে, তাদের বিষয় ও ভাবনার ঐক্যের উপর নির্ভর করেই। স্বাভাবিক ভাবেই এর ফলে লেখাগুলিকে কালানুক্রমে বিন্যস্ত করা যায় নি ; দু-একটি লেখায় বিষয়ের বৈচিত্র্য রয়ে গেছে,

তার কারণ কখনো-কখনো লেখক বিভিন্ন ধরনের বই একসঙ্গে আলোচনা করেছেন, তাদের বিচ্ছিন্ন করা চলে না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সম্রাট' কাব্যের আলোচনাকে 'গ্রন্থ-সমালোচনা' বিভাগে না-রেখে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে পরিশিষ্ট ২-এ, কেননা এটি সমর সেনের একক রচনা নয়।

সমর সেনের ইংরেজি রচনার একটি সংকলন প্রকাশের পরিকল্পনা আছে; তবু সেই ঈষৎ-দূরের সম্ভাব্য সংকলনটির জন্য অপেক্ষা করেও কয়েকটি লেখা এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হলো, এ-বইয়ের মূল গদ্যরচনাগুলির সঙ্গে তাদের বিষয় ও ভাবনাগত সামীপ্য ও সংযোগের জন্যই।

জীবিকার দায়ে যে-সব গল্প, উপন্যাস অনুবাদ করেছিলেন সমর সেন, তার অনেকগুলিতেই ছিল কবিতা বা গান, বা তাদের ছিন্ন চরণ। এই অংশগুলি কবি অনুবাদ করেছিলেন বাধ্য হয়েই, কোনো ব্যক্তিগত ভালো-লাগার দাবিতে নয়। এর অনেকগুলিই তাঁর নিজের কবিতার ধরনের বিপরীত, এই বাধ্যতা ও বৈপরীত্যের চাপে কী-ভাবে কাজ করে সমর সেনের কবিস্বভাব, বিশেষত কবিতা-লেখা ছেড়ে দেওয়ার পরে—তারি একটি পরিচয় পাওয়ার চেষ্টায় সেই টুকরো অংশগুলিকে রাখা হলো পরিশিষ্ট ১-এ।

পরিশিষ্ট ৩-এ রইল সরোজ দত্তর অতি বিখ্যাত রচনাটি—এ-সংকলনের একটি লেখা তৈরি হয়েছিল এই রচনাটির উত্তরে, দ্বিতীয় একটি লেখাতেও আছে এই রচনাটির উল্লেখ, সেই প্রাসঙ্গিকতার দাবিতেই রচনাটি এখানে উদ্ধৃত হলো।

'রচনাপরিচয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য' বিভাগে এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি রচনা সম্পর্কে তথ্য জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে, অসম্পূর্ণতার সম্ভাবনা যদিও থেকে যায়ই।

নানাজনের সহযোগিতা ছাড়া এমন-একটি সংকলন প্রস্তুত করা সম্ভব হতো না কোনোমতেই। বই ও পত্রিকার জন্য যোগাযোগ করতে হয়েছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, আনন্দবাজার পত্রিকা ও শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থাগারে, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরিতে—এইসব গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। লেখা কপি করে দিয়ে বা অন্যভাবে সাহায্য করেছেন সোমা মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ ঘোষ, রঞ্জিত সাহা, সন্দীপ দত্ত—তাঁরাও আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। নানাভাবে দায়িত্ব নিয়ে সহায়তা করেছেন রত্না দাশগুপ্ত, তাঁর সঙ্গে আমার যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, তাতে কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন ওঠে না। আর প্রস্তুতি থেকে মুদ্রণ-সমাপ্তি, সব স্তরেই যার নিরন্তর পরিশ্রম ছাড়া এ-সংকলন সম্ভব হতো না, সেই সমীর রায় আমাদের আপনজন। এই বই যে প্রকাশিত হচ্ছে, তার পিছনে টেক্‌নোপ্রিণ্টের কর্মীদের ও অরিজিৎ কুমার-এর ভূমিকাও অনেকখানি। প্রচ্ছদ ও ফটো মুদ্রণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিদ্যুৎ ব্যানার্জি, তাঁকেও এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জানাই।

দে'জ পাবলিশিং-এর সুধাংশুশেখর দে ও সুবীর ভট্টাচার্য এবং সিগনেট

প্রেসের নন্দিনী গুপ্ত ও নীলাক্ষ গুপ্ত তাঁদের প্রকাশনার দুটি বই থেকে কয়েকটি লেখা এখানে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দিয়েছেন—তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করতে চাই না।

এই সংকলনে ব্যবহৃত সমর সেনের ফটোটির শিল্পী সুনীল জানা—তিনি সমর সেনের বন্ধু।

আর শঙ্খ ঘোষ বই দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন, শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-ভবন গ্রন্থাগার থেকে লেখা কপি করে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এই সংকলনের ব্যাপারে যখনি চেয়েছি সাগ্রহে পরামর্শ দিয়েছেন—তাঁর নানাবিধ ব্যস্ততার মাঝেও যে এ-ভাবে নানা দাবি নিয়ে অসংকোচে গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি তাঁর কাছে, সে শুধু তিনি আমার শিক্ষক বলেই।

স. দ.

সমর সেন : ধ্রুপদী শান্তিকে প্রত্যাখ্যান

'বাবু বৃত্তান্ত'-এ জানিয়েছিলেন সমর সেন, শুরুর সেই দিনগুলিতে বুদ্ধদেব বসুর পরামর্শে কী-ভাবে সরে এসেছিলেন কবিতার প্রচলিত প্রকরণ থেকে, আর অনেকদিন পরে কবিতা প্রসঙ্গে জানিয়ে দিলেন তিনি—"it no longer rings a bell in me". টলমলে ছন্দের হাত ছেড়ে তিনি তৈরি করে নিয়েছিলেন এক নিঃশব্দতার ছন্দ, আর প্রতিষ্ঠার চূড়ান্তক্ষণেই ছেড়ে এসেছিলেন কবিতাকে, এ-সব তথ্য আজ জানা হয়ে যায় বাংলা কবিতার মনোযোগী পাঠকের। কিন্তু যতটা সহজে তিনি কবিতাকে ছেড়েছেন বলে মনে হয়, কবিতা কি অত সহজেই ছেড়েছিল তাঁকে! ১৯৪৬ পর্যন্ত ছিল তাঁর কবিতালেখার আয়ু, এ-কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, তারপরেও কখনো কখনো ঝলসে উঠেছে একটি-দুটি কবিতা; ১৯৭৭-এ অবশ্য একটি লেখায় কৌতুক করেছেন এই বলে—"সম্প্রতি পুরনো কবিতার কিছু কিছু পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে বলে দুশ্চিন্তায় আছি। এ-বয়সে কবিতার ব্যামো আবার ধরবে না তো?" তবু মানতেই হয়, তৃপ্তি ছিল না তাঁর, যেন-বা তিনি বুঝেছিলেন সময় হয়ে উঠছে কবিতার অন্তরায়।

সাহিত্যের সঙ্গেই শিথিল হয়ে আসছিল তাঁর সংযোগ। কবিতা থেকে সরে এসে বেশ-কিছুদিন ব্যস্ত ছিলেন সাহিত্যজগতেই, কিন্তু তা কোনো শৈল্পিক আকর্ষণে নয়। কৈশোরে তাঁদের বাড়ির অতিথি উইলিয়াম অ্যালেনের পরামর্শে ভান লুনের Ancient Man অনুবাদ করেছিলেন, টাকাও পেয়েছিলেন তার জন্য, পরে গোর্কির মাদার অনুবাদ করায় উৎসাহ থাকলেও করেন নি; কিন্তু এ-সবই তো অল্পবয়সের খেয়াল, আর "তখন কে জানত বহুবছর পরে মস্কোয় গিয়ে রুশ বই-এর অনুবাদ করতে হবে।" সেই কাজ যখন তাঁকে করতে হয়, তাতে ছিল না কোনো বিশেষ উৎসাহ, সে ছিল শুধুই জীবিকা; যে-কটি কবিতা পরে অনুবাদ করেছিলেন সমর সেন, তাও বিশেষ উপলক্ষে বা পরিচিতজনের অনুরোধে।

সাহিত্য থেকে তাঁর মনোযোগ সরে গিয়েছিল অন্যত্র। নানা কারণ ছিল তার, তবে একটি কারণ তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না তিনি। তৃপ্তি যে ছিল না, এ-কথা অবশ্য বারবারই নানা উচ্চারণে জানিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি। আবেগের তরলতায় নিজেকে ভাসিয়ে-দেওয়ায় সায় ছিল না তাঁর, কিন্তু শুধু যুক্তির স্তরে-স্তরেই তৈরি হবে কবিতার জগৎ, এমন ভাবনাও তো অযৌক্তিক, নিশ্চয়ই সমর সেন মানতে পারেন না সেই ভাবনা। ফলে কবিতা সম্পর্কে বারেবারেই তিনি জানিয়ে দেন তাঁর সংশয়, কিছু-বা ক্ষোভ আর দুশ্চিন্তার কথা। বস্তুত তাঁর নিজের কবিতা

আর কবিতা-বিষয়ে তাঁর রচনাগুলি পাশাপাশি রেখে পড়লে আমরা টের পাই সমর সেন যাচাই করে নিতে চাইছেন বাংলা কবিতার জগৎকে; আর যে-আত্মসচেতনতা তাঁর বড়ো বৈশিষ্ট্য, তারি সুবাদে তিনি তো জানতেনই বাংলা কবিতা সম্পর্কে যা-কিছু তিনি বলতে চান, তা বলতে হবে তাঁর নিজের কবিতা সম্পর্কেও। আত্মসচেতন, কিন্তু সেইসঙ্গেই নির্মোহ—তবু বাংলা কবিতায় যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছেন তিনি, এ-সত্যটি তাঁর অজানা ছিল না কোনোমতেই। নিজের কথা বলতে না-চাইলেও তাঁর কবিতায় অনেকসময়েই শোনা গেছে যেন এক-আত্মসমালোচনা, অগ্রজ বা নতুন কবিদের কাব্য-আলোচনার সময়ও সেই সমালোচনায় নিজেকেও যেন উদ্দিষ্ট করে তোলেন তিনি; আর কোনো-কোনো লেখায় তা যেন মনে পড়িয়ে দেয় ইতিহাসেরই কৌতুককে। পরবর্তীকালে অরুণকুমার সরকারের মতো কবিও অভিযোগ তুলেছিলেন যে সমর সেনের কবিতা রুদ্ধরতির কবিতা। কিরণশংকর সেনগুপ্ত আর মণীন্দ্র রায়ের কাব্য-আলোচনায় সমর সেনও জানিয়েছিলেন এই কথা, যদিও তাঁর বলায় অভিযোগ ততটা নয়, কিছুটা পরিহাসই ছিল বরং, কিন্তু খুব যেন সম্মতি ছিল না। অবশ্য বলার ধরনের উপর খুব জোর দিয়েছিলেন তিনি, সংগত কারণেই। কিন্তু শুধুই কি প্রকাশভঙ্গি! সমর সেনের কবিতার জগৎ ছিল মননজাত অভিজ্ঞতার, কিন্তু অনুভবের শিহরণ ছাড়া এই অভিজ্ঞতা কী করে স্পন্দিত হয়ে ওঠে, আর পূর্ণতায় পৌঁছয়! অনুভবের শিহরণ তো ব্যক্তিহৃদয়েই, কিন্তু সে কোন ব্যক্তি! সে তো সমাজ আর ইতিহাস-সম্পৃক্ত মানুষ। এই মানুষকে জানতে গিয়ে সমর সেন জেনেছিলেন চারপাশের পরিবেশকে, সমাজকে, ইতিহাসকে—বিবর্তনকে আর ভবিষ্যৎকে। তাই চারপাশের সংকটের নানা ছায়াকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। বরং মনে রেখেছেন এ থেকে মুখ ঘুরিয়ে কোনো অলীক স্বর্গের আশা আসলে বড়ো-এক ভ্রান্তি, প্রয়োজন এই সংকটের ছায়াকে জেনে-নেওয়া। এ-ভ্রান্তি তাঁর চোখে পড়েছিল কোনো-কোনো লেখায়, অগ্রজ কবিদের সেইসব রচনা নিয়ে যখন আপত্তি জানাচ্ছিলেন সমর সেন, তিনি যেন একটু সতর্ক করে দিচ্ছিলেন নিজেকেও।

সতর্কতা-সত্ত্বেও মানতে হয়, কাজটি কঠিন ছিল। বাংলা কবিতার ঐতিহ্যে একটা ধারায় ছিল তারল্যের টান, সে-টানকে এড়ানো সহজ ছিল না যেমন, আর কল্লোলীয় রোম্যান্টিকতা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল মধ্যশ্রেণীবিলাস, তেমনি যাঁরা বুদ্ধি দিয়ে চর্চা করতে চাইছিলেন কবিতার, যেন ঐ-রোমান্টিকতার বিপরীতে যাওয়ার প্রয়াসেই তাঁরা তৈরি করে নিতে চাইছিলেন এক মননের ঘেরাটোপ। সে-সম্ভাবনা কি সমর সেন নিজের কবিতাতেও লক্ষ করেছিলেন কখনো! সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনায় শ্রদ্ধাকে ক্ষুণ্ণ হতে না-দিয়েও যখন আপত্তি জানাচ্ছিলেন, বা বিষ্ণু দে-র কবিতায় খুঁজতে চাইছিলেন কিছুটা স্বস্তি, তখন অবক্ষয়ীদের সমর্থনে তাঁর লেখাটিরই এক যুক্তি তৈরি হয়, যদিও আপাতভাবে তাকে মনে হয় যেন বিপরীতে চলা।

বিপরীতযাত্রা নয়, এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এক দ্বান্দ্বিকতা। এ-দ্বান্দ্বিকতার ছাপ অবশ্য তাঁর কবিতাতেই বেশি, কেননা গদ্যে, প্রবন্ধে বা সমালোচনায় স্থির যুক্তির বিন্যাসে স্তরে-স্তরে নিজের উপলব্ধিকে ব্যক্ত করা সম্ভব হয়েছিল, কবিতায় সেই যুক্তির নিতান্ত কেজো চেহারাটিকে সরিয়ে রাখার দায় ছিল, প্রয়োজন ছিল ভিতরে ভিতরে যুক্তির ভিৎ গড়ে নেওয়া, তরল ভাবালুতার টান সামলে শক্ত হয়ে দাঁড়ানো। এই কাজটি কঠিন, কিন্তু বড়ো-কোনো শিল্পীকেই তো দাঁড়াতে হয় এ-সব কঠিন পরীক্ষার সামনে। কবিতায় নিজের সঙ্গে এই বোঝাপড়া করছিলেন সমর সেন, আর গদ্যে, প্রবন্ধে বা সমালোচনায় নিজেকেই যেন যাচাই করে নিচ্ছিলেন। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল তাঁর ধারণা।

এই স্পষ্টতার এক পরিচয় রাখা আছে তাঁর ইংরেজি সাহিত্যের আলোচনায়; বিশশতকের প্রথমার্ধের ইংরেজিভাষার লেখকরা নানাভাবে ও ধরনে আলোড়ন তুলেছিলেন চিন্তাজগতে—তা সম্ভব হয়েছিল কেননা তাঁদের ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সমাজ, ইতিহাস ও পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সচেতনতা। এইসব সাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে যখন আলোচনা করেন সমর সেন, তখন এই উৎসাহের কারণ নিশ্চয়ই এ নয় যে তিনি নিজে ছিলেন ইংরেজির ছাত্র—বরং এখানে কিছুটা থাকে উপনিবেশের দায়ভাগ। এ-লেখাগুলি যখন লিখছিলেন সমর সেন, তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি তো ছিলই, তার আগে থেকেই ইংরেজিই হয়ে উঠেছিল শিক্ষিতজনের ভাষা, অন্যদিকে এ-ভাষার সূত্রেই মূলত যোগ ছিল বহির্জগতের সঙ্গে, তাই সে-ভাষার চিন্তাজগৎকে যাচাই করে নেওয়ার তাড়না স্বাভাবিক। ইয়েট্‌স বা এলিয়ট এজরা-পাউণ্ড. অডেন-স্পেণ্ডার বা হার্টক্রেন বা কডওয়েলের লেখা. তা কবিতা, নাটক বা প্রবন্ধ যাই হোক-না-কেন, যখন আলোচনা করেন সমর সেন, তখন চেনা যায় ইংরেজিভাষী পৃথিবী আর সেই সুবাদেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে। তেমনি বোঝা যায় সমর সেন কী-ভাবে পৌঁছে যাচ্ছেন একটি নির্দিষ্ট উপলব্ধিতে, সেই উপলব্ধির আলোতেই তিনি দেখে নিতে চাইছেন স্বদেশ ও দূরদেশের সাহিত্যকে। এ-কাজটি সহজ নয়, সেই অ-সহজ দায়িত্ব পালনে সমর সেন যে আগ্রহী হতে পেরে ছিলেন, তার কারণ রাজনীতির প্রসঙ্গকে তিনি সরিয়ে রাখেন নি। এজরা পাউণ্ড বা কডওয়েলের সাহিত্যভাবনার পাশেই তিনি যাচাই করে নিতে চান স্পেণ্ডার-কথিত রাজনীতির ভাবনাচিন্তা, মূলত বুদ্ধিজীবীদের ধারণার সূত্রে হলেও তিনি বিচার করতে চান বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার যৌক্তিকতা ও ফাঁকিকে।

সমর সেনের গ্রন্থ-সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা মনে রাখতে পারি এই তথ্য যে 'পরিচয়' পত্রিকায় তিনি আলোচনা করেছিলেন বিদেশি বই নিয়েই, একটি শুধু ব্যতিক্রম; আর 'কবিতা' পত্রিকায় আলোচিত বইগুলি ছিল প্রধানত বাংলা-ভাষায় রচিত, বিশেষ করে কবিতার বই—দু-একটি ইংরেজিভাষার বই-ও

ভারতীয় জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ থেকে যেমন বেরিয়ে আসে সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়' ও বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা'-র স্বতন্ত্র চারিত্র্য, তেমনি এই দুই পত্রিকায় সমর সেনের বিচরণ যেন মনে করিয়ে দেয় তাঁর সেই ব্রতকেই, আবেগ ও বুদ্ধির যে-সমন্বয়ের কথা তিনি জানান বারেবারেই। এই দুই পত্রিকা ও তাদের প্রধান পুরুষদের ঘিরে যে-জগৎ, তার স্বাতন্ত্র্য অবশ্য সমর সেন মনে করিয়ে দিয়েছিলেন অন্যভাবে—"...সুধীন দত্তের বাড়িতে 'পরিচয়'-এর আড্ডা। অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি আসতেন, বিভিন্ন মতামত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হতো।...এককোণে বিজ্ঞের মতো বসে বোঝার চেষ্টা করতাম, জাতে ওঠার চেষ্টায়।...বুদ্ধদেববাবুর 'কবিতা' আড্ডা ছিল অন্যধরনের, অনেক-বেশি ঘরোয়া, তাত্ত্বিক আলোচনা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না।"

আসলে সমর সেন স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছিলেন এক দায়। প্রতিমুহূর্তে নিজেকেই তিনি বাঁধতে চাইছিলেন সংযম আর কাঠিন্যে, তা শুধু এই কারণেই যে নিজের বিশ্বাসকেও তিনি পরিণত করতে চান নি ভক্তিমার্গীর আবেশে, সংশয় আর প্রশ্ন দিয়ে চিহ্নিত করতে চাইছিলেন পথ। অবশ্য কখনো আমাদের মনে হতে পারে সংশয় যেন একটু বেশিই। তাই কি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সমালোচনায় কিছুটা আপত্তি জানান জীবনানন্দের জগৎ সম্পর্কে, তার কিছুদিন পরে 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'-এর মতো মঞ্চ থেকেই ঘোষণা করেন অবক্ষয়ের চেতনাও যে একটা শক্তি সেই কথা।

অন্য-কোনো সংশয়ও কি তৈরি হয়েছিল তাঁর মনে, কিছুদিন পরে! এলিয়টের উৎসাহ তাঁর সাহিত্যভাবনাকে গড়ে তোলায় সাহায্য করেছিল, এলিয়টের ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতনতা সত্ত্বেও। কিন্তু একসময় কি তাঁর মনে হয়েছিল আমাদের সাহিত্য আধুনিকতার সন্ধানে যাত্রা করে হারিয়ে ফেলেছে তার শিকড়! অচেনা শস্যের সম্ভারে তৃপ্তি পান নি তিনি, এই অচেনা শস্য তাঁকে দেয় নি কোনো কীট্‌সীয় বেদনার স্পর্শও। বেশ-কিছুদিন পরের কথা অবশ্য এই উপলব্ধি। কিন্তু প্রথমাবধি সমর সেন তাঁর কবিতার মতোই সংশয় আর প্রশ্নে বিদ্ধ হতে-হতে পৌঁছতে চাইছিলেন এক প্রত্যয়ে, কিন্তু সেইসঙ্গে মনে রাখছিলেন একটি সীমার কথা. যে-সীমাকে কোনো আবেগবিহ্বল আশাবাদ দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া চলে না; সে-কারণেই 'বাঙাল যৌবনের গান' কে পিছনে রেখে তিনি যে সরে আসেন অন্য-এক জগতে, সে-জগৎ ধূসর নয়, কিন্তু কবিতা যে সেখানে তাঁর সঙ্গী হতে পারে না, তা কি শুধুই তাঁর নিজের ছক মেলাতে না-পারার সংকট! অরুণ মিত্র অবশ্য মনে করিয়ে দিয়েছেন যে ছক ও পুনরাবৃত্তির প্রবণতা দেখা দিচ্ছিল তাঁর কবিতায় 'কবিতার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তা থেকে বেরিয়ে আসতে তিনি পারছিলেন না যেন। এ-অবস্থায় কবিতাকে বিসর্জন দেওয়া তাঁর মতো মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।" গোষ্ঠী থেকে সমাজে বেরনোর তাগিদ তিনি দেখেছিলেন একসময়ের বাংলা

কবিতায়, তার অল্প-কিছুকাল পরেই যে তাঁকে ভাবতে হলো এ-সবই অচেনা ফসল, তাতে ধরা পড়ে বাংলা কবিতারই এক সংকট ; আর আমাদের মনে রাখতে হয় কবিতা লিখুন-বা-না-লিখুন, বাংলা কবিতার সংকটকে সমর সেন বারেবারেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, আর সে-চিহ্নিতকরণ কোনো বিমূর্ত শৈল্পিক ধারণা থেকে নয়, সমাজ ও শিল্পের সংযোগকে মনে রেখেই। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার সচেতনতার কথা মনে রেখেও তিনি জানিয়ে দেন ব্যর্থতাবোধ বেদনাবোধ দ্বারা সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন ; বিপরীতে আস্থা রেখেছিলেন বিষ্ণু দে-র উপর, সেই বিষ্ণু দে চারপাশের অগ্নিচক্রকে এড়িয়ে কী-করে পৌঁছে গেলেন স্থিরকেন্দ্রের সমাহিত শান্তিতে—এ-কথা ভেবেও বিস্মিত হন তিনি। আবার রাজনীতিতে আস্থা রেখেও রাজনৈতিক উচ্চরবকে কবিতা বলে মেনে নিতে রাজি হন নি, আপত্তি জানিয়েছেন, যদিও সে-আপত্তি, ঈষৎ-পরিহাসে মনে করিয়ে দিয়েছেন, "we call it self-criticism".

'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় লিখেছিলেন 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা'—এই নাম-করণেই অবশ্য সমর সেন অনেকটা বেঁধে নিয়েছিলেন তার পরিধি, যদিও সেই সাম্প্রতিকের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ ছিল না আর। 'কবিতা' পত্রিকায় 'বাংলা কবিতা' লিখেছিলেন যখন, সে বাংলা কবিতার তিনি ছিলেন অন্যতম স্রষ্টা, আর 'অগ্রণী'-র পাতায় অতি-আধুনিক বাংলা কবিতা ছিল অভিযুক্ত ও আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর জবানবন্দী, যদিও 'অতি-আধুনিক' বিশেষণটি তাঁর নির্বাচন নয়। সাম্প্রতিকের দিকে তাকিয়ে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন বুদ্ধি আর আবেগের সমন্বয়ই কবিতার উৎস, তার কয়েকবছর পরেই সেই পত্রিকাতেই সেকালীন তরুণ কবি তাঁর কবিতালেখা ছেড়ে দেওয়া নিয়ে ঈষৎ অনুযোগ জানিয়েছিলেন "…তখন ভাবি নি / তুমি নিজেই কোনোদিন / সত্যেন দত্তর মতো নির্ভেজাল মাত্রাবৃত্ত কিংবা ত্রিপদী হয়ে যাবে ! /·· এদিকে কলকাতার শো-কেসে তোমার মরামুখ দেখে প্রত্যহ / আড়চোখে তোমার সহযাত্রীরা।" তাতে কি ছিল অনুজের ঈষৎ কৌতুকও ! এই অনুজেরা যে কবিতা লিখছিলেন তখন, তাতে সমর সেনের খুব-একটা উৎসাহী হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। এঁদেরি সমবয়সী আরেক কবি বেশ-কিছুদিন পরে যেন কবিতাকেই বাতিল করে জানিয়ে দেন "কী হবে আর পাতা উল্টে শঙ্খ ঘোষ বা হার্ট ক্রেনের ? /…এখন শুধু গদ্য পড়ি ফ্রন্টিয়ারে / সমর সেনের।" এতে অবশ্য প্রতিষ্ঠিত হয় সমর সেনেরই এক অনন্য পরিচয়, যদিও সে-গদ্য তো ইংরেজিভাষায় লেখা। চকিতে কি আমাদের মনে পড়বে, সমর সেন তাঁর কবিতালেখা শুরুর দিনে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন ; তাতে ছিল সম্ভবত ইংরেজিভাষায় তাঁর বিস্ময়কর দখলেরই টান, বুদ্ধদেব বসুর কবিতার ভুবনের সমীপবর্তীও তিনি ছিলেন না মনে হয়। সমর সেন যে শেষ পর্যন্ত প্রায় নিয়মিতভাবে লিখে গেলেন সাংবাদিক গদ্য, ইংরেজিতেই, তাতে ছিল না কোনো তরুণ বয়সের উত্তেজিত প্রগল্‌ভতা, বরং এ-

দেশে ইংরেজিকেই মতপ্রকাশের বাহন করতে হওয়ায় কিছুটা যন্ত্রণার চাপ ছিল সম্ভবত ; নাকি এ হলো, মহাশ্বেতা দেবী যা বলেছেন, সেই 'অ্যাবসার্ড বাস্তবতা'। টুকরো কিছু লেখা অবশ্য রইল বাংলাতেই, বড়োই বিক্ষিপ্ত সে-সব রচনা, যেন-বা অবসরের খেয়াল।

কবিতায় ফেরেন নি সমর সেন, ফেরার প্রয়োজনও মনে করেন নি। তার থেকে অনেক জরুরি ছিল তাঁর কাছে 'নাও' বা 'ফ্রন্টিয়ার', আর চারপাশের মলিন দৃশ্যা-বলির দিকে তাকিয়ে আমরাও টের পাই সমর সেনের এই শেষ বছরগুলি কত জরুরি ছিল এ-দেশের পক্ষে। "আমাদের এই দুঃখ রয়ে গেল যে, তিনি নতুন স্বরবিস্তারে আর অগ্রসর হলেন না, বরণ করলেন নীরবতা।"—তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে বলেছেন অরুণ মিত্র। এই দুঃখবোধের শরিক হয়েও আমরা জেনে নিই এই সত্য যা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ—"ঝড়ের যে নিঃশব্দ সঞ্চরণের কথা ছিল প্রথম কবিতার বইতে, শব্দের তীব্র আঘাতের যে-প্রতীক্ষা ছিল, তার একটা সাময়িক আসন্নতা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁর চারপাশে, সত্তরের দশকের উদ্‌বেলতায়। কবিতার জগৎ থেকে নিঃশব্দে সরে গিয়ে এই উদ্‌বেলতার সঙ্গে যে-ভাবে নিজেকে তিনি মিলিয়েছিলেন, তাকে বলা যায় এক সৃষ্টিরই জগৎ, সংঘাতের আন্দোলনের উদ্দীপনার সৃষ্টি।···তাই কবিতার জগতে তাঁর দীর্ঘকালীন নীরবতার মধ্যেও একটা ছন্দ থেকে যায়, পুনর্নির্মাণের সেই ছন্দ···।" এ-ছন্দ যে থেকে যায়, তার কারণ একটিই, কোনো ধ্রুপদী শান্তির সমাধিতে কখনো আশ্রয় খোঁজেন নি সমর সেন, কেবলই মনে রেখেছেন যাত্রার কথা—স্বপ্নে, দুঃস্বপ্নে, আবার স্বপ্নে।

সব্যসাচী দেব।

সূচি

ছড়ানো কবিতা

তুমি ও আমি

তুমি বসে আছ,
বসে আছ স্তব্ধভাবে আমার পাশে ।
আমি বসে আছি,
রক্ত মোর কাঁপিছে উল্লাসে ।

তুমি বসে আছ,
তোমার দুইচোখে জাগে রাত্রির ভালোবাসা ।
আমি বসে আছি,
আমার চোখে কাঁপে প্রভাতের বক্তিম আশা ।

চক্রান্ত

আবাব সে-স্তব্ধতা কেটে যায়
সকালে মোটাবেব শব্দে ক্ষুরধার হাওয়ায় ;
যমুনার জলে স্নান করে ফেবে
দেহাতি মেযে
পাখা থেকে জল ঝাড়ে কোমল চড়াই ।

কালেব চক্রান্তে সন্ধ্যা নামে
পোড়োবাড়িতে কাকের ভিড় কমে এল,
ঘুম থেকে ছায়ারা উঠে আসে, ভীরু তাদের পদধ্বনি
হৃৎপিণ্ডে উৎকণ্ঠা হানে ।
স্তবে স্তরে সারাবাত্রি জমে
অতীতকালেব স্তব্ধতা,
আমাদের পাপী মনে সে-স্তব্ধতা
দুঃস্বপ্ন রচে,
গলিত শবের সান্নিধ্যে আমাদের আনে,
জীবনের শেষপ্রান্তে করাল শূন্যের পারে আনে ।

দুর্দিন

এরা কারা? কেন এত সশস্ত্র ঠাট? কী মতলব?
কেন আমাদের শহরে-গ্রামে জমে অনেকের ছিন্নভিন্ন শব;
বহুদেশ থেকে বিদ্যুৎগতিতে হটে
এ নিরস্ত্র দেশে বীরদল বেড়ায় দাপটে।
শ্মশানে লাশ এনে খুনিরা বেইমান
তুড়ি মেরে আজো করে সভ্যতার গুণগান।

ইঁদুরকলে দেখেছি তুচ্ছ জানোয়ার,
আসন্ন মৃত্যুর ছায়া মুখে, চোখে ভয়ের বিকার,
মরণকামড়ে উদ্যত তুচ্ছ জানোয়ার
বারেবারে মনে পড়ে এ-দুর্দিনে আবার

লবেজান সামুরাই
আমাদের হাত থেকে পাবে না রেহাই
হিটলার, টোজোর এ গুপ্ত জাতভাই।

লোকের হাটে

১
আবার এসেছে আষাঢ়; জলস্রোতে ঘোলাটে হলুদ রং,
রাশিরাশি আবর্জনা
অন্ধবেগে, ঘূর্ণিপাকে সাগরসঙ্গমে যাত্রী,
বন্যমহিষের আক্রোশে জগদ্দল মেঘ ঘনঘন ডাকে।

২
হে শহর, বিষণ্ণ শহর!
সূর্য অস্ত গেলে,
কোনো-কোনো পথে
ছায়া পড়ে মন্থর উটের,
মরুভূমির ক্লান্তি গায়ে লাগে
হে শহর, বিষণ্ণ শহর!

গোধূলি-প্রান্তরে লেখা কঠিন জিজ্ঞাসা :
শেষদিনে কোনখানে তোমাদের বাসা ?
তরল যৌবন ফিকে হয়ে আসে,
বিগতকৌতুক বিদূষক
কথার ঝলকে সভাভঙ্গ করে না গভীর রাত্রে।

৩

দূরে শুনি ঝড়ের ডাক ; উদ্‌ভ্রান্ত ঘরে ফেরে কাক.
পাখার শঙ্কিত শব্দ ; তারপর পৃথিবী নির্বাক।
স্তব্ধতা পাকে পাকে জমে ; সংহত শক্তির উত্তাপ,
বিস্ফোরক সম্ভাবনা !
কেটেছে দুবছর ; সীমান্তে শত্রুর ছায়া,
বর্গি আর বুলবুলে খেয়ে গেছে ধান,
ঘোর জ্বরে মন্বন্তরে কেটেছে দুবছর ;
এ-দুবছর
পুষ্টিহীন চালের ছলনায় জীর্ণ হিন্দুস্থান
দেখেছে ভূতের নাচ, শুনেছে শকুনগান।
আজ আবার জোয়ারি আবেগে ভরেছে মনের গাঙ,
সংহত শক্তির বেগ উচ্চকিত স্নায়ুশিরায়,
পুঞ্জীভূত অতিকায় ছায়া আশ্বিনের রৌদ্রে'হারায়।

৪

এ-কথা বলেছি আগে, আবার বলি :
আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত, কূপের মণ্ডুক,
ছাপোষা মানুষ,
দিনের বিস্বাদ মুখে রাত্রে বাড়ি ফিরি।
এ-কথা সর্বদা মনে রাখি,
কেননা আমার একান্ত কামনা
তিলকে তাল করার ভ্রান্তি পার হয়ে
আত্মকরুণার ক্লান্তি পার হয়ে
সহজ জীবনে সহজ বিশ্বাসে ফেরা।
এ-কামনা আছে বলে এখনো বাঁচোয়া,
এ-কামনা আছে বলে

এক-একদিন যন্ত্রসংগীতের শব্দ স্তব্ধতাকে ছিন্ন করে,
একান্ত সে-মুহূর্তে বুঝি :
জীবাণুর আর দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়ে যারা
বাংলাদেশে, উড়িষ্যায়, মালাবারে, উত্তর-বিহারে,
যারা লড়ে ইউগোস্লাভিয়ার বন্ধুর মারাঠি পাহাড়ে
রাশিয়ার রক্তমাটিতে, বেদনাহলুদ চীনে, ফ্রান্সের ফিনিক্স প্রান্তরে,
আমারি আত্মীয় তারা ;
ওরা যেখানে প্রাণ নেয়, সেখানে প্রাণের স্বাক্ষর,
যেখানে ওরা প্রাণ দেয়, সেখানে জীবন অমর।
ওদেরি বাহুবলে পাশব শত্রুরা পলাতক, ছত্রভঙ্গ,
যুদ্ধের দলিত রক্তাক্ত প্রান্তরে লোহিত পদ্মের গান !
শকুনি-চক্রান্ত শেষ, শঙ্কিত সঞ্জয়
বিবর্ণ প্রাসাদে ফিরে, সঞ্চিত স্বার্থের প্রতীক
লবেজান ধৃতরাষ্ট্রকে সভয়ে জানায়
পুনরুজ্জীবনের বার্তা সাধারণ লোকের।

৫

আশ্বিনের সোনালি রোদ্দুর
সঞ্জীবনী আশীর্বাদ।
বর্ষার স্তব্ধ ক্লান্তি ঝেড়ে
গাছেরা গাঢ় রং ধরে।
রমজানের শেষদিন আজ ; উৎসবের আগে যেন মনে রাখি :
আমাদের মতো সাধারণ লোক
আজ দেশে-দেশে
মুষ্টিবদ্ধ প্রতিজ্ঞায়, আত্মদানে, আপনজনের ক্ষয়ে
জীবনের বনিয়াদ গড়ে। যেন মনে রাখি
চল্লিশকোটি আমরা, বিরাট এ-দেশ, এখানে নোকরশাহির হবে শেষ
যদি বাজে রাম ও রাহমের কণ্ঠে আসমুদ্রহিমাচল গান
স্বাধীন হিন্দুস্থানে আজাদ পাকিস্তান।

৬

মাঠ ভেঙে এসো লোকের হাটে।
কাদার পিচ্ছিল বাধা, সাপের আদিম ভয়,

শূন্যগর্ভ আকাশের নিচে আদিগন্ত মাঠের দুঃস্বপ্ন
স্বপ্ন বলে ঠেকে লোকের হাটে। এখানে মন্থর ঠাটে,
প্রাণের অখণ্ড প্রতিজ্ঞা উদ্যত স্তনে,
হাল্কা হাতে সব্জি বেচে শ্যামল মেয়েরা।
নিকট দিগন্তে দেখি সূর্যাস্তের ধুম
এবার কাজের শেষে নিবিড় রাত্রির ঘুম।

৯ই আগস্ট ১৯৪৫

নিপ্পনের রক্তসন্ধ্যা, মেঘে-মেঘে ঘোর শব্দ!
উত্তরপূর্ব-এশিয়ার রুক্ষ প্রান্তরে
পিঙ্গল উটের দল মুখ তুলে শোনে;
মেঘে-মেঘে লাল ঝড়, বসন্তের বজ্রধ্বনি মাঞ্চুরিয়ায়,
আন্দোলিত মঙ্গোলীয় মরুভূমি ট্যাঙ্কের ঘর্ঘরে
প্রাচ্যের পীত দেহে সঞ্জীবনী রক্তের উদ্দাম জোয়ার।
...
সাম্রাজ্যের পতাকা উড্ডীন হিন্দুস্থানে, মেঘে-মেঘে কালো শব্দ;
এখানে রুগ্‌ণ শিশুর কান্নায়, উলঙ্গ নারীর লজ্জায়
গ্রামে-গ্রামে গুমোট কানাকানি,
ধূসর মাঠের পাশে ধূমায়িত নদীর রেখা।
এখানে পাহাড়ি কুয়াশায় বুঁদির কিল্লার যুদ্ধ শেষে
নেতারা যে যার শিবিরে প্রত্যাগত;
লাটের ভেল্‌কিতে পরম শত্রু আজ দোস্তে পরিণত,
স্বজন শত্রুতে;
এখানে রাজনীতি শুধু পরনিন্দা, পরচর্চা, বুড়োর ঝামেলা;
ইজ্জতের গোলাম যারা
একরোখা অন্ধ রাগে আত্মঘাতী যারা
এ-দুর্দিনে তাদেরি আসর, রাজনীতি তাদেরি পেশা।

আর মেঘে-মেঘে কালো শব্দ বাড়ে,
নদীর গেরুয়া বেগ আনে না ফসলের অগ্নিশিখা,
জলের উদ্দাম জোয়ার ঘোলাটে প্রলাপ,
মাঝে-মাঝে শুধু মাছের ঝলক।

ইলিশের স্বাদ কিন্তু ভুলেছে জেলেরা,
উলঙ্গ তাঁতিনীর লজ্জা মহাপ্রাণ মৃত্যু ঢাকে

জয় হিন্দ

দক্ষিণপূর্ব-এশিয়ায় মালিকেরা ফেব বেঁধেছে ঘাঁটি ,
বৈষ্ণবী বিনয়ে ইংরেজ বসেছে বর্মায়,
ফরাসিরা প্রত্যাগত ইন্দোচীনে,
গোলন্দাজহীন ওলন্দাজ ঘোরে যবদ্বীপে ।
ভারতের স্বাধীনতা আসন্নপ্রায় ।

বম্বেতে দিন রেখে গেল বারুদের গন্ধ,
রাস্তায় রক্তের ছিটে ।
বন্দুকের খর শব্দ থামলে শহরে
বিপ্লবী নেতারা জমে বক্তৃতার মাঠে,
সর্দারের ধমকে পার্কের রেলিং কাঁপে,
হয়ত কৃতপাপের লজ্জা জাগে
মর্গে-জমা দুশোসত্তরটা লাশে ।
ধোঁকায়-জব্দ জাহাজেরা বন্দরে স্তব্ধ,
মাঝে-মাঝে উদ্যত সঙিন, সাম্রাজ্যের উদ্ধত প্রতীক ।

আমাদের স্বাধীনতা আসন্নপ্রায়,
মন্ত্রীসভার বিলিতি দূতেরা আগতপ্রায়,
জয় হিন্দ ।

জন্মদিনে

১

আবার ফেরাও সহজ শহরে
যেখানে দশটা-পাঁচটার পর
ক্লান্ত লোকেরা অন্তত নিঃশঙ্ক বাড়ি ফেরে ;
সূর্যাস্তের সিঁদুর পশ্চিমে,

ঘরে-ঘরে গৃহিণীরা গা ধোয়,
আর গা-ঢাকা অন্ধকারে ঘরছাড়া বাবুরা
চকিতে বেপাড়ায় ঢোকে।
...
পুরনোদিন ফেরে না কোনোদিন
আকাশের দিকে তাকাই,
আগুনের গোলা যেখানে
আপনমনে জ্বলে ;
ধুলো ওড়ে, নেড়া বট মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে
গতপত্র ক্লান্ত ভঙ্গিতে।
গাছের যৌবন তবু প্রতিবছরে ফেরে
আমরা ক্রমশ ডুবি স্বখাত-সলিলে।

সহজ জীবনের পব মৃত্যু—
সে তো বটের উপরে চাঁদের আলো,
কিংবা শূন্য পাহাড়ে কুয়াশা।
ও ধ্রুপদী শান্তি আমাদের নয় ;
অনিদ্রা থেকে দুঃস্বপ্নে আমাদের যাত্রায়
কাক ডাকে,
রোদে-পোড়া উদ্‌বিগ্ন মুখের কালো শব্দ।
বাংলায় বিহারে গড়মুক্তেশ্বরে
বিকলাঙ্গ লাশ কাঁধে
লোক চলে গোরস্থানে
কিংবা পোড়াবার ঘাটে।

মৃত্যু হয়ত মিতালি আনে :
ভবলীলা সাঙ্গ হলে সবাই সমান—
বিহারের হিন্দু আর নোয়াখালির মুসলমান
নোয়াখালির হিন্দু আর বিহারের মুসলমান।

২

শুনি না আর সমুদ্রের গান
থেমেছে রক্তে ট্রামবাসের বেতাল স্পন্দন।

ভুলে গেছি সাঁওতাল পরগণার লালমাটি
একদা দিগন্তে উদ্ধত পাহাড়,
বাইজির আসরে শোনা বসন্তবাহার।
ভুলে গেছি বাগবাজারি রকে আড্ডার মৌতাত,
বালিগঞ্জের লপেটা চাল,
আর ডালহাউসির আর ক্লাইভ স্ট্রিটের হীরক প্রলাপ,
ডকে জাহাজের বিদেশি ডাক।
রোমান্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না কবিতায়।

যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে।
বছর দশেক পরে যাব কাশীধামে।

উড়ো খৈ : ছটি কবিতা

১
ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টি, চিলেরা চুপচাপ,
রাস্তায় কমে পিচের উত্তাপ।
মনের ঝামেলা কেন বাড়ে
ঝাপ্‌সা-তামাটে অন্ধকারে?
অনেকে বলছে চল্লিশের পরে
বাস করা ভালো মথুরা-নগরে।

২
মেয়েটি বলল নতুন বন্ধুকে
'যা খুশি রটাক নিন্দুকে
ক্লান্ত মাথা রাখুন আমার ঊরুতে।'
কীসের ইশারা ঝলকায় তার ভুরুতে?
আকাশে বাদশা চাঁদ
খোলে তারার হারেম,
দূরে জাগে নদীর বাঁধ,
পিকনিকের পরে প্রেম
শুধুই কি শরীরের ভেল্‌কি?
ভোর হতে একপ্রহর বাকি,

হলুদ ঘাস লাগে শাড়ির পাড়ে
গাঁয়ের কুকুর ডাকে বারেবারে

৩
বাস থেকে দেখি বিরস গাছ,
কিন্তু কী সবুজ ঘাস !
ডিজেল তেলের পোড়াটে স্বাদ ।
খালি মনে পড়ে তোমার ঠাণ্ডা হাত,
গুমোট গরমে পান্তা ভাত,
লঙ্কা, কাসুন্দি, পেঁয়াজ ;
বাবেবারে বেহাত হওয়া কি তোমার রেওয়াজ ?

৪
কারো-কাবো চোখে দেখি
আলোর কুহেলিকা,
ভুরুর রেখা
নদীর ওপারে বলাকা;
দেহমদির কবিতা
খোঁয়ারির ভোরে লেখা ।

৫
ফিকে জ্যোৎস্না ছড়ায়
জোলো, বাসি দুধের রং ।
কাকেরা ফিরেছে বর্ষার গাছে
মেয়েটি ভিজে ফুটপাথে ;
ভ্রূণসার শিশু তার পাশে
হয়ত দুধের স্বপ্ন দেখে হাসে ।
ট্রেনের না স্টিমারেব গুমোট ডাকে
যশোদা-পৃথিবীর আবেশ কাটে ।

৬
মৃত্যুর পরে সব শেষ ।
কিছু আহা-উহু, বেশি
দুর্নাম,

চেলারা নতুন গুরুকে
করে প্রণাম,
বিধবার ঠোঁটে থাকে পানের রেশ।

স্মৃতিতে

ওরা কাজ করে,
দুমুঠো তোলে ঘরে,
তবে দুবেলা মুখে নয়।
রোজ ভাত ভালো নয়, ভালো নয়
পাঁচশালায় বৃথা অপচয়।

কেটেছে বিশবছর ;
রাত কত হলো
এ-প্রশ্নের মেলে নি উত্তর।
অনেকের দেহ মেদোচ্ছল,
অনেকের মনে পড়েছে কড়া
ভারাভারা ধানকাটা হয়নি সারা

একটি কবিতা

একদা বেজায় ক্ষমতা ছিল আমার নেতার!
চোখের পলকে তাঁর
সিংহরাজ মাথা নিচু করে
পাতাত মিতালি ছাগের সঙ্গে।
আজ দেবতা আমার বোবা আর কালা,
নেড়া বটগাছের তলায়
ফোকলা হাসিতে আপনমনে সময় কাটান
নির্বিকার।

হে ঈশ্বর
কত লাশ!

কোথায় আদিগন্ত নদী,
আরক্ত সূর্যাস্ত জলে আর আকাশে,
পালে হাওয়ার উদ্দাম আবেগ
বাঙ্গাল যৌবনের গান !

হে ঈশ্বর
কত লাশ !

অন্যভাষার কবিতা

চারটি কবিতা : কার্ল মার্কস

১

অন্তরে দুর্বহ বোঝা
অন্তর্দৃষ্টি কিন্তু স্বচ্ছ হলো
অস্পষ্ট আমার বাসনা
অবশেষে মূর্ত হলো তোমাতে।

জীবনের বন্ধুর কণ্টকিত পথে
যা পারি নি আনতে হাতের মুঠোয়
তা এল অযাচিত আমার কাছে
তোমার মদির দৃষ্টিতে।

২

মনের উদ্যমের মতো মহান শক্তিকে,
পৃথিবীর মতো যা অনন্ত
তাকে কী-করে রূপ দেবে শুধু শব্দ,
ধোঁয়ার মতো বঙ্কিমরেখায় ভেসে-চলা এই শব্দ ?

৩

হৃদয়কে যা জাপ্‌টে ধরে কঠিন শক্তিতে
ধীরে-সুস্থে তার মোকাবিলা পারব না কখনো,
অস্থির অশেষ যাত্রায়
এগিয়ে যেতে হবে দ্বন্দ্বে পথ করে।

যা-কিছু অনবদ্য, যা-কিছু সুন্দর
আমার জীবনে আনব
ভেদ করব বিজ্ঞানের জগৎ
শিল্প ও সংগীতের রসে হব মুখর।

৪

সাধ্যসীমার পরোয়া না-করে চলো
সংঘাত-থেকে-হটা কখনো নয়
ইচ্ছাশক্তিবর্জিত স্থবিরের মতো
বেঁচে-থাকা কখনো নয়।

যন্ত্রণা আর খাটুনির জোয়ালে
শান্তভাবে কাঁধ গলানো? ধিক!
যা হবার হোক, আমাদের আছে
আশা, আকাঙ্ক্ষা, কর্ম ও প্রয়াস!

একটি কবিতা : ইভান বুনিন

পশু-পাখিরো আছে বাসা,
      ব্যথায় বুক থরোথরো
যখন বাড়ি ছেড়ে গিয়ে
      বলেছি মোরে ক্ষমা করো।

পাখি-পশুরো বাসা আছে,
      বুক যে হাহাকার করে
যখন ঢুকি ঝুলি নিয়ে
      পরের ভাড়া-করা ঘরে।

একটি কবিতা : সের্গেই এসেনিন

এরি মধ্যে সন্ধ্যা।
কাঁটাগাছে ঝিকঝিকে শিশিরবিন্দু।
পিঠ রেখে আইভিগাছে
পথে একা দাঁড়িয়ে আছি।

চাঁদের জোরালো আলো
বাড়ির ছাদে।

দূরে কোথা থেকে কানে আসে
নাইটিংগেলের গান।

আরামি উষ্ণ আমেজ
শীতকালে উনুনের পাশে যেমন।
আর উদ্যত বার্চের সারি
দীর্ঘায়িত মোমবাতির মতো।

আরো দূরে নদীর ওপারে
বনের কিনারায়
নিদ্রালু প্রহরীর খট্‌খটি
জাগায় বিরস ধূসর শব্দ।

জেনির গান : বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট

মহাশয়গণ, মা একবার মুখের উপরে
শাপান্ত করেন আমায়,
বলেন, তোর পরিণতি সেই লাশকাটা ঘরে
কিংবা আরো কুৎসিত কোনো জায়গায়।
মুখের কথা সহজ বলে
ওতে কান দিই নি আমি,
কথায় কাত হবার পাত্রী আমি নই,
সময় আসুক, দেখবে কী হই আমি,
মানুষ তো আর পশু নয়!
শয্যা পাতো যেমন, শুতে হয় তেমন,
এ তো হক্ কথা,
কিন্তু পা ফেলতে হয় ফেলব আমি,
মাড়িয়ে দিয়ে যাবে, সে তো তোমাদের।

মহাশয়গণ, বন্ধু একটি ছিল একদা,
বলত সে সর্বদা
'পীরিতির বড়ো কিছু নেই পৃথিবীতে,'
আর, 'শুধু অন্যকার কথা ভাবা যাক।'

ওহো সখা, কথাটা বলা সহজ বটে,
কিন্তু যৌবন বয়ে যায়
তখন বিছানাই জীবনের সবটা নয়।
হাতে সময় কম, কাজে লাগানো চাই সময়কে,
মানুষ তো আর পশু নয়!
শয্যা পাতো যেমন, শুতে হয় তেমন,
এ তো হক্ কথা
কিন্তু পা ফেলতে হয় ফেলব আমি,
মাড়িয়ে দিয়ে যাবে, সে তো তোমাদের।

দুটি কবিতা : নর্মান বেথুন

১

মহান মমতাময় দেবদূত, হে মধুর মৃত্যু,
এবার স্থান দাও তোমার স্নিগ্ধ বুকে ;
উজ্জ্বল নক্ষত্ররা বিগত, অস্তগত জ্বলন্ত সূর্য,
আমার ক্ষুদ্রাঙ্ক শেষ, শেষ হলো ক্লান্তিকর দিন।

২

অনেক উঁচুতে আজ ভাসে স্বচ্ছ পাণ্ডুর চাঁদ,
কানাডীয় ঠাণ্ডা আকাশের দিকে ঊর্ধ্বমুখী—
আমাদের অস্থির ম্লান দৃষ্টির প্রতিচ্ছায়া যেন।
একই চাঁদ কিন্তু কাল রাতে উঠেছিল
স্পেনের বিদীর্ণ পাহাড়চূড়ায়,
রক্তিম, বন্য
উজ্জ্বল তার ঢালে প্রতিফলিত
মৃতদের রক্তাক্তমুখ।
আজকের বিবর্ণ চাঁদের দিকে তুলি ক্রুদ্ধ মুষ্টি,
নামহীন মৃতদের কাছে শপথ জানাই :
তোমরা যারা দিয়েছ প্রাণ
সক্রোধ নিঃসঙ্গতায় আমাদের জন্য,
তোমরা আমার কাছে অবিস্মরণীয়।

একটি চীনা গান

আমবা নির্যাতিত জাতি,
রুখতে হবে অত্যাচাবীকে
প্রতিবোধ ছাড়া মুক্তি নেই,
লড়াই ছাড়া নেই বাঁচাব পথ।

বোখো বোখো শত্রুব প্রখব আক্রমণ,
চীনেব জনগণ। অস্ত্র ধবো, যাও এগিয়ে।
মাতৃভূমি থেকে হটাও জাপানিদেব।
বক্তদান ছাড়া শান্তি আসবে না দেশে।

থেয়েলমান ব্যাটেলিয়ানেব গান

সমভূমিতে আমাদেব ট্রেঞ্চেব অনেক উপবে
স্পেনেব আকাশে বিস্তাবিত নক্ষত্রলোক।
দূব থেকে সকাল এল আমাদেব স্বাগত জানিযে
আহ্বান দিল আমাদেব সংগ্রামে যেতে।

. ...

অনেক অনেক দূবে আমাদেব দেশ,
তবু আমবা এখানে তৈযাব,
আমবা লড়ি, আনবই আমবা
স্বাধীনতা।

একতিল ভূমি পাবে না ফ্যাসিস্টবা,
গুলিবৃষ্টি যতই করুক।
বয়েছে পাশে অমল কমবেডবা,
পিছু-হটা আমাদেব নয়।

বাজুক দুন্দুভি, বেয়োনেট উদ্যত।
আমবা এগোই, জয়লাভ আমাদেব ববমাল্য।
আমাদেব পতাকাব নিচে ছত্রভঙ্গ হবে শত্রুবা,
থেযেলমান ব্যাটেলিয়ন! তৈয়াব হও, আগে বাড়ো।

অনেক অনেক দূরে আমাদের দেশ।
তবুও আমরা এখানে তৈয়ার,
আমরা লড়ি, আনবই আমরা
স্বাধীনতা।

জয় হবে আমাদের : চেরবান্দা রাজু

আমরা চূর্ণ করেছি পাহাড়, নিষ্পেষিত শিলাখণ্ড.
বিরাট বিপুল প্রকল্প গড়ে ওঠে
আমাদেরই বাহুবলে, কংক্রিটে নয় ;
কিন্তু
খাটে কারা
আর কারাই বা লোটে ?

জঙ্গল সাফ, চষেছি ক্ষেত
জলধারায় নয়, স্বেদক্ষয়ে ;
শস্যের সে কী সম্ভার ;
কিন্তু
সে-শস্য কার
আর কার কপালে খুদকুঁড়ো ?

বসাই তাঁত, সুতো বুনি
বানাই কত ঝলমলে পোশাক,
সুতো নয় তো, আমাদের তন্তুপাকে ;
কিন্তু
কারা পায় ওম
আর হিম মৃত্যু কাদের ?

যন্ত্রপাতি চালাই, উৎপাদন দ্বিগুণ,
কলকারখানা চলে
আমাদের শক্তিতে, বিদ্যুতে নয় ;
কিন্তু
বাংলোটি কার
কার বা নিচের কুঁড়েঘর ?

এখন বুঝেছি কী থেকে কী হয়,
লক্ষ্য আমাদেব উদ্যত
বিপ্লব আমবা আনব অক্লান্ত সংগ্রামে ,
তখন
তোমাদেব হবে শেষ
আব আমাদেব শুরু ।

অন্যদেশের গল্প

বল-নাচের পর : লেভ তলস্তয়

‘তাহলে আপনারা বলছেন ভালোমন্দর স্বাধীন বিচাবশক্তি মানুষের নেই, সব হচ্ছে পরিবেশেব ব্যাপাব, মানুষ পরিবেশের ক্রীড়নক। কিন্তু আমাব মনে হয় সব হলো দৈবের হাতে। নিজের বিষয়ে বলি শুনুন…’

বললেন আমাদেব সকলেব মাননীয় বন্ধু ইভান ভাসিলিয়েভিচ একটি আলোচনাব উপসংহাবে। ব্যক্তিব উন্নয়নেব জন্য আগে দবকাব পরিবেশ বদলানো, যে-অবস্থায় লোকে আছে সে-অবস্থাটা বদলানো, এই নিয়ে চলেছিল আমাদের কথাবার্তা। সত্যি বলতে, ভালো বা মন্দব বিচারশক্তি অসম্ভব—এমন কথা কেউ বলে নি, কিন্তু ইভান ভাসিলিয়েভিচের অভ্যেস ছিল, আলোচনা-প্রসঙ্গে নিজের মনেই যে-সব ভাবনা উঠেছে তাবই জবাব দেওয়া এবং সেই উপলক্ষে নিজের জীবনের নানা ঘটনার কথা বলা। মাঝে-মাঝে গল্পতে তিনি এত মত্ত হয়ে যেতেন যে কেন বলছেন মনে থাকত না, বিশেষ কবে এ-জন্য যে তিনি সর্বদা গল্প বলতেন গভীব আন্তরিকতায় ও সততায়।

এ-বারেও তিনি তাই কবলেন।

‘আমার কথা বলি। ও-ভাবে নয়, আমাব সাবাজীবনটাই গডে উঠেছে অন্যভাবে—পরিবেশের দরুন নয়, সম্পূর্ণ অন্যকিছুব ফলে।’

‘কীসের ফলে?’ আমরা শুধালাম।

‘সে অনেক কথা। বুঝতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়।’

‘বলুন না শুনি।’

মাথা ঝাঁকিয়ে মুহূর্তখানেক ভেবে নিলেন ইভান ভাসিলিযেভিচ।

‘হ্যাঁ,’ তিনি বললেন, ‘একটা রাত্রি, বরং একটা সকাল—আমাব জীবনে আমূল পরিবর্তন আনে।’

‘কী হয়েছিল?’

‘হয়েছিল কি—দারুণ প্রেমে পড়েছিলাম। অনেকবার প্রেমে পড়েছি, কিন্তু এমন গভীরভাবে নয়। অনেকদিন আগেকার কথা—ওর মেয়েদেব বিয়ে-থা হয়ে গিয়েছে। তাব নাম ব…, ভারেঙ্কা ব…’ মহিলার পদবীটা বললেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ। ‘পঞ্চাশেও তার চেহারা ছিল তাকিয়ে দেখার মতো, কিন্তু যৌবনে, আঠারো-বছব বয়সে ও ছিল মোহিনী: দীর্ঘাঙ্গী সুঠাম লাবণ্যময়ী, রানীর মতো, হ্যাঁ, ঠিক রানীর মতো। ভঙ্গিটা ছিল একেবারে খাড়া, যেন খাড়া না-থেকে সে পারেই

না। মাথাটা থাকত একটু পিছনে হেলানো ; রোগা বলতে কি হাড্ডিসার হলেও এটা তার দীর্ঘাকৃতি ও রূপের সঙ্গে মিলে চেহারায় এমন একটা রানীর মতো ভাব আনত যে লোকে সভয়ে পিছিয়েই যেত যদি না তার হাসিটা হতো এত উচ্ছল, মন-ভোলানো, চোখদুটো এত অপরূপ দীপ্ত, যদি-না তার যৌবনোচ্ছল সত্তায় থাকত এত মোহ।'

'ইভান ভাসিলিয়েভিচ বর্ণনা দিতে পারেন বটে!'

'যতই বর্ণনা দিই আপনাদের বোঝাতে পারব না সে দেখতে কেমন ছিল। তবে সেটা অন্যকথা। যে-ঘটনাটার কথা বলছি সেটা ঘটে পঞ্চমদশকে। প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন। জানি না ভালো কি মন্দ, কিন্তু সে-সময় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আমাদের না-ছিল কোনো পাঠচক্র না-ছিল মতবাদের বালাই ; আমরা ছিলাম শুধু নওজোয়ান আর থাকতাম ঠিক জোয়ানদের মতো, পড়াশুনো করতাম আর ফুর্তি চালাতাম। অত্যন্ত ফুর্তিবাজ তুখোড় ছোকরা ছিলাম আমি—তারপর পয়সাকড়ি ছিল মন্দ নয়। একটা তেজী ঘোড়ার মালিক, মেয়েদের নিয়ে স্লেজে চেপে পাহাড় গড়িয়ে নামতাম (স্কেটিং-এর রেওয়াজ তখনো আসে নি) ; বন্ধুদের সঙ্গে যেতাম মদের আড্ডায় (সে-সব দিনে শ্যাম্পেন ছাড়া কিছু ছুঁতাম না ; পকেটে পয়সা না-থাকলে কিছুই খেতাম না, আজকালকার মতো ভোদকা চলত না আমাদের) ; কিন্তু আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিশ ছিল পার্টি আর বল-নাচ। নাচতাম ভালোই, চেহারাটাও কুৎসিত ছিল না।'

'থাক, আর বিনয় করবেন না,' একটি শ্রোতা বললেন। 'আপনার ফটো আমরা সবাই দেখেছি। খারাপ কেন, চেহারাটি খাসা ছিল আপনার।'

'হয়ত ছিল, কিন্তু কথাটা ওটা নিয়ে নয়। কথাটা হলো, আমার সে-সময় হাবুডুবু প্রেম। স্রোভটাইডের শেষদিনে গেছি একটা বল-নাচে মার্শালের ওখানে, বৃদ্ধটি দিলদরাজ, ধনী, অতিথি-আপ্যায়ন করতে ভালোবাসতেন। তাঁর স্ত্রী ঠিক স্বামীর মতো অমায়িকভাবে অতিথিদের অভ্যর্থনা করলেন। পরনে মখমলের গাউন, মাথায় হীরের টায়রা, বার্ধক্যের ছাপ-লাগা গোলগাল শাদা গলা আর কাঁধ খোলা, মহারানী ইয়েলিজাভেতা পেত্রভনার ছবির মতন। অপরূপ নাচের আসর, অর্কেস্ট্রার মঞ্চ, বাজনদাররা হল সে-সময়কার সংগীতপ্রিয় এক জমিদারের নামকরা ভূমিদাসদল। খাদ্যের অভাব নেই, শ্যাম্পেনের স্রোত বইল। শ্যাম্পেনের বড়ো অনুরাগী হলেও খেলাম না—বিনা মদেই আমি তখন প্রেমের নেশায় মশগুল। কিন্তু নাচে বিরাম দিই নি, নাচতে নাচতে পড়ে যাবার মতো দশা। কোয়াড্রিল নাচলাম, নাচলাম ওয়াল্‌জ্‌ আর পলোনেজ্‌, আর বলা বাহুল্য যতটা পারি নাচলাম কেবলি ভারেঙ্কার সঙ্গে। তার গায়ে গোলাপি ফেটি-দেওয়া শাদা পোশাক, হাতে নরম চামড়ার লম্বা দস্তানা, সরু ছুঁচলো কনুই পর্যন্ত ঠিক পোঁছয়

নি, পায়ে শাদা সাটিনের জুতো। আনিসিমভ নামে হতচ্ছাড়া ইঞ্জিনিয়র আমাকে ফাঁকি দিয়ে একটা মাজুরকা নাচল ওর সঙ্গে। এখন পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করি নি সে-জন্য। সেলুনে গিয়েছিলাম, পরিচারকের কাছে দস্তানা নিয়ে আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, নাচের ঘরে ভারেঙ্কা ঢোকামাত্র আনিসিমভ ওকে নাচতে বলল। তাই ওর সঙ্গে না-নেচে মাজুরকাটা নাচতে হলো। একটি জার্মান মেয়ের সঙ্গে, তার উপর একসময়ে আমার একটু ঝোঁক হয়েছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে সে-সন্ধ্যায় তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করি নি, কথা বলি নি, তাকাই নি পর্যন্ত তার দিকে, আমার চোখজোড়া পড়ে ছিল শুধু গোলাপি ফেটি-দেওয়া শাদা পোশাক-পরা একটি দীর্ঘাঙ্গী তন্বী মেয়ের উপর, যার টোল-পড়া গাল, উজ্জ্বল আরক্তিম মুখ, মধুর স্নিগ্ধ যার চোখ। শুধু আমি নই, সবাই তার দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়েছিল, মায় মেয়েরা পর্যন্ত, যদিও ওর দীপ্তিতে সবাই হতশ্রী। মুগ্ধ না হয়ে উপায় ছিল না।

'নিয়মমতো দেখলে মাজুরকায় ও আমার জুড়ি ছিল না, কিন্তু আসলে প্রায় সবসময় নাচি ওরি সঙ্গে। ঘরের অন্যদিক থেকে ও বারবার সোজা আসে আমার কাছে অসংকোচে, ডাকের অপেক্ষা না-করে আমিও তাল মেলাই ওর সঙ্গে আর ও মুচকি হেসে ধন্যবাদ জানায় আমার অনুমান-কৃতিত্বে। নাচের সঙ্গী বাছাই-এর সময়ে যখন আমার গুণ[১] ওর কাছে ধরা পড়ত না, তখন রোগা কাঁধ একটু ঝাঁকিয়ে, আমার দিকে খেদ ও সান্ত্বনার হাসি হেসে হাত বাড়িয়ে দিত অন্য-একজনের দিকে।

'মাজুরকার তালে ওয়াল্‌জ্‌ শুরু হলো, অনেকক্ষণ ওয়াল্‌জ্‌ নাচলাম ওর সঙ্গে, হাঁপাতে হাঁপাতে হেসে ও বলছিল 'Encore।'[২] আর আমি ওর সঙ্গে ওয়াল্‌জ্‌ নাচছি তো নাচছি, শরীরের কোনো হুঁশ নেই।'

'হুঁশ ছিল না, মানে? ওর কোমর জড়িয়ে হুঁশটা বেশ প্রখর হয়েছিল মনে হচ্ছে—শুধু নিজের শরীরের নয়, 'ওরও', অতিথিদের একজন বললেন।

হঠাৎ টকটকে লাল হয়ে উঠে প্রায় ধমক দিয়ে বললেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ:

'সেটা আপনাদের, আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের হতে পারে। দেহ ছাড়া আপনারা আর কিছু দেখেন না। আমাদের দিনকালে অন্যরকম ছিল। কাউকে বেশি ভালোবাসলে অদেহী মনে হতো তাকে। আজকাল আপনারা মেয়েদের পা, পায়ের গোছ, ইত্যাদি বিষয়ে বেশ সচেতন সজাগ, যাদের ভালোবাসেন তাদের বিনাবস্ত্রে দেখেন, কিন্তু আমার কথা যদি বলেন, আলফোঁস কার যেমন

১ কোনো-কোনো নাচে এক-একজনে এক-একটি গুণের প্রতিম হতো।

২ আবার (ফরাসি ভাষায়)।

বলেছিলেন—পাকা লেখক ছিলেন তিনি—আমরা প্রেমিকাকে সর্বদা দেখতাম ব্রোঞ্জের পোশাকে। বিনাবস্ত্রে দূরের কথা, আমরা চাইতাম নগ্নতাকে ঢাকতে, যেমন চেয়েছিল নোয়ার সুসন্তান। কিন্তু আপনাদের মাথায় এটা ঢুকবে না…'

'ওর কথায় কান দেবেন না। গল্পটা চালিয়ে যান', বললেন আরেকজন শ্রোতা।

'হ্যাঁ, বেশিরভাগ সময়ে ওর সঙ্গে নাচলাম, সময়ের হুঁশ ছিল না। ক্লান্তিতে বাজিয়েদের হাঁফ ধরে গিয়েছে—বল-নাচের শেষটায় কেমন হয় জানেন তো—ওরা একটার পর একটা বাজিয়ে চলেছে কেবলি মাজুরকা; সাপারের প্রত্যাশায় ড্রয়িং-রুমের তাসের টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ছেন বাপ-মায়েরা; চাকরগুলো এদিক-সেদিকে ছুটোছুটি করছে। দুটো বেজে গেছে। শেষ মুহূর্তগুলোর সদ্ব্যবহার করতে হয়। ওকে আবার ডাকলাম নাচতে, আবার প্রায় একশোবারের বার ঘরময় নেচে বেড়ালাম ওর সঙ্গে।

' "সাপারের পর আমার সঙ্গে কোয়াড্রিলটা নাচবেন তো?" ওর বসার জায়গায় ওকে নিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম।

' "নাচব বইকি, অবশ্য যদি বাড়ি যেতে না হয়," মৃদু হেসে ও বলল।

' "যেতে দেব না আপনাকে," আমি বললাম।

' "হাতপাখাটা দিন তো", বলল ও।

' "ফেরত দিতে হচ্ছে বলে মনে বড়ো ব্যথা পাচ্ছি", সস্তা শাদা পাখাটা দিতে দিতে বললাম।

' "আহা, ব্যথা পেতে হবে না, এই নিন," পাখার একটা পালক ছিঁড়ে আমাকে দিয়ে ও বলল।

'পালকটা নিলাম, উচ্ছ্বাস আর কৃতজ্ঞতা জানালাম শুধু আমার চোখ দিয়ে। শুধু যে আনন্দ আর তৃপ্তিতে মন ভরে উঠেছে, তা নয়, আমি সুখী, চরম সুখী, মনটা দরাজ হয়ে গিয়েছে, আমি আর আমি নই, আমি তখন অপার্থিব কোনো প্রাণী, হিংসাদ্বেষ যে জানে না, ভালো বই মন্দ করতে পারে না।

'দস্তানায় পালকটা গুঁজে দাঁড়িয়ে রইলাম, ওকে ছেড়ে যাবার শক্তি নেই।

' "দেখছেন, ওরা বাবাকে নাচতে বলছে," দোরগোড়ায় গৃহকর্ত্রী ও অন্য কয়েকটি মহিলার সঙ্গে দণ্ডায়মান একটি দীর্ঘদেহ, জমকালো চেহারার ভদ্রলোককে দেখিয়ে ও বলল। ওর বাবা কর্নেল, টিউনিকের কাঁধে রুপোর কাজ-করা ইপলেট।

'হীরের টায়রা-পরা গৃহকর্ত্রী, কাঁধ যার ইয়েলিজাভেতার মতো, ডেকে বললেন, "ভারেঙ্কা, এদিক এসো তো!"

'ভারেঙ্কা দরজার দিকে গেল, আমি তার পিছু পিছু।'

' "Ma chére,[১] বাবাকে বলে কয়ে সঙ্গে নিয়ে নাচো না। দয়া করে নাচুন, পিওত্র ভ্লাদিস্লাভিচ," কর্নেলকে বললেন গৃহকর্ত্রী।

'ভারেঙ্কার বাবা বেশ লম্বা আর জমকালো, চেহারাটি অত্যন্ত সুন্দর, বুড়ো হলেও বেশ তাজা। টকটকে লাল মুখে শাদা গোঁফজোড়া প্রথম নিকোলাইয়ের কায়দায় পাক-দেওয়া, শাদা জুলফি নেমে এসেছে গোঁফের দিকে, রগ থেকে চুল সটান সামনে আঁচড়ানো, উজ্জ্বল চোখে আর ঠোঁটে ঠিক মেয়ের মতো সানন্দ হাসি। বেশ সুন্দর সুঠাম গড়ন, চওড়া বুক ফৌজি-কায়দায় চেতানো, সম্মান-পদকের ঘটা তত নেই, কাঁধজোড়া শক্ত, পা-দুটো লম্বা আর সুগঠিত। নিকোলাইয়ের রেওয়াজের সেকেলে কায়দার অফিসার।

'দরজার কাছে গিয়ে দুজনে শুনলাম তিনি আপত্তি করে বলছেন নাচতে ভুলে গিয়েছেন; তবু একটু হেসে বাঁ-হাতে খাপসুদ্ধ তলোয়ার খুলে সেবা-তৎপর একটি ছোকরাকে দিলেন, ডানহাতে সোয়েডের একটা দস্তানা চাপিয়ে—মুচকি হেসে বললেন "নিয়মমাফিক চলা চাই," তারপর মেয়ের হাত ধরে একচক্কর ঘোরার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ঠিক তালের অপেক্ষায় রইলেন।

'মাজুরকার তাল শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই চট করে একটা পা ছুঁড়ে আরেক পায়ে তাল ঠুকলেন তিনি, ঘরময় ভাসতে লাগল তাঁর দীর্ঘ ভারি দেহ কখনো শান্ত মসৃণ, কখনো-বা উদ্দাম সশব্দ ভঙ্গিতে। পায়ে পায়ে তাল ঠুকে তার পাশে ভাসছে ভারেঙ্কার সাবলীল শরীর। তার ছোটো শাদা সাটিনের জুতো-পরা পায়ের পদপাত কখনো দীর্ঘায়িত কখনো-বা সংকুচিত করে প্রায় অলক্ষ্যে তাল দিয়ে গেল সে। দুজনের প্রতিটি ভঙ্গি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল অতিথিরা। আমার যে-ভাবটা হয় সেটা তারিফের শুধু নয়, ঘোর উচ্ছ্বাসের। মনকে বিশেষ-ভাবে নাড়া দিল কর্নেলের বুটজোড়া। বাছুরের চামড়ায় তৈরি ভালো বুট, তবে হীল নেই, সামনের দিকটা চারকোণা, হালফ্যাশানি ছুঁচলো নয়। দেখে মনে হয় ব্যাটেলিয়নের মুচি বানিয়েছে বুটজোড়া। মনে হলো, "আদরের মেয়েকে সাজগোজ করিয়ে ভদ্রসমাজে আনার জন্যে শৌখিন জুতোর বদলে উনি নিজে পরেন ঘরে-তৈরি বুট," আর সামনে চারকোণা ওঁর বুটজোড়া দেখে বিশেষ বিচলিত লাগল। বেশ বোঝা গেল এককালে তিনি ভালো নাচতেন, কিন্তু শরীরটা এখন ভারি হয়ে গিয়েছে, পা-দুটোর সেই তৎপরতা আর নেই বলে ক্ষিপ্র খাসা চালগুলো চেষ্টা সত্ত্বেও করে উঠতে পারছেন না। কিন্তু দুবার ঘরময় বেশ ঘুরলেন তিনি, আর পা-দুটো চকিতে ছড়িয়ে দিয়ে আবার খট করে জোড়া লাগিয়ে একহাঁটুতে ভর দিয়ে, অবশ্য একটু ভারি কায়দায়, যখন বসে

১ লক্ষ্মীটি (ফরাসি ভাষায়)।

পড়লেন আর আটকে-যাওয়া স্কার্টটা ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়ে মুচকি হেসে সাবলীল-ভাবে যখন পাক দিল তার চারদিকে, তখন সবাই সজোরে হাততালি দিয়ে উঠল। কিছুটা চেষ্টা করে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি সস্নেহে মেয়ের মাথা চেপে চুমু খেলেন কপালে, তারপব নিয়ে এলেন আমার কাছে, ভেবেছিলেন ওর নাচের সঙ্গী আমি। জানালাম তা নয়।

' "কিছু এসে যায় না তাতে; নাচুন ওর সঙ্গে," খাপসুদ্ধ তলোয়ার বাঁধতে বাঁধতে হেসে বললেন।

'বোতল থেকে একবার প্রথম ফোঁটা বেরুবার পর জল যেমন হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসে, তেমনি ভাবেঙ্কার উপর ভালোবাসা আমার অন্তরের সমস্ত ভালো-বাসার পথ খুলে দিল। সে-সময় আমার প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়ল গোটা পৃথিবীটা। ভালোবাসলাম রানী ইয়েলিজাভেতার মতো যাঁর বুক সেই হীরের টায়রা-পরা গৃহকর্ত্রীকে, তাঁর স্বামীকে, অতিথিদের, চাকরবাকরদের, এমনকী ইঞ্জিনিয়ব আনিসিমভকে, যে আমার উপর বেজায় চটেছিল। আর চারকোণা ঘরোয়া বুটপরা ওর বাবা, হাসিটা যাঁর ঠিক মেয়ের মতো—তাঁর প্রতি যে-অনুরাগ বোধ করেছিলাম সেটা একেবারে উদ্বেলিত।

'মাজুরকা শেষ হতে গৃহকর্তা ও কর্ত্রী সাপাবের টেবিলে ডাকলেন আমাদের। কর্নেল ব···অনিচ্ছা জানালেন। খুব ভোরে উঠতে হবে তাঁকে, এই বলে গৃহ-স্বামীদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ভয় হলো বুঝি ভারেঙ্কাকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু ও মায়ের সঙ্গে রয়ে গেল।

'সাপারের পর প্রতিশ্রুত কোয়াড্রিল নাচলাম ওর সঙ্গে। মনে হয়েছিল এর চেয়ে বেশি সুখ আর হতে পারে না, কিন্তু সুখ আমার উত্তরোত্তব বেড়ে চলল। দুজনের মধ্যে প্রেমের কথা কিছু হলো না; আমাকে ভালোবাসে কিনা সে-কথাটাও জিজ্ঞেস করলাম না—না ওকে, না নিজের কাছে। ওকে ভালোবাসি, তাই যথেষ্ট। ভয় হচ্ছিল শুধু একটা, এ-সুখ নষ্ট হয়ে যাবে না তো।

'বাড়ি ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ার কথা ভাবতে গিয়ে মনে হলো ঘুমোনো একেবারে অসম্ভব। আমার হাতে ওর হাতপাখার পালক আর গোটাগুটি একটা দস্তানা, গাড়িতে ওকে আর ওর মাকে তুলে দেবার সময়ে আমাকে দিয়েছিল শেষেরটা। জিনিশদুটোব দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আবার চোখের সামনে দেখলাম সেই মুহূর্তটি যখন নাচের সঙ্গী বাছতে গিয়ে আমার গুণ আন্দাজ করতে পেরেছে সে, কানে এল তার মিষ্টি গলা, "গৌরব? তাই না?" তারপর সানন্দে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে আমার দিকে; কিংবা যখন সাপারের টেবিলে বসে শ্যাম্পেন খেতে খেতে অনুরাগ-ভরা চোখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে ওকে দেখলাম সেই সময়ে যখন বাপের সঙ্গে

সাবলীল ভঙ্গিতে নাচছিল সে, বাপের এবং নিজের দরুন খুশিতে আর গর্বে তাকাচ্ছিল মুগ্ধ দর্শকদের দিকে। আর অজান্তেই তারা দুজনে মিশে গেল আমার মনে এক গভীর কোমল অনুভূতিতে।

'আমার বিগত ভাই আর আমি তখন একলা বাড়িতে থাকতাম। সমাজ-টমাজে কোনো ঝোঁক ছিল না ভাইয়ের, বল-নাচে কখনো যেত না। এম. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে তখন, তার জীবনযাপনের ধরনটা খুবই নিয়মমাফিক। ঘুমিয়ে পড়েছে সে। কম্বলে আধো-ঢাকা, বালিশে-গোঁজা তার মুখ দেখে মায়া হলো—আহা, বেচারি জানে না আমার কী সুখ, সে-সুখের ভাগ নিতেও পারবে না ও। আমাদের ভূমিদাস খাস-চাকর পেত্রুশা বাতি হাতে এল জামাকাপড় ছাড়িয়ে দিতে আমার, কিন্তু ছুটি দিলাম ওকে। লোকটার ঘুম-জড়ানো মুখ আর এলোমেলো চুল দেখে মমতা হলো। পাছে কোনো শব্দ হয়, পা টিপে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার উপরে বসলাম। এত সুখ আমার মনে, ঘুম এল না। ঘরে গরম লাগাতে ইউনিফর্ম না-খুলেই চুপিচুপি সদর ঘরে এসে ওভারকোটটা চাপিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম।

'বল-নাচ থেকে যখন চলে আসি তখন চারটা বেজে গেছে, বাড়ি পৌঁছে বসে থেকে তারপর প্রায় দুঘণ্টা কেটেছে; বেরোলাম যখন আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে। শ্রোভটাইডের সেই বিশেষ আবহাওয়া—কুয়াশা, ভিজে বরফ গলছে রাস্তায়, ছাত থেকে টুপটুপ করে ঝরছে জলের ফোঁটা। শহরের উপকণ্ঠে একটা খোলা মাঠের কিনারে তখন থাকত ভারেঙ্কারা, মাঠের একদিকে মেয়েদের কলেজ, অন্যদিকে বেড়াবার জায়গা। আমাদের নির্জন গলিটা পার হয়ে বড়ো রাস্তায় গেলাম; চোখে পড়ছিল, মাঝে-মাঝে পথচারী, আর কাঠ-বোঝাই স্লেজ নিয়ে চালকেরা যাচ্ছেই, স্লেজের রানারগুলো রাস্তার বরফ কেটে প্রায় পাথর ঘেঁষে চলেছে; আর সবকিছু—ভিজে চকচকে জোয়ালের নিচে তালে তালে মাথা-ওঠা-নামা-করা ঘোড়াগুলো, স্লেজগুলোর পাশে পাশে গায়ে গাছের ছালের চাটাই চাপিয়ে বিরাট জুতোয় বরফকাদা-ভেঙে-যাওয়া চালকেরা আর পথের দুধারে কুয়াশায় যে ঘরবাড়িগুলোকে ভারি উঁচু মনে হচ্ছিল—সবকিছু মনে হলো বিশেষ রকমের মধুর ও অর্থময়।

'যে-মাঠে ওদের বাড়ি সেখানে পৌঁছিয়ে বেড়াবার জায়গাটার দিকে বড়ো আর কালো কী-একটা চোখে পড়ল, কানে এল ঢাক আর বাঁশির আওয়াজ। আমার হৃদয়ে তখনো সংগীতের ঝংকার, মাঝে-মাঝে মাজুরকার রেশ ভেসে আসছে। কিন্তু এটা যেন অন্যধরনের বাজনা, নিষ্ঠুর অসুন্দর।

'"কী ব্যাপারটা", ভাবতে ভাবতে মাঠ-চিরে-যাওয়া গাড়ির পিছল রাস্তা হয়ে চললাম সেদিকে, যেদিকে আওয়াজ। প্রায় একশোগজ গিয়ে কুয়াশায়

লোকের কালো ভিড়টা স্পষ্ট হতে শুরু করল। সৈন্য নিশ্চয়। কুচকাওয়াজ চলেছে ভেবে একটি কামারের সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে চললাম, তার গায়ে তেলচিটে জ্যাকেট আর অ্যাপ্রন, বড়ো একটা বাণ্ডিল হাতে। কালো কোট পরে দু-সারি সৈন্য মুখোমুখি নিশ্চল দাঁড়িয়ে, বন্দুকগুলো পাশে ধরা। তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে বাঁশি-বাজিয়ে আর ঢাকীরা বারবার বাজিয়ে চলেছে অপ্রীতিকর কর্কশ সুরটা।

'"কী করছে ওরা ?" দাঁড়িয়ে পড়ে কামারটিকে জিজ্ঞেস করলাম।

'"কেটে পড়ার চেষ্টা করেছিল বলে একটা তাতারকে শাস্তি দিচ্ছে," সৈন্যদের দু-সারির একেবারে শেষের দিকটায় তাকিয়ে ক্রুদ্ধভাবে জবাব দিল কামার।

'সে-দিকে তাকিয়ে দেখলাম বীভৎস কী-একটা দু-সারির মাঝখান দিয়ে আসছে আমার দিকে। কোমর অবধি খালি গা, দু-বন্দুকে বাঁধা একটি লোক, বন্দুকগুলো ধরেছে দুটি হাবিলদার, তাড়িয়ে আনছে তাকে। পাশে পাশে হাঁটছেন ফৌজি কোট আর ফৌজি টুপি পরা দীর্ঘাকৃতি একটি অফিসার, চেহারাটা চেনা চেনা ঠেকল। সমস্ত শরীরে ঠক ঠক করে কেঁপে গলন্ত বরফে থস থস করে পা ফেলে বন্দীটি এগিয়ে আসছে, দু-ধার থেকে তার উপরে পড়ছে মারের পর মার, থেকে থেকে সে নিচু হয়ে পিছিয়ে পড়লে বন্দুক-ধরা হাবিলদারদুটি তাকে ঠেলে দিচ্ছে সামনে, কখনো বা ঢলে একটু বেশি এগিয়ে পড়লে সৈনিকেরা ঝটকা দিয়ে টেনে নিচ্ছে যাতে পড়ে না যায়। আর তার পাশে সমানে দৃঢ় পায়ে হাঁটছেন দীর্ঘাকৃতি অফিসারটি, পিছিয়ে পড়ছেন না একবারও। তিনি হলেন ভারেঙ্কার বাবা, টকটকে লাল মুখ, শাদা গোঁফ আর জুলফি।

'লাঠি পড়াতে প্রত্যেকবার বন্দীটি যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ ফিরিয়ে যেন অবাক হয়ে তাকাচ্ছে সেদিকে, যেদিক থেকে আঘাত আসছে, ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে কী একটা বলে চলেছে বারবার। কাছে না-আসা পর্যন্ত কী বলছে বুঝতে পারি নি। সেটা বলা নয় ঠিক, কান্না। "দয়া করো, ভাইসব ! দয়া করো ভাইসব !" কিন্তু কোনো দয়া নেই ভাইদের ; মিছিলটা ঠিক আমার সামনে এসে পড়ল, দেখলাম আমার সামনেকার সৈন্যটি দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে এসে এত জোরে মারল তাতারটির পিঠে যে হাওয়ায় শিস দিয়ে উঠল বেতটা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে, সৈনিকেরা টেনে ধরে রাখল, ও-পাশ থেকেও একইরকম আঘাত এল, এ-পাশ থেকে আবার, আবার ও-পাশ থেকে···তার ঠুকে তার পাশে চলেছেন কর্নেল, কখনো তাকাচ্ছেন নিজের পায়ের দিকে কখনো-বা বন্দীটির দিকে, বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে গাল ফুলিয়ে চাপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আস্তে ছেড়ে দিচ্ছেন। যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম মিছিলটা সেখানটা পেরিয়ে যাবার সময়ে দুসারি সৈন্যর ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল বন্দীর পিঠের আভাস। দাগড়া দাগড়া ভেজা লাল অস্বাভাবিক একটা পিঠ। মানুষের দেহ বলে বিশ্বাস হলো না।

'"হে ভগবান," পাশের কামারটি বলে উঠল অস্ফুট কণ্ঠে।

'এগিয়ে গেল মিছিল। হুমড়ি-খেয়ে-পড়া আঁকুপাঁকু মানুষটির উপর দু-ধার থেকে সমানে চলল মারের পর মার। সমানে ঢাকের বাজনা, বাঁশির আওয়াজ, বন্দীর পাশে দৃঢ় পদক্ষেপে সমানে এগিয়ে চললেন দীর্ঘাকৃতি জমকালো অফিসারটি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে, তারপর দ্রুত পায়ে তিনি গেলেন একটি সৈনিকের কাছে।

'"ফাঁকি দিবি আর? দেখাচ্ছি তোকে!" ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি। "দিবি ফাঁকি?" দেখলাম সোয়েডের দস্তানা-পরা বলিষ্ঠ হাতে তিনি কষে একটা চড় বসালেন ছোটোখাটো ভীত দুর্বল সৈনিকটির মুখে, তাতারের দগদগে লাল পিঠে যথেষ্ট জোরে সে বেত চালায় নি বলে।

'"লেআও নয়া বেত!" হাঁকলেন কর্নেল। তাকাতেই দেখতে পেলেন আমাকে। চিনতে না-পারার ভান করে অত্যন্ত ভয়ংকর বদরাগী একটা ভ্রূকুটি টেনে তাড়াতাড়ি মুখ ফেরালেন। এত লজ্জা হলো আমার যে কোনদিকে তাকাব ভেবে পেলাম না, যেন অত্যন্ত জঘন্য একটা অপরাধে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছি। মাথা নিচু করে তাড়াতাড়ি চললাম বাড়িমুখো। সারাপথ কানে বাজতে লাগল ঢাকের শব্দ, বাঁশির চিৎকার, সেই কথাগুলো, "দয়া করো, ভাইসব," কর্নেলের ক্রুদ্ধ রোয়াব-ভরা হাঁক, "ফাঁকি দিবি আবার।" আর বুকের ভিতরটায় প্রায় শারীরিক গা-ঘুলিয়ে-ওঠার মতো এমন একটা কষ্ট হলো, কয়েকবার দাঁড়িয়ে পড়তে হলো রাস্তায়। মনে হলো দৃশ্যটির সমস্ত বিভীষিকা উদ্‌গার করে ফেলতে হবে আমায়। কী করে বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়লাম মনে নেই, কিন্তু ঘুম আসতে-না-আসতে আবার সবকিছু ফিরে এল চোখের সামনে, বেজে উঠল কানে। তড়াক করে উঠে পড়লাম।

'কর্নেল সম্পর্কে মনে হলো, "ওঁর নিশ্চয়ই এমন একটা যুক্তি আছে যেটা আমার জানা নেই। উনি যা জানেন আমার জানা থাকলে ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম, যা দেখলাম তাতে এত কষ্ট হতো না।" কিন্তু শত ভেবেও কর্নেলের জানা জিনিশটি কী মাথায় ঢুকল না, ঘুম এল না সন্ধ্যা পর্যন্ত, আর তাও এল একটি বন্ধুর ওখানে গিয়ে প্রচুর মদ্যপানের পর।

'আপনারা ভাবছেন যে-দৃশ্যটি দেখি সেটি মন্দ বলে ধরে নিয়েছিলাম! মোটেই নয়। "ব্যাপারটা যখন এত নিশ্চিন্তভাবে করা হয়ে থাকে, লোকে যখন সেটাকে দরকার বলে মেনে নিয়েছে তখন তার মানে ওদের নিশ্চয়ই এমন-কিছু একটা যুক্তি আছে যেটা আমার অজানা," এই ভেবে সেটা কী বের করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বের করতে পারি নি কখনো। আর পারি নি বলে আমার পূর্বেকার সংকল্প মতো সামরিক কাজে যোগ দিতে পারি নি, শুধু যে সামরিক

কাজে যোগ দিতে পারি নি তা নয়, কোনো কাজেই নয়, আর দেখতেই তো পারছেন কিছুরি যোগ্যতা আমার নেই।'

'আপনি যে কেমন অযোগ্য সেটা ভালো করে আমাদের জানা আছে,' অতিথিদের একজন বললেন। 'আপনি না-থাকলে কত লোক যে কী অযোগ্য হয়ে থাকত সেটা বরং ভেবে দেখুন।'

'যতসব বাজে কথা।' আন্তরিক বিরক্তির সঙ্গে বললেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ।'

'আচ্ছা, প্রেমের কী হলো?' আমরা প্রশ্ন করলাম।

'প্রেম? সেদিন থেকে উবে গেল প্রেম। যখনি ভারেঙ্কা অভ্যেসমতো মৃদু হেসে অন্যমনা হয়ে যেত তখনি মাঠে কর্নেলের কথাটা মনে না-করে পারতাম না, কেমন যেন অস্বস্তি আর বিশ্রী লাগত; দেখা-সাক্ষাৎ কমিয়ে দিতে লাগলাম। প্রেমও খতম হয়ে গেল। তাহলে দেখছেন তো কী না-ঘটে, কোথা থেকে মানুষের গোটা জীবনটায় পরিবর্তন এসে মোড় ঘুরে যায়। আর আপনারা কিনা বলছেন...' উপসংহার করলেন তিনি।

সর্দিগর্মি : ইভান বুনিন

ডিনারের পর ডাইনিং-রুমের গরম উজ্জ্বল আলো থেকে চলে এসে তারা দাঁড়াল ডেকে, রেলিং-এর কাছ ঘেঁষে। চেখে বুজে মেয়েটি হাতের উল্টো দিক গালে চেপে হেসে উঠল সহজ, মধুব স্বরে,—ছোটোখাটো মেয়েটির সবকিছুই মধুর,—তারপর বলল :

—মনে হচ্ছে নেশা হয়েছে··কোত্থেকে এসেছেন আপনি? তিনঘণ্টা আগে এমনকী আপনার অস্তিত্ব পর্যন্ত জানা ছিল না। কোথায় যে স্টিমাবে উঠলেন তাও জানি না। সামারায়? যা হোক, সব সমান···আমাব মাথা ঘুরছে, না স্টিমারটা মোড নিচ্ছে?

সামনে অন্ধকার আর আলো। একটানা মৃদুমন্দ হাওয়া অন্ধকার থেকে বইছে তাদেঃ মুখে, সামনে থেকে আলোগুলো ছুটে পালাচ্ছে একপাশে : ভল্‌গা জলযানের সচরাচর ক্ষিপ্রগতিতে স্টিমারটা বড়ো একটা পাক দিয়ে চলেছে ছোটো জেটির দিকে।

মেয়েটির হাত ধরে লেফটেনাণ্ট ঠোঁটে ছোঁয়াল। ছোট্ট বলিষ্ঠ হাতে রোদে-পোড়া গন্ধ। আব তার বুক স্বর্গসুখে আর ভয়ে থমকে দাঁড়াল এই ভেবে যে, দক্ষিণী আকাশের নিচে তপ্ত বালুতে (মেয়েটি বলেছিল আনাপা থেকে ফিরছে) পুরো একমাস সূর্যস্নানের পর লিনেনের পাতলা ফ্রকের নিচে ওর সারাশরীর কী শক্ত আব তামাটে।

—চলুন নামা যাক···—অনুচ্চকণ্ঠে বলল লেফটেনাণ্ট।

—কোথায়?—অবাক হয়ে মেয়েটি শুধাল।

—এখানে নেমে পড়ি।

—কেন?

কিছু বলল না লেফটেনাণ্ট। মেয়েটি আবার হাতের উল্টোদিক চাপাল তপ্ত গালে।

—পাগলামি···

—চলুন নামি,—ভারি গলায় সে আবার বলল,—দোহাই আপনার···

—বেশ, আপনার যা ইচ্ছে তাই করুন,—মুখ ফিরিয়ে মেয়েটি বলল।

যতদূর সম্ভব বেগে এসে স্বল্পালোকিত জেটিতে স্টিমারটা লাগল আস্তে ধপ,

করে। দুজনে আর একটু হলে এ-ওর গায়ের উপর পড়ত। মাথার উপর দিয়ে ছুটে এল একটা দড়ি, স্টিমারটাকে টেনে নেওয়া হতে লাগল, শুরু হলো জলের তোলপাড়, নামবার তক্তার গড়গড় শব্দ···মালপত্র আনতে ছুটল লেফটেনাণ্ট।

মিনিটখানেক পরে ঘুমে-জড়ানো ছোটো আপিসটা পেরিয়ে বালুতীরে এসে পড়ল দুজন, বালিতে পায়ের গাঁট অবধি বসে যাচ্ছে, নীরবে উঠল একটি ধুলোভরা গাড়িতে। বিরল বাঁকা বাঁকা লণ্ঠনে আলোকিত পাহাড়ের ঢালুর মধ্যে ধুলোয় নরম পথের শেষ হবার নামগন্ধ নেই মনে হলো তাদের। কিন্তু এবার ঢালুর শেষ, শুরু হলো পাথুরে রাস্তায় চাকার খটখট আওয়াজ, এই তো কোনো-একটা চক, নানাবিধ দফতর ও অফিস, দমকলবাহিনীর মিনার, গ্রীষ্মের রাতে মফস্বল শহরের উষ্ণতা ও গন্ধ···একটি আলোকিত ফটকের সামনে গাড়োয়ান গাড়ি থামালে খোলা দরজার ফাঁকে চোখে পড়ল খাড়া পুরনো কাঠের সিঁড়ি এবং গোলাপি শার্ট ও কোট পরা দাড়িগোঁফ-না-কামানো বুড়ো একটি দারোয়ান, বেজার মুখে সে নেংচাতে নেংচাতে তাদের স্যুটকেস নিয়ে পথ দেখিয়ে চলল উপরে। বড়ো কিন্তু সারাদিনের তাপে বেজায় গুমোট একটা ঘরে নিয়ে গেল তাদের, জানলায় শাদা পর্দা, ড্রেসিং-টেবিলে গোটা দুয়েক নতুন মোমবাতি,—ঘরে ঢুকতেই, দারোয়ান দরজা বন্ধ করে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই লেফটেনাণ্ট এত অধীর আবেগে ছুটে গেল মেয়েটির কাছে, চুম্বন করার সময়টায় এত তীব্র বাসনায় দুজনের হাঁফ ধরে গেল যে পরে অনেকবছর তাদের মনে জেগে ছিল মুহূর্তটির স্মৃতি : সারাজীবনে দুজনের কারোর এ-রকম অভিজ্ঞতা আর কখনো হয় নি।

সকাল দশটার সময় চলে গেল সেই ছোটোখাটো অনামী মেয়েটি, শেষ পর্যন্ত যে নাম জানায় নি লেফটেনাণ্টকে, হেসে হেসে বলেছে সে শুধু অচেনা সুন্দরী; তপ্ত, রৌদ্রোজ্জ্বল, আনন্দভরা সেই সকালটায় গির্জার ঘণ্টাধ্বনি, হোটেলের সামনে হাটের হৈচৈ, খড়ের, আলকাতরার রুক্ষ মফস্বল শহরের নানা উগ্র মিশ্র গন্ধ। রাত্রে বিশেষ ঘুমোয় নি সে কিন্তু সকালে বিছানা ছেড়ে পর্দার আড়ালে গিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মুখহাত ধুয়ে জামাকাপড় পরে নেবার পর তাকে দেখাল সপ্তদশীর মতো নবীনা। অস্বস্তি লাগছিল কি তার? না, খুবই সামান্য একটু শুধু। আগের মতো তার সহজ হাসিখুশি ভাব। তার বিচক্ষণ বুদ্ধির পরিচয় পেতে দেরি হলো না।

—না, না, মণি,—একসঙ্গে আবার যাত্রার প্রস্তাবের উত্তরে সে বলল,—না, পরের স্টিমার না-আসা পর্যন্ত আপনাকে থেকে যেতে হবে। দুজনে একসঙ্গে গেলে সবকিছু পণ্ড হবে। আমার বেজায় খারাপ লাগবে। গা ছুঁয়ে বলছি, আমাকে হয়ত যা ভেবেছেন মোটেই আমি তা নই। এটা তো দূরের কথা, এর ঘেঁষা কিছু আমার জীবনে ঘটে নি কখনো, আর ঘটবেও না। আমার বুদ্ধি লোপ পেয়ে

গিয়েছিল নির্ঘাত···কিংবা হয়ত আমাদের দুজনের সর্দিগর্মিগোছের কিছু একটা হয়েছিল···

আর কেমন যেন হালকা মনেই তার কথা মেনে নিল লেফটেনাণ্ট। ষ্টিমারঘাট পর্যন্ত হালকা খুশি মনে গেল তার সঙ্গে,—গোলাপি রঙের 'সামালিওৎ' ছেড়ে দেবার উপক্রম করেছে তখন,—ডেকের সবার সামনে তাকে চুমু খেয়ে নামবার তক্তা সরিয়ে নেবার সময় কোনোক্রমে লাফিয়ে পড়ল তা থেকে।

আগেকার মতো নিশ্চিন্ত হালকা মনে সে ফিরল হোটেলে। কিন্তু মনে হলো এরই মধ্যে সেখানটা কিছু বদলেছে। ও নেই, ঘরটার চেহারা তাই কেন যেন একেবারে আলাদা। এখনো সেটা তার উপস্থিতিতে ভরাট, কিন্তু ফাঁকা! কী আশ্চর্য ঘরে তখনো তার বিলিতি ওডিকলোনের খাসা গন্ধ, ট্রেতে শেষ-না-করা তার চায়ের কাপ, কিন্তু তবু সে নেই···আর কোমল অনুরাগে লেফটেনাণ্টের বুকটা এমন মুচড়ে উঠল যে, তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরিয়ে সবেগে পায়চারি করতে লাগল ঘরে।

—কী অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা! —হেসে বলে উঠল জোরে, অথচ টের পেল চোখ ফেটে কিন্তু জল আসছে তার।—'গা ছুঁয়ে বলছি, আমাকে হয়ত যা ভেবেছেন মোটেই আমি তা নই···' আর চলে গেছে···

পর্দাটা সরানো, বিছানা তখনো ঠিক করা হয় নি। ওর মনে হলো বিছানার দিকে তাকানো এখন অসহ্য। পর্দা টেনে আড়াল করল বিছানাটা, হাটের হৈচৈ, গাড়ির চাকার আর্তনাদ ঢাকার জন্য জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়ে শাদা ফোলা পর্দাগুলো নামিয়ে বসে পড়ল সোফায়··· তাহলে 'জাহাজি কাণ্ডকারখানার' সমাপ্তি হলো! ও তো চলে গেছে, এতক্ষণে অনেক দূরে, হয়ত বসে আছে কাঁচের শাদা লাউঞ্জে, নয়ত ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে তাকিয়ে আছে রোদে-চিকচিকে বিরাট নদীর দিকে, ভাটির দিকে কাঠের ভেলা চলেছে, হলদে বালুর চর, জল আর আকাশের উজ্জ্বল দৃশ্যপট, ভল্গার অনন্ত বিস্তার··· আর বিদায়, চিরবিদায়··· আবার কোথাও দেখা হওয়া কি সম্ভব? —'সত্যি তো', সে ভাবল, 'আমি বিনা কারণে কী করে হুট করে হাজির হই সে-শহরে যেখানে থাকে ওর স্বামী, ওর তিন বছরের মেয়ে, আর মোটের উপর যেখানে ওর গোটা সংসার, রোজকার জীবন।' শহরটা তার কাছে মনে হলো অন্যধরনের, পূত সে-শহর, সেখানে মেয়েটি কাটাবে তার নিঃসঙ্গ জীবন, হয়ত প্রায় মনে পড়বে তার কথা, মনে পড়বে হঠাৎ-দেখার কথা, নশ্বর মুহূর্তগুলির কথা, আর সে কখনো চোখে দেখতে পাবে না তাকে—চিন্তা করে হতবুদ্ধি লাগল লেফটেনাণ্টের। না, তা হতে পারে না! পাগলের মতো ব্যাপার হবে, অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার! এত তীব্র ব্যথা

বোধ করল সে, ওর সঙ্গহীন সামনে-প্রসারিত দীর্ঘ জীবনকে এত অর্থহীন মনে হলো যে, আতঙ্কে আর হতাশায় হৃদয় ভরে গেল!

'ছাইপাঁশ কী ভাবছি!' ভেবে উঠে পড়ে আবার শুরু করল পায়চারি, চেষ্টা করল পর্দার আড়ালে বিছানাটায় চোখ যাতে না পড়ে। 'কী হয়েছে আমার? আর ওর মধ্যে আহামরি কী দেখেছি, ঘটেছে কী শুনি? সত্যি সর্দিগর্মির মতো ব্যাপারটা! কিন্তু আসল কথা হলো, এই হতচ্ছাড়া শহরটায় ওকে ছাড়া বাকি দিনটা কাটাই কী করে?'

মেয়েটির সমস্ত কিছু এখনো মনে আছে তার, ওর সামান্যতম সব স্বকীয়তা. মনে আছে ওর রোদে-পোড়া চামড়াটা, লিনেনের পোশাক আর বলিষ্ঠ দেহের গন্ধ, ওর মধুর, সহজ, হাসিখুশি গলার স্বর··· ওর স্ত্রীলোকসুলভ সমস্ত মোহিনী মায়ায় নিজের তীব্র উচ্ছ্বাসের অনুভূতি এখনো আছে অসাধারণ স্পষ্টভাবে, তবু অন্য, একেবারে অভিনব এই অনুভূতিটা আরো গুরুত্বপূর্ণ এখন—যে বিচিত্র অদ্ভুত অনুভূতিটা ওর সঙ্গে থাকার সময় একবারও অনুভব করে নি, আগের রাত্রে মজার অভিজ্ঞতা হিশেবে ব্যাপারটা শুরু করার সময় কখনো মনে হয় নি এ-ধরনের অনুভূতি তার হতে পারে, এই অনুভূতির কথা ওকে আর বলা যায় না এখন। 'আর সবচেয়ে খারাপ হলো, ওকে বলতে আর পারব না কখনো!' ভাবল লেফটেনান্ট। 'কী করি? এইসব স্মৃতি আর অশান্ত যন্ত্রণার চাপে কী করে অন্তহীন দিনটা কাটাই চিকচিকে ভল্গাপারের পাণ্ডববর্জিত এই শহরটায়, ভল্গা বেয়ে তাকে নিয়ে গেছে গোলাপি জাহাজটা!'

মুক্তির সন্ধান করা দরকার, অন্যমনস্ক হবার জন্য কিছু করা চাই, যেতে হবে কোথাও একটা। মন ঠিক করে মাথায় টুপি চাপিয়ে, ছড়িটা তুলে নিয়ে ফাঁকা বারান্দায় জুতোর কাঁটা খটখটিয়ে সে ক্ষিপ্র পায়ে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ছুটল সদর দরজায়···বেশ, কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে, ফিট-ফাট পোশাকে কমবয়সী একটি গাড়োয়ান কার প্রতীক্ষায় যেন ধীরভাবে সিগারেট টেনে চলেছে। বিব্রত অবাকভাবে লেফটেনান্ট তাকাল তার দিকে: কোচবাক্সে এমন ধীরস্থিরভাবে বসে সিগারেট টানছে, সব মিলিয়ে এমন একটা সাধারণ, বেপরোয়া আর উদাসীন ভাব লোকটার আসে কী করে?—'গোটা এই শহরে বোধহয় আমি একমাত্র লোক যে ভয়ংকর অসুখী,'—ভেবে বাজারের দিকে চলল লেফটেনান্ট।

বাজারে এরি মধ্যে ভিড় কমে আসছে। শসাবোঝাই গাড়ির মাঝখান হয়ে, তাজা গোবরে পা দিয়ে নিরুদ্দেশভাবে সে চলল, চারিধারে নতুন হাঁড়ি-কুঁড়ি আর ঘটিবাটি, আর মাটিতে-বসে-থাকা মেয়েরা এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিনিশ বেচতে চাইছে তাকে। বাটিগুলো তুলে আঙুলের টোকায় আওয়াজ তুলে দেখাতে

চাইল কত খাসা জিনিশ, এদিকে লোকেদের চিৎকারে কান ঝালাপালা হবার জোগাড : 'এই যে হুজুর, এমন খাসা শসা আর কোথাও পাবেন না, হুজুর!'— সমস্ত ব্যাপারটা এত অবান্তর আর বিশ্রী যে, বাজার ছেড়ে পালাল লেফটেনাণ্ট। গির্জায় গিয়ে পড়ল যখন, তখন প্রার্থনা-সংগীত গাওয়া হচ্ছে জোর গলায়, আনন্দ ও সিদ্ধকর্তব্যের অনুভূতিতে, তারপর নদীর ইস্পাত-ধূসর সীমাহীন প্রসারের পাড়ে পাহাড়টায় ছোটো পরিত্যক্ত উত্তপ্ত বাগানে ঘোরাফেরা করল অনেকক্ষণ·· টিউনিকের ব্যাজ আর বোতামগুলো এত তেতে উঠেছে যে ছোঁয়া যায় না। টুপির ভিতরকার ফিতেটা ঘামে চটচটে, মুখটা জ্বলছে···হোটেলে ফিরে বেশ ভালো আর আরাম লাগল একতলার বড়ো ফাঁকা ঠাণ্ডা ডাইনিং-রুমে গিয়ে টুপি খুলে খোলা জানলার কাছে একটা টেবিলে বসতে; জানলা দিয়ে বইছে উত্তপ্ত হাওয়া, তবুও হাওয়া তো বটে, বরফ-দেওয়া বীট পালঙের স্যুপ ফরমাশ করল···সবকিছু বেশ ভালো, সমস্ত কিছুতে অতল সুখ, বিপুল আনন্দ; আনন্দ রয়েছে এমন কী এই গরমে, হাটের গন্ধে, অদ্ভুত শ্রীহীন অচেনা ছোটো শহরে, মফস্বলের পুরনো হোটেলটায়, তবু সেই সাথে তার বুক ভেঙে যাচ্ছে। কয়েক গেলাস ভোদকা শেষ হলো, নুন-দেওয়া শসা খেতে খেতে ভাবল, যদি কোনো জাদুমন্ত্রে ওকে ফিরিয়ে আনা যায়, শুধু যদি আর একটিদিন কাটাতে পারে ওর সঙ্গে, তাহলে কোনো দ্বিধা না-করে আগামীকাল মরে যেতে প্রস্তুত সে,—দিনটা কাটাতে চায় শুধু ওকে বলার, বোঝানোর জন্য, ওর কাছে প্রমাণ করার জন্য যে ওকে ভালোবাসে কী জ্বালায়, তীব্র অনুরাগে···কিন্তু কেন প্রমাণ করা? কেন বোঝানো? সে জানে না কেন, কিন্তু তা বেঁচে থাকার চেয়েও বেশি দরকার।

—স্নায়ুগুলোর বারোটা বেজে গেছে! —অনুচ্চকণ্ঠে বলে ভোদকা ঢালল পঞ্চমবারের মতো।

স্যুপ সরিয়ে দিয়ে, কালো কফি আনতে বলে, সিগারেট খেতে খেতে একাগ্রভাবে ভাবতে লাগল : কী করা যায় এখন, কী করে রেহাই পাওয়া যায় এই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত ভালোবাসা থেকে? তা তো অসম্ভব, কথাটা অনুভব করল তীব্রভাবে। হঠাৎ চটপট উঠে পড়ে, টুপি আর ছড়ি হাতে ডাকঘরের হদিশ নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটল সেখানে, টেলিগ্রামে কী লিখবে মনে মনে তার খসড়া প্রস্তুত : 'আজ থেকে চিরদিন, আমরণ আমার গোটা জীবন আপনার হাতে।' কিন্তু মোটা দেয়ালের পুরনো তার ও ডাকঘরে পৌঁছিয়ে হতবুদ্ধির মতো থমকে দাঁড়াল : কোন্ শহরে ও থাকে সে জানে, জানে ওর স্বামী ও একটি তিনবছরের মেয়ে আছে, কিন্তু ওর নাম ও পদবীটি তো জানা নেই! আগের রাত্রে খাবার আগে আর পরে হোটেলে বারবার জানতে চেয়েছে তার নাম, কিন্তু সে শুধু হেসে বলেছে :

—কিন্তু আমি কে, আমার নাম কী, কেন জানতে চান ?

পোস্ট-অফিসের পাশে রাস্তার কোণে একটি ফটোগ্রাফারের দোকান। অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল একটি অফিসারের বড়ো ফটোর দিকে, পুরু পাড় দেওয়া ব্যাজহ্যটো, বেরিয়ে-আসা চোখ, নিচু কপাল, অদ্ভুত চমৎকার জুলফি। বিরাট চওড়া বুক ঢাকা নানা সম্মানচিহ্নে··· কী পাগলের মতো, কী বিদ্‌ঘুটে আর ভয়ংকর লাগে সাধারণ, তুচ্ছ সব জিনিশকে যখন হৃদয় আহত হয়,—হ্যাঁ, এখন সে জানে তার হৃদয় আহত হয়েছে, ভয়ংকর সেই 'সর্দিগর্মিতে', সহ্যাতীত প্রখর প্রেমে, সহ্যাতীত বিপুল সুখে! নবদম্পতীর একটি ছবির দিকে সে তাকাল—অল্পবয়সী বরের গায়ে লম্বা ফ্রককোট, গলায় শাদা টাই, চুল ছোটো করে ছাঁটা, বিয়ের ওড়না-পরা একটি মেয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে টান হয়ে,—চোখ পড়ল একটি বাচাল চেহারার মিষ্টি মেয়ের দিকে, মাথার একপাশে হেলে আছে ছাত্রীর টুপি...তারপর তার অজানা, যন্ত্রণার বালাইহীন এইসব লোকের প্রতি ক্লিষ্ট ঈর্ষায় কাতর হয়ে সে সক্লেশে তাকাল রাস্তার ওদিকে।

—কোথায় যাই ? কী করি ?

রাস্তায় লোক নেই। বাড়িগুলোর চেহারা সবই একরকম, শাদা, দোতলা। বণিকদের সব বাড়ি, সঙ্গে বড়ো বাগান, মনে হয় জনপ্রাণী থাকে না একটায়ও; রাস্তায় পুরু শাদা ধুলোর আবরণ; চোখে ধাঁধা লেগে যায়, সবকিছু তীব্র লেলিহান, আনন্দময় সূর্যের আলোয় প্লাবিত, কিন্তু এখানে কেমন যেন লক্ষ্যহীন। দূরে রাস্তাটা কুঁজো হয়ে উপরে উঠে মেঘহীন, ছাইরঙা চিকচিকে দিগন্তে গিয়ে পড়েছে। দক্ষিণের একটা রেশ এখানে, তাতে মনে পড়ে সেভাস্তপোল, কের্চ··· আনাপার কথা। এ-সবই বিশেষ করে অসহ্য লাগে। আর মাথা নিচু করে, প্রখর আলোয় চোখ কুঁচকিয়ে, মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে টলতে টলতে জুতোর লোহার কাঁটায় হোঁচট খেতে খেতে ফিরে চলল লেফটেনাণ্ট।

হোটেলে যখন পৌঁছল, তখন শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে, সাহারা বা তুর্কিস্তানের কোথায় যেন দুস্তর পথ পার হয়ে এসেছে। শরীরের শেষ শক্তিটুকু খাটিয়ে ঢুকল নিজের বড়ো ফাঁকা ঘরে। ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়ে গেছে ততক্ষণে, মেয়েটির রেশমাত্র আর নেই, শুধু ফেলে-যাওয়া একটি চুলের কাঁটা বিছানার ধারের টেবিলের উপর! টিউনিক খুলে লেফটেনাণ্ট তাকাল আয়নায়: মামুলি অফিসারের রোদে-পুড়ে-তামাটে মুখ, বিবর্ণ গোঁফ; তামাটে রঙের জন্য আরো শাদা দেখাচ্ছে নীলচে চোখের তারা,— সে-চোখে এখন উন্মত্ত উত্তেজনার একটা ছাপ, আর মাড়-দেওয়া খাড়া-কলারের পাতলা শাদা শার্টটায় অত্যন্ত বিষণ্ন কী-একটা যেন ভাব। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে, ধুলো-মাখা টপবুট পায়ের দিকের বাজুতে রেখে। পর্দা তোলা, খোলা জানালা দিয়ে ফুরফুরে

হাওয়া এসে থেকে থেকে ফুলিয়ে দিচ্ছে পর্দাগুলোকে, ঘরে আনছে তপ্ত লোহার ছাদ আর সেই উজ্জ্বল আর এখন-একেবারে-শূন্য ও শব্দহীন পৃথিবীর উত্তাপ। মাথার নিচে হাত রেখে, একদৃষ্টিতে সামনে চেয়ে শুয়ে রইল সে। তারপর দাঁতে দাঁতে চেপে চোখ বুজল, অনুভব করল গাল বয়ে ধীরে ধীরে নামছে চোখের জল; অবশেষে ঘুম এল। চোখ যখন খুলল তখন পর্দার ওাদকে লালচে-পীতাভ আভায় সূর্য অস্তগামী। হাওয়া পড়ে গেছে, ঘরে গুমোট গরম···কালকের দিন আর আজকের সকালের কথা মনে পড়ল যেন বছরদশেকের আগেকার ব্যাপার।

ধীরেসুস্থে উঠে জামাকাপড় পরে নিল আস্তে আস্তে, পর্দা নামিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে আনতে বলল সামোভার আর বিল, তারপর ধীরেসুস্থে খেল লেবু-চা। তারপর গাড়ি আনতে বলে স্যুটকেস অন্যদের দিয়ে নামিয়ে গাড়িতে ঢুকে বিবর্ণ, মবচে তামাটে সীটে বসে দারোয়ানকে বখশিস দিল পাঁচরুবলের একটা নোট।

—মনে হচ্ছে, হুজুর, কাল আমিই আপনাকে এখানে এনেছিলাম,—লাগামটা তুলে নিতে গিয়ে ফুর্তিতে বলল গাড়োয়ান।

স্টিমারঘাটে যখন পৌঁছল, তখন ভল্‌গার উপরে নেমে এসেছে গ্রীষ্মের নীল রাত্রি, নানা রঙের ছোটো ছোটো আলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নদীতে, ঘাটের দিকে আসছে জাহাজ, মাস্তুলে ঝুলছে লণ্ঠন।

—ঠিক সময়ে এনে ফেলেছি, হুজুর!—তোয়াজ করে বলল গড়োয়ান।

তাকেও পাঁচরুবল দিয়ে লেফটেনাণ্ট টিকিট কেটে নেমে গেল স্টিমারঘাটে··· ঠিক আগের রাত্রের মতো জাহাজ ভিড়ানোর জায়গায় অল্প একটি শব্দ, দোলন্ত মেঝের দরুন একটু মাথা ঘোরা, ছুঁড়ে-ফেলা দড়াদড়ি, অল্পকিছু পেছিয়ে-আসা স্টিমারের নিচে জলের দ্রুত স্রোতের তোলপাড় আর শব্দ···আর ভিড়-বোঝাই, আলোয়-আলো, রান্নাঘরের গন্ধে ভরপুর জাহাজটায় তার মনে এল অসাধারণ একটা হৃদ্যতা ও পরিতৃপ্তির ভাব।

একমিনিট পর নদীর উজানে শুরু হলো যাত্রা সেই পথে, যে-পথে আজ সকালে চলে গেছে মেয়েটি।

বিরস, অলস, রঙিন নানা ছায়া জলে ফেলে সামনে অনেক দূরে মিলিয়ে গেল গ্রীষ্ম-গোধূলির ঘোর আভা, তার অনেক নিচে জলে তখনো ছোটো ছোটো ঢেউয়ের স্পন্দন আর ঝিকিমিকি এখানে-সেখানে, চারিদিকের অন্ধকারে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আলো ভেসে গেল দূরে, বহু দূরে···

শামিয়ানার নিচে ডেক-চেয়ারে বসে বসে লেফটেনাণ্টের মনে হলো বয়স বেড়ে গেছে দশবছর।

অদৃষ্টের পরিহাস : আকাকি বেলিয়াশভিলি

মেঠো পথে অন্যমনস্কভাবে চলেছে কারামান মৃখেইজে, নানা চিন্তার ভিড় তার মাথায়। রাস্তাটা তার নখদর্পণে, প্রতিটি আটঘাট। চালি থেকে পিৎসুন্দা আর লাতফার থেকে উৎভিরি পর্যন্ত রাস্তায় এমন কোনো পথ নেই যাতে সে একবার না একবার চোরাই ঘোড়া নিয়ে যায় নি। পুরনো খাসা সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়াতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল সে। সারামুলুকে তার মতো ঘোড়াচোর আর ছিল না! তার তুলনায় মাৎসিখ্‌ভিতিয়া নগণ্য। খাস শয়তানও কারামান মৃখেইজের মতো ধূর্তভাবে ঘোড়া লুকোতে পাবে না! ঘোড়া হারিয়ে গেল, পাত্তা আর মিলল না—সবাই বুঝত এটা কারামানের কারসাজি। কিন্তু করবার কিছু তাদের ছিল না কারামান মৃখেইজে-র বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করার মুরোদ কার?

সত্যি, কারামানের পক্ষে দিনগুলো ছিল খাসা, নেচে-কুঁদে বেড়াবার দিন!

এখন ওরা ঘোড়া-গণনার একটা ব্যবস্থা চালু কবেছে। টাকার শ্রাদ্ধ! টাকাটা পেলে কারামান বড়োলোক বনে যেত। গণনার বালাই না-করে আশেপাশের অনেক দূরের প্রতিটি ঘোড়াব কথা বলে দিতে পারত সে—কার কত বয়স, কী রং, কী ছাপ গায়ে। প্রত্যেকের বংশাবলি, ক'বার ঘুড়িগুলো বাচ্চা দিয়েছে, সব তার জানা। এমনকী কারা বাচ্চা দেবে সেটা পর্যন্ত। যা-কিছু জানার আছে সব তার নখদর্পণে!

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করল কারামান। সময় বদলেছে! পেশা ছেড়ে দিতে হয়েছে বছরদশেক হলো। জোরকদমের ঘোড়া তো দূরের কথা, জিরজিরে কোনো ঘোড়াতে হাত দেবার উপায় নেই এখন। তখন ঘোড়া-হাতানো আর হাতানোর সমস্ত চিহ্ন ঢেকে রাখা ছিল সহজ ব্যাপার—এখন চেষ্টা করে দেখুক দিকি! বলশেভিকরা বড়ো ভারিক্কি লোক, তাদের ব্যবস্থাপনা অন্য ধরনের। এখন কারমানের কাছে পড়ে আছে শুধু মধুর স্মৃতি। তার ব্যবসার ধ্বজা ছিন্নভিন্ন।

এ-ধরনের চিন্তায় মশগুল হয়ে কারামান ভাবি পায়ে চলেছে। নাবারদেভ পাহাড়ের মাথা পেরোচ্ছে এমন সময় বনের ধারে চোখে পড়ল একটা অশ্বতর, ডিমের মতো সুডৌল আর মসৃণ।

অভ্যাসবশে চট করে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল কারামান। কেউ নেই। তারপর ভালো করে তাকাল জানোয়ারটার দিকে।

ওটার তাকে ভ্রূক্ষেপ নেই, ঘাস ছিঁড়ে চলেছে।

কাছে এসে পাছায় হাত বুলিয়ে পা-দুটো পরীক্ষা করে দেখে কারামান তারিফের চোটে পিছিয়ে গেল এক-পা।

'ওরে বাবা! কী নিরীহ বুদ্ধিমান জীব!' মনে মনে বলে উঠল কারামান। 'কী চকচকে আর হৃষ্টপুষ্ট! তাছাড়া কাঁচা বয়স। অবশ্য খচ্চরের বয়সে কিছু এসে যায় না, তবু···'

জন্তুটা তখন লেজের ঝাপটে মাছি তাড়িয়ে ঠিক ভেড়ার মতো শান্তভাবে ঘাস চিবোতে ব্যস্ত। আরেকবার চারদিক দেখে নিল কারামান। বুকটা ঢিপঢিপ করছে। চুরির জন্য নিজেকে এগিয়ে দিয়েছে এমন একটা জানোয়ার আগে সে দেখেছে বলে মনে হলো না।

কথাটা ঝিলিক দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল ঘোড়াচুরির সেই পুরনো আবেগ যেটা দশবছর তাকে বিচলিত করে নি।

'হতচ্ছাড়া খচ্চরটাকে নেকড়েরা খায় না কেন! কেন বেটা আমার পিছনে লেগেছে! আমাকে দিয়ে চুরি করাতে চায়? কী করি? বুকটা দুমড়ে দিচ্ছে একেবারে। ওটাকে ছেড়ে চলে যাব? কিন্তু তাহলে আজ রাতেই বুক ফেটে যাবে! দশটা বছর কোনো জানোয়ার চুরি করি নি, সৎ হয়ে গিয়েছি ভেবে সবাই আমাকে সমীহ করে। আর এটার জন্য মুখে চুনকালি দেব! না! থাক বেটা এখানে, খুনে কোথাকার!'

কারামান রাস্তায় ফিরে গেল। জন্তুটা প্রশান্তভাবে ঘাস চিবোচ্ছে। পাঁচ পা ফেলার আগেই কিন্তু কারামানের হাঁটু দুমড়ে যাবার জোগাড়, ঘুরে আবার জন্তুটার মুখোমুখি হলো সে।

'বেটা দাঁড়িয়ে আছিস কেন? হতচ্ছাড়া বাউণ্ডুলে কোথাকার! আর কেউ-একটা এসে পড়লে বাঁচি!' অসহায়ভাবে চারদিকে তাকাল কারামান। 'তাহলে আমার মনটা স্থির হয়। বসে কিছুক্ষণ দেখি। হয়ত কেউ এসে পড়বে।'

বসে ঘাম মুছে সিগারেট ধরাল সে। কিন্তু কপাল খারাপ, রাস্তায় কারোর দেখা নেই। জানোয়ারটা ঘাস খেয়ে চলেছে। দু-একবার সামনের পা বাড়িয়ে নাকটা ঘষে নেওয়া হলো। ফিরে দেখল কারামানকে, যেন এই প্রথম নজরে পড়েছে। তারপর আবার ধীরে-সুস্থে ঘাস চিবোতে লাগল।

'বেটার ধর্মভয় বলে কিছু নেই!' ফেটে পড়ল কারামান। 'ভিখিরির মতো বসে দূর থেকে তোকে দেখছি বলে মস্করা করা হচ্ছে? আমাকে নিয়ে মস্করা করতে দিলে সারা দুনিয়ায় আমার বদনাম রটবে। বেটা দেখছি আমাকে দিয়ে চুরি করাবেই। দোষটা ওর, আমার নয়।'

তড়াক করে উঠে কারামান কয়েকটা পাতলা ডাল কেটে পাকিয়ে দড়ি গোছের

করল, সেটা এবং নিজের বেল্ট দিয়ে লাগাম গোছের একটা জিনিশ দাঁড়াল। তারপর সেটা নিয়ে গেল জানোয়ারটার কাছে।

ঘাস চিবোনো বন্ধ করল না সে।

'পালা বেটা! দেখছিস না আমার হাতে লাগাম! পালা বলছি! পালাবি না? বেশ, তাহলে আর কী! আহা মরি, বাছাকে দেখো একবার! লাগামটা পরালে মাথাটা অন্তত একবার ঝাঁকা!* এত ভালোমানুষ হওয়া ভালো নয়। সেটা অবশ্য তোর ব্যাপার! বেশ, তোর যা মর্জি! চল, তাহলে!'

নিমেষের মধ্যে কারামান জন্তুটার পিঠে চেপে চলল বনের মধ্যে।

'আহা, কী দারুণ জানোয়ার! কী নধর! দাম হবে অন্তত পাঁচহাজার। টাকাটা বলতে গেলে পকেটস্থ। জীবনে এমন ভালোমানুষ দেখি নি। আর চলার ভঙ্গিটা দেখো দিকি! আর কী চকচকে! বেটার জন্য অবশ্য পাপী হতে হলো, কিন্তু এ-রকম একটা খাসা জিনিশের জন্য পাপ করাটাও পাপ নয়।'

প্রত্যেকবার ঘোড়া চুরি করে যে-সমস্যায় কারামান পড়েছে সেটা হলো কোথায় লুকিয়ে রাখা যায়! এ-ব্যাপারে তার নিজস্ব নিয়মকানুন আছে: যদি আবখাজিয়ায় নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সে যাবে বিপরীতদিকে, যেন যাচ্ছে কাখেতিয়ায়। যদি রাচে'তে বেচবার মতলব থাকে তাহলে ভান করবে বাগদাদিতে যাচ্ছে।

এবারও তাই করল কারামান। সটান রাস্তার দিকে না-গিয়ে গেল বনের পথে; ঠেকে তার শেখা যে পাশপথ অনেক নিরাপদ, তাতে গন্তব্য যতটা তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায় ততটা হয় না সড়কে। যে-পথটা ধরল সেটা তার খুব চেনা! পথটা একটা কাঁটাঝোপ পেরিয়ে, বহুদিন-পরিত্যক্ত একটা শীতের রাস্তা ছেড়ে নেমেছে দ্জেভরভ ব্রিজে। আসল কথা হলো ব্রিজটা পার-হওয়া। পার হলে নিশ্চিন্তি।

চুরির পরিকল্পনা আগে থেকে করলে কারামানের মন ধীরস্থির থাকত, কেননা পালিয়ে যাবার পথ নিয়ে তখন মাথা ঘামাতে হতো না। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় জানোয়ার পাকড়ালে প্রথমে জানা দরকার সেটা কার, তাহলে কোনদিক দিয়ে ওটার খোঁজে লোক আসবে বোঝা যায়। মালিক কে জানা না-থাকলে অনেক বিপদের সম্ভাবনা।

তাই বন হয়ে যেতে যেতে কারামান ভেবে বের করার চেষ্টা করল জন্তুটার মালিক কে হতে পারে।

একটা ব্যক্তিগত সওয়াল দিয়ে সে শুরু করল: 'তুই কার? জবাব দে। কালা নাকি তুই! তোকে কে খাইয়েছে, জল দিয়েছে? তোর আস্তাবল কোথায়? নাঃ, মুখে রা পর্যন্ত কাটছে না দেখছি। গায়ে তো কোনো ছাপ দেখছি না, জানার উপায় নেই···দেখছি দশবছরের আলসেমিতে ঘুণ ধরেছে আমার। কার হতে

পারিস তুই ? হেঁয়ালি বটে ! দাঁড়া দাঁড়া ! ধরে ফেলেছি মনে হচ্ছে ! বুদ্ধিশুদ্ধি এখনো কিছু আছে দেখছি। তোকে চিনেছি, দোস্ত ! তুই হচ্ছিস আমব্রসি পাদ্রির খচ্চর ! পাদ্রি বেশ গুছিয়ে নিয়েছে দেখছি . তাই না ? এরকম একটা মাল বাগিয়েছে ! দেড়ে শয়তানটা তাহলে নিজের পেশা ছাড়ে নি। সময় বদলেছে, কিন্তু তাতে ওর কী ? এ-মুলুকের সব পাদ্রি লম্বা চুল কেটে ফেলেছে অনেকদিন, কিন্তু আমব্রসি ঠাকুর কাটে নি, বেটা নাস্তিক ! আজকালকার দিনে খচ্চর নিয়ে ওর ফয়দাটা কী ? গির্জেয় বিয়ে হয় না, নামকরণ হয় না, পুজোয় যেতে হয় না, তবু তোকে ছাড়বে না, আগেকার দিনের হোমরা-চোমরা লোক যেমন কখনো নিজের ছোরা হাতছাড়া করত না। তোকে দেখে তো যে-কেউ বলতে পারে তুই একদম বেকার, চেহারাটা তো দেখছি রাজকুমার সেবেতোলির বিধবা বউয়ের মতো নধর !'

এইসব চিন্তায় মগ্ন হয়ে কারামান পাহাড়ের বন-ছাওয়া ঢালু বেয়ে নেমে পৌঁছল প্রনা নদীর তীরে। জানোয়ারটা বেশ কদমে পা চালিয়েছে, যেন পিঠে কাউকে চাপিয়ে বেশ খুশি। কারামানের পুলক দেখে কে !

'কী সুন্দর জন্তু ! জীবনে তোর মতো খচ্চর হাতে পড়ে নি। ট্রেনের মতো ? না, ট্রেন নয়। মোটরগাড়ি ? না, তাও নয়। ও-সবের সঙ্গে তোর তুলনা করা মানে তোকে হেনস্থা করা। তুই হচ্ছিস একটা হাওয়াই-জাহাজ, ঠিক তাই, হাওয়াই-জাহাজ ! তুই তো কদমে পা ফেলিস না, উড়ে যাস ! তুই চুরির মাল না-হলে তোকে কখনো ছাড়তাম না, দুনিয়ার কোনো-কিছুর বদলে ছাড়তাম না !'

ঝোপঝাড় এত সুকৌশলে ঠেলে, লেয়ানার মধ্য দিয়ে এত হালকাভাবে ভেসে জন্তটা এত উৎসাহে চলতে লাগল যে গতিবেগ কমল না মুহূর্তের জন্য।

'বেটা নির্লজ্জ, তোকে বেচতে গিয়ে যে কেঁদে ফেলব তাতে তোর সরম হচ্ছে না ? দাড়িওয়ালা একটা মানুষ কেঁদে ফেলবে দেখে লোকে বলবে কী ? তোর সরম হচ্ছে না ? না ?'

দ্জেভরভ ব্রিজে পথটা শেষ হলো। ব্রিজ পেরোলে কারামানের পিছু-ধাওয়া কেউ করবে না, কেননা ওখান থেকে চতুর্দিকে রাস্তা গিয়েছে, কোন রাস্তা সে নিয়েছে তা কেউ জানতে পারবে না।

বেশ ভরসা নিয়ে ব্রিজ পর্যন্ত গেল কারামান, ওপারে গিয়ে কখন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। কিন্তু হঠাৎ ওর হাওয়াই-জাহাজের মতো অশ্বতর থেমে গেল।

'কী হলো ? ক্লান্ত বুঝি ?' স্তোক দিয়ে জিজ্ঞেস করল কারামান। 'এই তো ব্রিজটা শুধু পার হব, তারপর তুই জিরিয়ে নিস। ওখানকার ঘাস এত মিষ্টি যে আমারো মুখে বেশ রুচবে মনে হচ্ছে।'

হালকাভাবে গাছের ডালটা তুলল সে, তার কোনো সন্দেহ নেই যে কয়েক

মুহূর্ত পরেই ওপারে ও পৌঁছিয়ে যাবে, পৌঁছবে গভীর বনে তীক্ষ্ণ সব দৃষ্টির আড়ালে।

একচুল নড়ল না জানোয়ারটা। অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল কারামান।

'ওহে, থেমে যাবার মানেটা কী শুনি? ও, বুঝেছি! একটু ইয়ার্কি করা হচ্ছে! কিন্তু দোহাই বাপু, ওটি করিস না তোর মায়ের দিব্যি! ঠাট্টা-ইয়ার্কির সময় নয় এটা। কেউ হয়ত এসে পড়বে এখ্‌খুনি। চল, সাঁকোটা পার হই, চল!'

এমনকী কান পর্যন্ত নাড়াল না জন্তুটা। সামনের পা-দুটো ব্রিজের পাটাতনে রাখল। এখান থেকে নড়ার মতলব যে নেই সেটা স্পষ্ট।

'অনেক হয়েছে! খোলামেলা জায়গায় আমাকে চেঁচাতে হবে নাকি? তোর লজ্জা বলে কিছু নেই? সারাপথ তোর তারিফ করেছি, করি নি?' জুতোর ডগায় জন্তুটাকে হাল্‌কা সুড়সুড়ি দিয়ে, গোঁক দিতে দিতে বলল কারামান।

লেজ দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জন্তুটা।

'হয়েছে! চল! ভাবিস না আমি চটতে পারি না!' এবার গলা উঁচিয়ে বলল কারামান। 'যদি আমাকে ভালোবাসিস তো চটাস না বলছি! চল!'

কিন্তু জন্তুটা নাছোড়বান্দা হবে বলে ঠিক করেছে। কানদুটো নাড়িয়ে লেজটা আরো জোরে ঝাঁকাল সে।

'তুই চাস বুঝি এখানেই রাত কাটাই? কানদুটো মোড়া হয়েছে দেখছি। নিজেকে কী ভাবিস বল তো? শোন, আমি একবার রাজকুমার সুলুকিজের ঘোড়াকে চাবকেছিলাম! চল বেটা, যা বলছি কর!'

ধৈর্য হারিয়ে কারামান গাছের ডাল দিয়ে জন্তুটাকে বেশ জোরে এক ঘা বসাল।

রেগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সে আরো-জোরে পাটাতনে পা ঠেসে দাঁড়াল।

'বেটা বেইমান! তোর সঙ্গে রাগারাগির ইচ্ছে নেই, কিন্তু তুই বাধাচ্ছিস সেটা। চল বলছি! নইলে এমন একটা পেঁদানি খাবি যা আমার সবচেয়ে বড়ো শত্রুরও যেন কখনো খেতে না হয়! তবে রে?'

মিনিটদশেক কারামান সপাসপ মেরে চলল জন্তুটাকে, কিন্তু তাতে জানোয়ারটা আরো একরোখা হয়ে একচুল নড়ল না।

কারামান একটু জিরিয়ে নিল। চাবকে কিছু লাভ হবে না জেনে আবার মিষ্টি কথায় ভোলাবার চেষ্টা করল সে।

'দেখ, আমার দশাটা দেখ। তোর লজ্জা বলে কিছু নেই? আমার গর্ব আছে আর তুই দুনিয়ার সামনে আমাকে অপদস্থ করছিস! আয় ব্রিজটা পার হই! ডরাবার কিস্‌সু নেই। পড়বি না। আচ্ছা, আমিই প্রথমে যাচ্ছি, যদি তাই চাস তুই। ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রাক চলে আর তোর ভার সইতে পারবে না এটা?'

জন্তুটার পিঠ থেকে নেমে যেমন-তেমন সেই লাগামটায় টান দিতে লাগল কারামান। একবার ধমকায়, একবার মিষ্টি কথা বলে। কোনো লাভ নেই। নড়ল না জন্তুটা।

মেজাজ চড়ে গেল কারামানের। ভীষণ চোখ পাকিয়ে সে তাকাল তার দিকে, লড়িয়ে-মোরগের মতো।

'তুই ভাবছিস আমি লম্বা-চুলো পুরুতঠাকুর, লোক হাসাবি? তোকে ব্রিজ পার না-করাতে পারলে আমার নাম কারামান মৃখেইজে নয়। আমাকে এখনো চিনিস নি দেখছি।'

চারদিকে তাকাতে একটা শক্ত লাঠি নজরে পড়ল রাস্তার মাঝখানে, ঝট করে সেটা তুলে নিল কারামান। সে যাতে পিঠে না-চাপতে পারে তৎক্ষণাৎ তার ব্যবস্থা করল জানোয়ারটা। পা ছুঁড়ে শুরু করল লাফাতে। কিন্তু এ-ধরনের ছেলেমানুষি ফিকিরে ঘাবড়াবার পাত্র নয় কারামান। কিছুক্ষণ পরে কষ্টে সে তার পিঠে চেপে লাঠিটা উঁচিয়ে ধরল।

'এইবার দেখ!' চেঁচিয়ে বলে প্রাণপণ শক্তিতে লাঠিটা বসাল জন্তুটার পাছায়।

কাতরে উঠে জন্তুটা পিছনের পা-দুটো ছুঁড়ল।

'চল বেটা!' আর এক ঘা বসাল কারামান।

আবার কাতরে উঠল সে, নড়ল না একচুল।

কারামান তখন পাগল হয়ে গিয়েছে, প্রাণপণে মারতে লাগল তাকে।

শুয়োরের মতো চেঁচিয়ে উঠে পিঠ থেকে তাকে ঝেড়ে ফেলার জন্যে পা দাপাতে লাগল জন্তটা। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণা আর সইতে না-পেরে এত জোর ঝটকায় ঘুরল যে আর-একটু-হলে কারামান পড়ে যেত। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল সে। চড়াই-উতরাই, খানা-খোঁদল আর বন, কিছুতে এসে যায় না, জোরকদমে সে দৌড়ল। ঝুলে-পড়া ডালপালায় চোখ উপড়ে না-যায় শুধু সেটা দেখা ছাড়া আর কিছু করার উপায় নেই কারামানের।

জন্তুটাকে থামাবার যত চেষ্টা সে করছে তত জোরে দৌড়চ্ছে সেটা। শেষে ওটার সামনের পাগুলোর নিচে পায়ের ডগা বসাতে পেরে আগের চেয়ে নিরাপদ বোধ করে হাঁফ ছাড়ল সে।

'দৌড়ো, দৌড়ো, আহাম্মক কোথাকার!' বিড়বিড করে সে বলল। 'থামতেই তো হবে তোকে। কতক্ষণ আর দম থাকবে। আমার হাত থেকে ছাড়ান পাবি না!'

হঠাৎ একটা ভাঙা পাথরের দেয়াল হাল্কা পায়ে পার হয়ে জন্তুটা একটা বাড়ির খিড়কিতে ঢুকে দরজার সামনে দাঁড়াল।

দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে এসে আমভ্রসি পাদ্‌রি, জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকাল কারামানের দিকে।

হতভম্ব হয়ে বসে রইল কারামান।

নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত তার কাছে এল পাদ্‌রি। বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি নাকি, কারামান ?'

'হায়, কারামান না-হয়ে যদি আর-কেউ হতাম', মনে মনে বলল ঘোড়াচোর।

'বেশ করেছ, বাছা ! হতচ্ছাড়া জানোয়ারটাকে কোথায় পেলে ? মাসখানেক হদিস মেলে নি। কত জায়গায় না খুঁজেছি···নামো, নেমে পড়ো। বেটা তোমার ধকল করেছে দেখছি। বেজায় ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমায়।'

নেমে কারামান পাদ্‌রির দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল, পরাজিত জেনারেলের মতো আবছা সে-দৃষ্টি। সত্যি, চোরাই খচ্চর নিয়ে হাতেনাতে ধরা-না-পড়াটা হাঁফছাড়ার মতো ব্যাপার, তবে লজ্জাকর পরাজয়ের একটা বোধ তাকে পেড়ে ফেলেছে।

'বেটা বদমাসকে পেলে কোথায় ?' আনন্দে বকবক করে চলেছে আমভ্রসি। 'দেখো তো, নিজে চরে-চবে কেমন নধর চেহারাটা বাগিয়েছে। একগুঁয়ে জন্তুটাকে বাড়িতে কী করে ফিরিয়ে আনতে পারলে বলো তো ? তাজ্জব কাণ্ড ! অনেক ধন্যবাদ, বাছা ! তোমার এ-উপকার কখনো ভুলব না !'

অশ্বতরের দিকে তাকাল কারামান, বলল না কিছু। ব্যাপারটা কী-ভাবে ঘটে তার নিজেরো ঠিকমতো জানা নেই।

আর জানোয়ারটা প্রশান্তভাবে ঘাস চিবোতে চিবোতে লেজ দিয়ে ভনভনে মাছি তাড়াতে লাগল।

কবিতাভাবনা

বাংলা কবিতা

কবিতার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কী সেটা স্পষ্টভাবে বলা কঠিন। অনেকে বলেন কবিতা আসে শুধু অন্তঃপ্রেরণার তাগিদে। কথাটি বলা সহজ, কিন্তু সঠিক নয়, কারণ অন্তঃপ্রেরণা শুধু অন্তরের জিনিশ নয়, তার মূল উৎস বিশাল ও বিক্ষুব্ধ বহির্জগত। এ-সূত্রে কবিতার ভাষা ও ভাষার ব্যক্তিগত, স্বতন্ত্র ব্যবহারের কথা উল্লেখ করতে পারি। আমরা কোনো বিশেষ সমাজে বিশেষ সময়ে জন্মাই, এবং সামাজিক জীব হিশেবে প্রচলিত কোনো ভাষা ব্যবহার করি। কিন্তু কবিতা লেখার সময় সে-ভাষার উপরে যে স্বতন্ত্র ছাপ পড়ে তার নাম ডিকৃশন, এবং এই স্বতন্ত্র ব্যবহারের শক্তি কবির পুরুষকারের পরিচায়ক। অথচ এই পুরুষকার কাজ করে বহুশতাব্দীর শ্রমলব্ধ জটিল ব্যাকরণের সাহায্যে, এবং একটি বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতির পটভূমিকায়। কবিতা অনেকটা নাটকীয় স্বগতোক্তির মতো, কিন্তু কাব্যবিচারে আমরা নাটকের কথা ভুলে যেতে চেষ্টা করি কিংবা অস্বীকার করি। পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভরতা অস্বীকার করা অসম্ভব। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব বিশিষ্টভাবে উপলব্ধি করা, মেনে নেওয়া স্বাধীনতার সূত্রপাত।

এখনো অনেকে বিশুদ্ধ কবিতায় সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন ; এঁরা হচ্ছেন পূর্বযুগের ক্রিশ্চানদের মতো, যাঁরা কুমারী মেরীর বিশুদ্ধ গর্ভধারণে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন। কবিতার কারণ এঁদের কাছে অনাবিল অন্তঃপ্রেরণা. অন্তঃপ্রেরণা এঁদের কাব্যলোকের নিরাকার ব্রহ্ম, একমেবাদ্বিতীয়ম্। একটি সহজ সত্য এঁরা ভুলে যান যে ভিতরের প্রেরণা যদি কবিতার মূল এবং একমাত্র উৎস হতো তাহলে প্রতিবছরে, প্রতিমাসে, প্রতিসপ্তাহে মহৎ কবিতা রচিত হবার পথে কোনো অন্তরায় থাকত না। কাব্যের ইতিহাসে অন্তরায় আসে, তার কারণ কবিতা বিশুদ্ধ কল্পনা নয়, পরিবর্তনশীল শ্রেণীগতির, স্থানকালপাত্রের মুখাপেক্ষী, এবং মুখাপেক্ষী হলেও মাঝে-মাঝে সমাজের মুখ-বদলানোর কাজে সাহায্য করতে পারে। সামাজিক পরিস্থিতি এবং অন্তঃপ্রেরণার মধ্যকার আত্মীয়তা জটিল কিন্তু অনস্বীকার্য। আমরা কিন্তু একটিকে মানলে অপরটিকে অবহেলা করি, মনে করি কাব্যের ঈশ্বরকে মানলে সমাজের কুবেরকে মানা অসম্ভব।

এ-সব কথা বলার প্রয়োজন বিংশশতাব্দীর তৃতীয়দশকে বোধকরি নেই, কিন্তু বাংলাদেশে যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করে দেখলে এ-কথা সহজে বোঝা যায় যে কাব্যবিচারের পার্থক্য প্রকৃত কাব্যরচনাকে কীভাবে

প্রভাবান্বিত করে। যাঁরা বিশুদ্ধ সাহিত্যে বিশ্বাস করেন, এবং তাঁদের সংখ্যা বাঙালি কবিদের মধ্যে এখনো বেশি, তাঁদের লেখায় ভারসাম্য ক্রমশই কমে আসতে থাকে, এবং তাঁদের প্রতিভা শেষ পর্যন্ত কয়েকটি ম্যানারিজমের প্রকাশে, পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি না-থাকলে কাব্যে মূলস্ত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, এবং মূলস্ত্রহীন কাব্য একধরনের মস্তিষ্কবিকৃতির নামান্তর।

কবিতা অবশ্য ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে; এবং ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া বলতে চলতিভাষায় সাধারণত আমরা হৃদয়াবেগ বুঝি। কিন্তু হৃদয়াবেগেরও প্রকারভেদ আছে। বাংলা কবিতার অধিকাংশ এত নির্জীব তার কারণ আমাদের কাব্যে Significant emotion-এর একান্ত অভাব। এর জন্য মূলত দায়ী ভারতীয় ইতিহাসের গতি, এবং এরি প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের শেষের দিকের প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথকে যে-যুগ জন্ম দিয়েছিল, সে-যুগের প্রাণশক্তি বহুপূর্বে নিঃশেষিত। তাঁর সময়ে যেটা ছিল কাব্যেব বিষয়বস্তুর উপযুক্ত, এবং যে-ভঙ্গিতে তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন, তাদের জীবনশক্তি আজকে নেই। এ-সব প্রসঙ্গ অনেকটা অবান্তর। কিন্তু যুগধর্মের, কালান্তরেব কথা মুখে বললেও এদের প্রকৃত অর্থ অনেকের কাছে দুর্বোধ্য। সে-জন্য মাঝে-মাঝে অতি-সাধারণ কথার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। ভারতবর্ষে বুর্জোয়া সভ্যতার প্রগতিক ফলাফলের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আগে মাইকেলের মতো কবি ছিলেন, কিন্তু পরে রবীন্দ্রনাথের মতো উল্লেখযোগ্য কবি হয় নি। দাসদেশে বুর্জোয়া সভ্যতার অগ্রগতি অল্পদিন পরেই দমিত হয়, কারণ বর্ধিষ্ণু দাসদেশ বুর্জোয়া প্রভুব স্বার্থবিরোধী। কয়েকদিনের ক্ষিপ্র চকিত প্রগতি, তারপর নিরুদ্ধগতি, এদের দোটানায় আর যাই হোক, কোনো দেশীয় প্রাণবান ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও এই দোটানার প্রভাব বর্তমান।

তাই আমাদের কাব্য প্রকৃত ঐতিহ্যহীন। একহিশেবে ভারতের বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য রবীন্দ্রনাথে শেষবারের জন্য স্বধর্মে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। যে স্বতন্ত্র দেশীয় ঐতিহ্যের গৌরব আমরা করি আসলে তা স্বাবলম্বী নয়, বর্তমানে তার নিজস্ব মেরুদণ্ড নেই। এর অভাবে বিচারবুদ্ধিকে আমরা ববাবর বিসর্জন দিয়েছি, অনুভূতির নামে ভাববিলাসের জয়গানে আমরা মুখর। রোমান্টিক আন্দোলনের একটি অন্যতম বিশেষত্ব, বিচাববুদ্ধির ও অনুভূতির মধ্যে তীক্ষ্ণ পার্থক্য-টানা এবং প্রথমটির বিসর্জন, আমাদের দেশে উর্বর ভূমি পেয়েছে। এ-ধারার সঙ্গে মিশেছে বৈষ্ণব কবিতার ভাববিলাস। আমাদের কবিতার রক্তস্বল্পতার এটি একটি কারণ, অবশ্য এর প্রধান কারণ লেখক ও সমাজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান। ইচ্ছে থাকলেও এ-ব্যবধান কাটিয়ে ওঠা বাঙালি কবিদের পক্ষে কঠিন। ভাবেব ও ভাষার যে-ভঙ্গিতে আজকাল তারা অভ্যস্ত, সাধারণ জীবনের সঙ্গে তার সহজ যোগসূত্র

নেই। পৃথিবীর সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের পরিচিত করেছে বটে, কিন্তু বণিক সভ্যতার গতিতে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে, সত্যিকার শিক্ষিত এবং অর্ধ শিক্ষিতের মধ্যে দুস্তর পারাবারের সৃষ্টি করেছে। ভারতবর্ষের অসংখ্য লোকের অক্ষরজ্ঞান নেই, সুতরাং লেখক ও পাঠক বলতে সাধারণত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই বোঝায়। এই রেডিও-পীড়িত সিনেমা-জর্জরিত, ফুটবল-উৎকণ্ঠিত শ্রেণীর জীবন-যাত্রা শেষ পর্যন্ত মহৎ কবিতার পরিপন্থী। ফলে আমাদের দেশের বিশিষ্ট আধুনিক কবিরা নিঃসঙ্গ, এবং নিংসঙ্গতায় লাভের চেয়ে লোকসান বেশি। যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষে আমূল সমাজবিপ্লব না-ঘটে, কুটিল কালচক্রে ভাঙন না-ধরে, ততদিন এই নিঃসঙ্গতা, হতাশা আর অবিশ্বাস, বর্তমান সভ্যতার যেগুলি বিশেষত্ব, তাদের ঘিরে থাকবে, ততদিন তাদের শ্রেষ্ঠ রচনা প্রাণবান মূলসূত্রের অভাবে পীড়িত হবে। ইতিমধ্যে নেইমামার চেয়ে কানামামার অন্বেষণ করাই ভালো। রিয়ালিটির থেকে নিষ্কৃতির চেষ্টা পরাজয়ের দুর্বল ভঙ্গি, প্রকৃতির স্বপ্নলোক ক্লীবের অলীক স্বর্গ। অন্য-দিকে সাংসারিক সচেতনতা আধুনিক বাঙালি কবিদের সাহায্য করতে পারে, কারণ সচেতনতা, এমনকী নিজেদের সামাজিক ব্যর্থতার সচেতনতাও, ক্ষমতা এবং সংযম আনে। কালক্রমে যখন তাঁদের বিষয়বস্তুতে আসন্ন পরিবর্তনের ভাঙন ধরবে তখন অন্তত তাদের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পরবর্তীযুগের কবি এবং পাঠকেরা কৃতজ্ঞ থাকবেন।

অতি-আধুনিক বাংলা কবিতা

উপরোক্ত নামের একটি সমালোচনা 'অগ্রণী'-র এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এ-সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে, কারণ সমালোচক বিনাকারণে শূন্যে ঘন ঘন ছোবল মেরেছেন, এবং আমার লেখা 'In Defence of the Decadents' শীর্ষক যে-প্রবন্ধটি সম্বন্ধে তাঁর ঘোরতর আপত্তি, তার সারাংশ দিতে গিয়ে আমার বক্তব্যের বিকৃতি অনেক জায়গায় করেছেন। 'In Defence of the Decadents' New Indian Literature-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু পত্রিকাটি কাছে না-থাকায় পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করতে হয়েছে, ফলে দু-এক জায়গায় ভাষার অদলবদল থেকে যেতে পারে। কিন্তু তাতে ভাবের দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নেই।

হাওয়ায় ছোবল মারার কথা এ-ক্ষেত্রে নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক নয়। সমালোচকেব কী-কারণে জানি না দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে আমি নিজেকে 'বিপ্লবী' কবি বলে প্রচার করি, অথচ আসলে আমি নির্বোধ, কিংবা প্রবঞ্চক, বিপ্লবী নই; এ নিদারুণ জুয়াচুরির জন্য তিনি মর্মাহত ও ক্ষিপ্ত বোধ করেছেন। তাঁর এই মূল অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কারণ জ্ঞাতসারে কোনো কবিতা কিংবা অন্য লেখায় আমি নিজেকে 'বিপ্লবী' বলে জাহির করি নি, উপরন্তু কর্মভীরু, পলাতক, আধা-বাস্তব-আধা-রোমান্টিক ভাবেই আমার কাব্যের নায়ককে বর্ণনা এবং বিদ্রূপ করে এসেছি। 'গ্রহণ'-এর নাম-কবিতায় যে-টাইপের জীবন এবং আত্মপরিক্রমার কথা আছে সে-টাইপ বিপ্লবী নয়, মুমূর্ষু শ্রেণীর প্রতীক, সেটা বোঝাবার জন্য একটি লাইনও উদ্ধৃত হয়েছিল: The waking have a common world but the sleeping turned aside each into a world of his own. যদি লোকমুখে 'অগ্রণী'র সমালোচক 'বিপ্লবী' বিশেষণ আমার সম্বন্ধে শুনে থেকে ক্রুদ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে আমি নিরুপায়। আমার প্রবন্ধটি বাংলা কবিতা এবং সমালোচনার কয়েকটি ধারার বিষয়ে লিখিত, 'আপন সাহিত্য রচনার বৈপ্লবিকতা···ব্যাখ্যা' করার কোনো উদ্দেশ্য তাতে ছিল না; বাংলা কবিতার আলোচনাকে নিজের কবিতার আস্থায় রূপান্তরিত করতে আমি সচেষ্ট হই নি। বরং তাছাড়া উপরোক্ত প্রবন্ধটির যে-ব্যাখ্যা সোজা বাংলায় তিনি করেছেন, তাতে আমার মতো বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবীর বিস্মিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি নম্বর করে প্রবন্ধটির সারাংশ (!)

দিয়েছেন। সে-নম্বরগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে প্রবন্ধের কয়েকটি অংশ পড়লে মন্তব্যের প্রয়োজন আশা করি বিশেষ হবে না।

"(২) ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রী সমাজ 'decadent' অতএব এ-সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা অসম্ভব এবং decadent সাহিত্যই একমাত্র আন্তরিক সাহিত্য। এই আন্তরিকতার জন্য decadent হইয়াও তাঁহাদের সাহিত্যে বৈপ্লবিক শক্তিমত্তা বর্তমান।"

আমার প্রবন্ধের একটি অংশ : "In these times of dereliction and dismay, of wars, unemployment and revolutions, the decayed side of things attracts us most...Perhaps that is because we have our roots deep in the demoralised pettybourgeoisie and lack the vitality of a rising clas."

"(৩) ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে-কোনোরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি।"

"Consciousness of decadence is certainly a power." (In Defence of the 'Decadents') এখানে 'শক্তি'র কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বৈপ্লবিক বিশেষণটি সমালোচক যোগ করেছেন। উপবোক্ত পঙ্‌ক্তিতে সচেতনতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে : 'Subjective initiative' আধুনিক কবিতায় অত্যন্ত প্রয়োজন সে-কথা সমালোচক স্বীকার করেছেন. তাঁর অভিধানে সচেতনতার কী অর্থ সেটা আমার জানা নেই।

আর-একটি জায়গায় তিনি লিখেছেন : "শ্রীযুত সেন বলিবেন, তিনি বিপ্লবী কবি বটে তবে বিপ্লবীশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই, অর্থাৎ কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করিতে হইলে বিপ্লবীশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সাহিত্যে কিংবা কাব্যে নহে। Revolutionary training এড়াইয়া বিপ্লবী সাজিবার ইহা এক অদ্ভুত কৌশল।"

এ-প্রসঙ্গের প্রথম বক্তব্য যে, আমার প্রবন্ধে আধুনিক বাংলা কবিতা কি আমার নিজের কবিতা সম্বন্ধে 'বিপ্লবী' বিশেষণ একবারও ব্যবহৃত হয় নি, শুধু বলা হয়েছে যে গত দশবছরের মধ্যে বাংলা কবিতার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। উন্নতি এবং বিপ্লব আশা করি এককথা নয়। তাছাড়া গণ-আন্দোলনে যোগদানের সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধে এই কয়েকটি কথা শেষের দিকে ছিল : "Consciousness of decay is certainly a power. But a critical situation arises where we find that at a certain stage this also is not enough....We will reach that stage very soon, and we must make a choice if we are to continue as living writers. This involves an entire re-construction

of our ways of living. An active part in the mass-movement will certainly help that poet who has been able to preserve his integrity···He who is bent on living in a little cell, all will be dying with a little patience."

এলিয়টের নাম উল্লেখ করে আমি সমালোচকের বিরাগভাজন হয়েছি। তিনি লিখেছেন : "সাম্যবাদীগণ ইলিয়টি সাহিত্যিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেন, Marxist সেন তাহাকে বিপ্লবী বলেন, কারণ 'people say."

আমার প্রবন্ধে এলিয়টকে বিপ্লবী কবি বলা হয় নি, তবে এটা বলা হয়েছে যে আধুনিক প্রগতিক ইংরেজ কবিদের উপর তাঁর প্রভাব অসামান্য। অডেন প্রমুখাদি সাম্যবাদী কবিরা এলিয়টের প্রভাব এবং ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার কবতে কখনো কার্পণ্য করেন নি, এবং সাহিত্যে যে-অন্তর্দৃষ্টি থাকলে এলিয়টি-সাহিত্যের মুল্যবিচার সম্ভব তার উপস্থিতি কডওয়েলের 'Illusion and Reality' নামক পুস্তকে আছে। এবং আমার যতদূর জ্ঞান তাতে কডওয়েলকে সাম্যবাদী বলেই জানি। শক্তি থাকলে ধনতন্ত্রের অনেক গলিত অংশ নিঙড়ে বিপ্লবের ফোঁটা সংগ্রহ করা যে সম্ভব সেটা আমাদের সাম্যবাদী সমালোচক জানেন না কিংবা মানেন না, কিন্তু এলিয়টের 'decadence' নিঙড়ে অনেকফোঁটাই আধুনিক ইংরেজ কবিরা কাজে লাগিয়েছেন (এ-প্রসঙ্গে Day Lewis-এর 'A Hope for Poetry', Spender-এর 'The Destructive Element', 'The Arts To-day'-তে Macniece-এব প্রবন্ধ পঠিতব্য)।

আধুনিক বাংলা কবিতা যাঁরা লেখেন তাঁদের অনেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন নি, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাঁদেব মধ্যে অনেকেই শক্তিমান লেখক, তাঁরাই এতদিন রাজত্ব করে এসেছেন এবং মধ্যবিত্ত সমাজের উপর কিছু-কিছু প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। এর কারণ কী? কারণ এদের অনেকে মধ্যবিত্ত জীবনের গ্লানি এবং বহুমুখী ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতন, এবং সত্য শিব সুন্দরের অবাস্তব মায়া কাটিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রকাশভঙ্গিতে পরিবর্তন এনেছেন। নিপীড়িতশ্রেণীর আশা-ভরসা, কিংবা সংগ্রামের সংযম এঁদের লেখায় আজ পর্যন্ত বিশেষ মেলে না, কারণ গণ-আন্দোলনের সঙ্গে এঁরা সংশ্লিষ্ট নন। এবং যেহেতু যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং আছেন ("মধ্যবিত্ত সমাজের 'ইস্পাতকঠিন যে-অংশ ব্যক্তিগত ভাবাদর্শে কিংবা নিষ্ঠুব পারিপার্শ্বিকতার আঘাতে বিপ্লবপ্রবাহের সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছে বা দিতেছে") তাঁরা এখন পর্যন্ত বিপ্লবী সাহিত্য রচনা করতে পারেন নি, সেহেতু প্রথমোক্ত ভদ্রলোকদের কানামামা হিশেবে নেওয়াই কর্তব্য। নেই মামার চেয়ে কানামামা শ্রেয়। ভবিষ্যতে ইতিহাস অন্তত কানামামা হওয়ার জন্য এঁদের মূল্য দেবে, এবং যদি

তাঁরা জীবন ও সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী পরিবর্তন আনতে অক্ষম হন, তাহলে বিদায় দেবে। কিন্তু সে-সময় 'নির্বোধ', 'প্রবঞ্চক' ইত্যাদি ছাড়া অন্যান্য বিশেষণ বোধহয় সাম্যবাদী সমালোচনা-সাহিত্যেব অভিধানে পাওয়া যাবে। বর্তমানে ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং নিষ্ফল আক্রোশ Marxist সমালোচনাব নামে যদি চলে তাহলে বিস্মিত হওয়াটা মানসিক বিলাস, কাবণ বাংলাদেশেব আজ যে-অবস্থা তাতে অগ্রগামী ব্লক বাতাবাতি গুণ্ডাব্রকে পরিণত হলেও বাহবা পায়। যে-গালিগালাজ, যে-উগ্রবামপন্থা আজ সাম্যবাদেব নামে সমালোচনা-সাহিত্যে আস্ফালনরত সেটা পূর্বতন বাঙালি সন্ত্রাসবাদেব দায়ভাগ।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা

গত দশ-বারোবছরে বাংলা কবিতার ভাষা অনেক সহজ হয়েছে ; কবিতাপাঠের সময় বারবার 'চলন্তিকা' দেখতে হয় না কিংবা কোথাও কোনো ইংরাজি কবিতার প্রতিধ্বনি অথবা গূঢ় উল্লেখ আছে কি না ভেবে মাথা চুলকোতে হয় না। তা ছাড়া বাইরের ব্যাপ্ত পৃথিবী ও প্রকৃতির প্রতি আমাদের প্রেম মানুষের প্রতি বাইবেলকথিত ঈশ্বরের প্রেমেব মতোই আজকাল সরব ও অকুণ্ঠিত।

সঙ্গে সঙ্গে আজকালকার কবিতার আবেকটা বিশেষত্ব নজরে পড়ে। সেটা হচ্ছে কোনো কবিতা সমগ্রভাবে হয়ত মনে কিছু দাগ কাটে, কিন্তু কোনো বিশেষ পঙ্‌ক্তি কিংবা কোনো বিশেষ ছবি সবসময় মনে থাকে না। অর্থাৎ আবেগ দু-একটা ছবিতে কিংবা দু-একটা লাইনে দানা না-বেঁধে সমস্ত লেখায় শিথিলভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকসময় উচ্ছ্বাসে মিলিয়ে যায়।

কবি শক্তিমান হলে এই বিস্তারের ফল যে শুভ হয় সেটা নিঃসন্দেহ। কিন্তু কবিদেরও বিচ্যুতি হয় বাবেবারে ; অনেকসময় বিলম্বিত লয়ে বিস্তাবটা আবেগ-প্রসূত না হয়ে ছন্দের ও অভ্যাসের ঠেলায় হয়। এবং যেহেতু দশটা কবিতা লিখলে বড়োজোর হয়ত একটা উতরোয়, সেহেতু পাঠকদের বিড়ম্বনার সম্ভাবনা আজকাল অনেকবেশি।

কাব্যে শিথিলতার অভিযোগ শুধু তরুণ কবিদেরই নয়। অনেক প্রবীণ কবি, যাঁরা আগে আবেগকে ঘষে-মেজে লাইন বানাতেন, তাঁদের৭ আজ বেশি কথা বলার দিকে ঝোঁক স্পষ্ট। এই পরিবর্তনের ফল শেষ পর্যন্ত হয়ত শুভ হবে, কেন না এর পিছনে আছে গোষ্ঠী থেকে সমাজে বেরোবার তাগিদ।

তিরিশদশকের কবিরা সাহিত্যিকগোষ্ঠীর জীব ছিলেন বলেই অল্পকথায় বেশি বলার চেষ্টা করতেন সেজন্য তাঁদের লেখায় মাঝে-মাঝে স্বয়ংসম্পূর্ণতার আভাস আসত। দুর্বোধ্য হলেও কাব্যের শ্লথ দেহে ঋজুতা তাঁরা এনেছিলেন। সেটা অনস্বীকার্য।

তখনকার আর বর্তমান লেখনভঙ্গির তফাতের আরেকটা কারণ আছে। তিরিশদশকের কবিদের উপব প্রভাব ছিল এলিয়ট, পাউণ্ড, ইয়েট্স ইত্যাদির। তারপর সাহিত্যগোষ্ঠী এসেছে প্রত্যক্ষ রাজনীতির দুর্বার প্রভাবে ; যুদ্ধের বিপর্যয় ও জয়ের গৌরব, নতুন চীনের আবির্ভাব এবং আমাদের দেশে ১৯৪৭-এর মনিব-বদলের ফলে রুশ, ফরাসি, তুর্কি, চিলির কবিদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়

হয়েছে। তাঁদের বিস্তার ও মানবিকতা যে আমাদের লেখায় ছাপ ফেলবে সেটা স্বাভাবিক এবং সুখের বিষয়। কিন্তু তাঁদের সহজ মানবিকতার পিছনে যন্ত্রণার ইতিহাস আছে, যে-যন্ত্রণার পোড় খেয়ে লোকে নতুন উপলব্ধির পাহাড়চূড়ায় আসতে পারে।

আমাদের অভিজ্ঞতা এখনো অনেকটা ধার-করা, বই-পড়া ; দেশের মাটির, দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বলতে গেলে সবেমাত্র শুরু হয়েছে, আত্মীয়তার এখনো পরিচয় হয় নি, ফলে নতুন প্রভাবে বাগাড়ম্বরের দিকে বাঙালির স্বাভাবিক ঝোঁক আরো প্রখর হতে পারে, মানবিকতার নামে কীর্তনের ভাবালুতা আবার আসতে পারে এবং কবিরা ভুলে যেতে পারেন যে বুদ্ধি ও আবেগের সমন্বয়ই কবিতার উৎস।

নানালেখা

মস্কোর জীবন

ভোর কত হলো? শীতকালে মস্কোয় ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে হয়। লণ্ডনের মতো কুয়াশাব দুর্ভেদ্য আবরণ কদাচিৎ চোখে পড়ে বটে সোবিয়েত রাজধানীতে, কিন্তু সকাল আটটা-নটা পর্যন্ত আলো অত্যন্ত ক্ষীণ। অথচ কাজে পৌঁছতে হবে ঘড়ি ধরে নটায়। বেশিরভাগ সংসাব একটা ফ্ল্যাটের, হয়ত একটা ঘরে—বাথরুম, রান্নাঘর ইত্যাদি একটা। তাই তাডাতাড়ি মুখহাত ধুয়ে নেওয়া দরকার, নইলে অন্য বাসিন্দারা দাঁড়িয়ে থাকবে। খাবাব কিছু খেয়ে ওভারকোট মুড়ি দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডায় পদার্পণ। ববফ পড়ে ক্রমাগত, গাছপালা পত্রহীন, বিগত বসন্তেব কঙ্কাল। জল পড়ে পাতা নড়ে - ভাবার কোনো সুযোগ নেই।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখবেন দলবেঁধে বাচ্চা আর কিছু বড়োরা স্কুলে যাচ্ছে, পরনে ইউনিফর্ম, টকটকে গাল, হাসিখুশি সবাই। সেদিন হয়ত ক্লাশ বেশিক্ষণ করতে হবে না, দলবেঁধে লোহাব টুকরো, ভাঙা জিনিশ কুড়োবার পালা। ব্যাপাবটা খুব তুচ্ছ নয়। স্কুলের ছেলেমেয়েদের কোড়ানো কাবাড়ি মাল দিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক লোকোমোটিভ।

অফিস প্রথমে ছিল নটা থেকে ছটা, লাঞ্চের ছুটি একঘণ্টা। পবে কাজের দিন আরো ছোটো হয়েছে—একঘণ্টা কম। অফিসে যে মুখ গুঁজে ক্রমাগত কাজ করে যেতে হয় তা নয়। উপরওয়ালারা না-থাকলে গল্পগুজবের সুবিধে। তবে খুব বেশি ঢিলে দিলে চলবে না—সবকিছু টার্গেটে বাঁধা, গাফিলতির কৈফিয়ৎ দিতে বেগ পেতে হয় বিস্তর।

অফিসে মিটিং থাকে প্রায়ই—কাজ নিয়ে, ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে। অবশ্য বিদেশিদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়। আমরা বাংলা বিভাগের (বিদেশি সাহিত্য প্রকাশালয়ের) কাজ নিয়ে আলোচনায় যোগ দিয়েছি অনেকবার, ট্রেড ইউনিয়নের সভায় ডাক পড়ে নি কখনো। এ-ধরনের সভায় যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে না কমিরা। হয়ত সভা-সমিতিতেও সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে।

ভারতীয় অনুবাদকদের নিয়ে একটি সভার কথা মনে আছে, (এখানে বলা দরকার ভারতীয় অনুবাদকদের বাছাই করেন ভারত সরকার—তাঁরা কম্যুনিস্ট নন—দু-একজন ছাড়া) সভার আলোচনার বিষয় ছিল আমাদের দ্রুত অনুবাদ-শক্তির ফলে বিশৃঙ্খলা। বিদেশি ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়ের বিভিন্ন ভাষা-

বিভাগে কত বই বেরোবে তার টার্গেট আছে—কিন্তু আমাদের অনুবাদের হাত এত জোরে চলতে থাকে যে বিভাগটির দমবন্ধ হবার উপক্রম। আমাদের অনুবাদের রেট এত দ্রুত হবার কারণ—ওখানে কাজের মাত্রা হিশেবে পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা, যাকে বলে Piece-rate system। ভারতীয় বিভাগের প্রধান কড়া বক্তৃতা দিলেন—অনেকের নাম উল্লেখ করে বললেন যে তাঁরা কোয়ালিটির দিকে নজর দেন না মোটে, অনুবাদে হাস্যকর ভুল থাকে, শুধু পাতার সংখ্যা বাড়ালে চলবে না ইত্যাদি। স্বল্পবক্তা কমরেড। কিন্তু জবাব যাঁরা দিলেন তাঁদের কয়েকজন অন্তত কম স্বল্পবক্তা নন। অন্যদেশ হলে হয়ত মনোমালিন্য অনেকদিন থাকত, কিন্তু মস্কোয় ব্যতিক্রম দেখলাম। সঙ্ঘবদ্ধ আলোচনা ও সমালোচনার মূল্য আছে অনেক।

যৌথজীবনে রুশিরা অভ্যস্ত বাল্যকাল থেকে। তিন-চারবছর বয়সে কিণ্ডার-গার্টেনে দিনের বেলা কাটানো, সেটা না-হয় ছেড়ে দিন। সাতবছর বয়সে স্কুলে প্রবেশ। সেখানে পাওনীয়র হলে অনেক জিনিশ দলবেঁধে করতে হয়, তবে সাংঘাতিক ভারি জিনিশ কিছু নয়। সমাজের প্রতি দায়িত্বজ্ঞানের সূত্রপাত হয়। বাড়ির সামনের আঙিনা পরিষ্কার রাখা, স্কুলের পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগ, আর আগে যার উল্লেখ করেছি, লোহার টুকরো ইত্যাদি আহরণের মধ্য দিয়ে সে-দায়িত্বজ্ঞান ক্রমশ বাড়ে। গ্রীষ্মের অবকাশে পাইওনীয়র-শিবিরে অনেকে যায়। সেখানকার ব্যবস্থা চমৎকার : খেলাধুলো, গানবাজনা, নাটক আর কাজের অপূর্ব সমন্বয়। সারাদেশ জুড়ে আছে এ-ধরনের শিবির।

বয়স বাড়লে পাইওনীয়র পর্যায় পার হয় ছেলেমেয়েরা। তারপর কমসো-মোল—যুব কম্যুনিস্ট সঙ্ঘ। এদের কাজের পরিধি আরো-অনেক বিস্তৃত, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা নিরন্তর চলে, ঘন ঘন সভা বসে। নির্বাচনের সময় ছাত্রছাত্রী ভোটাররা ঠিকমতো হাজির না-হলে অনেকসময় জবাবদিহি তলব করে কমসোমোল। গ্রীষ্মের ছুটিতে দলে দলে তরুণ-তরুণী দেশের নানা নির্মাণক্ষেত্রে বা খেতে-খামারে যায়। কয়েকটি নতুন শহর গঠনে কমসোমোলের অবদান অসামান্য। কমসোমোল নামে তো একটি শহর আছে, এবং এই শহরের পত্তন বিষয়ে অনেক গল্প, উপন্যাস ও কবিতা রচিত হয়েছে।

যদি ভাবেন যে প্রত্যেকটি পাইওনীয়র বা কমসোমোলের সভ্য নিবন্তর দেশ ও দশের চিন্তায় জর্জরিত, তাহলে অবশ্য ভুল করবেন। এমনকী রুশদেশেও হাওয়া বদলেছে এবং বদলাচ্ছে। আজকালকার তরুণ-তরুণীরা মনে হয় আগের চেয়ে বেশি আত্মকেন্দ্রিক। জীবনযাত্রার মান উন্নত হবার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শবাদে ভাটা পড়ে খানিকটা।

আদর্শবাদে কতটা ভাটা পড়বে সেটা ভবিষ্যতের কথা। শাসনযন্ত্র ও সংস্কৃতির

কর্ণধাররা সে-বিষয়ে সজাগ। মাঝে-মাঝে ঢিলে দিয়ে তাঁরা আবার ঠিকপথ নির্দেশের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। ঠিকপথটা কী সে-বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ থেকে যায় আজকাল। লোকেরা, বিশেষ করে কমবয়সীরা আগেকার মতো চুপচাপ থাকে না। সম্প্রতি চিত্রকলা ও সাহিত্যে নানা সন্দেহ দেখা দিয়েছে; আলোচনা প্রকাশ্যে চলে। রাস্তায় বা জনসভায় কাব্যপাঠের রেওয়াজ যথেষ্ট বেড়েছে, এবং রুশকবিতা অদেহী নয়, সমসাময়িক নানা সমস্যা—স্বাধীনতার সমস্যা, স্তালিন-যুগের দায়ভাগের সমস্যা, ব্যক্তিজীবনের নিতান্ত ব্যক্তিগত নানা সমস্যা—কবিতায় প্রখর ছাপ ফেলে। সে-কবিতার বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়, প্রাচীনপন্থীরা হয়ত সরবে ঘোষণা করেন যে এ-ধরনের কবিতার প্রচার বাড়লে দেশের সমূহ সর্বনাশ হবে। নবীনেরা মুখ বুজে থাকেন না।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত অবস্থাটা অনেকটা অন্যরকম ছিল। একথাটা মনে রাখা দরকার যে, খবরের কাগজ রাশিয়ায় জনমতকে যে-পরিমাণে গড়ে তোলে অন্যদেশে ততটা সম্ভব নয়। এবং খবরের কাগজের সাধারণ চরিত্র সোবিয়েত রাশিয়ায় অনেকটা একধাঁচের; নানামুনির নানামতের বাহন সোবিয়েত সংবাদপত্র নয়। ফলে যখন পাস্তেরনাকের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলো তখন কোনো কাগজে তাঁর বিষয়ে দ্বিরুক্তির অবকাশ ছিল না। ডঃ জিভাগো রাশিয়ার কোনো ভাষায় ছাপা হয় নি, তার মানে রুশরা এইসব পড়েন নি। কিন্তু কি যৌথখামারে কি কারখানার সান্ধ্য-আসরে গানবাজনানাচ শুরু হবার আগে কেউ-না-কেউ দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার শেষের দিকে পাস্তেরনাকের নামোল্লেখ করে একবার নিন্দে করে নিতেন। তরুণ-তরুণীদের জিজ্ঞেস করলে অনেকে স্বীকার করতেন যে ব্যাপারটা হাস্যকর, কিন্তু প্রকাশ্যসভায় এ-মতের প্রচার অসম্ভব ছিল। পরে পাস্তেরনাকের মূল্যবিচার হয়েছে নতুন করে, তাঁর অবদান এখন স্বীকৃত। কবি পাস্তেরনাকের অবদান, উপন্যাস-লেখক পাস্তেরনাকের নয়। রাশিয়ার বাইরেও অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি অবশ্য ডঃ জিভাগোর অনুরাগী নন।

অনেকে বলেন যে যেখানে যৌথ-উদ্যমের দরকার, যেমন সমাজ-সংগঠন, উৎপাদন, কৃষি, ব্যালে, নাটক, সিনেমা, সেখানে সোবিয়েত রাশিয়ার উদ্দাম প্রাণশক্তি সার্থকভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু যেখানে ব্যক্তি নিজের উদ্যমের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল (বাহ্যত) যেমন চিত্রকলা, সাহিত্য, সেখানে গতশতাব্দীর বিরাট রুশ-ঐতিহ্যের তুলনায় আধুনিকরা এখনো পিছিয়ে আছেন। এরেনবুর্গ একবার বলেছিলেন যে উপন্যাসের মালমশলার জন্য স্যুটকেশ হাতে করে কোনো যৌথখামার বা কারখানায় যাওয়াটাই সব নয়। আরো-কিছুর দরকার।

এখানে একটা বৃহত্তর প্রশ্ন তোলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যে-কোনো দেশে

কালবিশেষে কয়েকটি শাখার উৎকর্ষ ঘটে, জীবনের সব শাখার নয়। একদেশে একযুগে হয়ত সাহিত্য বিরাট একটা স্তরে পৌঁছল, প্রগতির অন্যান্য শাখা হয়ত তত বাড়ল না। বোধ করি সাহিত্য বর্তমানে সভ্যতার প্রকাশমাধ্যমের সবচেয়ে বড়ো অঙ্গ নয়।

শাদা মাটিতে ফিরে আসা যাক। মস্কোয় ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে প্রথম বাড়িভাড়া কোথায় জমা দেব নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। ব্যাঙ্কে জমা দিতে হলো। দোকান ঘুরে দেখলাম জিনিশের দামের তারতম্য নেই, সব দোকানে সমান। অবশ্য বাজার আছে, সেখানে যৌথখামারিরা তাদের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বেচে। সেখানে দর-কষাকষির স্থযোগ আছে। সরকারি দোকানের তুলনায় দর চড়া, কিন্তু জিনিশ অনেক টাটকা। ধরুন, ভেড়ার মাংস এককিলো প্রায় বিশরুবল (প্রায় দশটাকা, পুরনো হারে)। কিন্তু বছরদুয়েক পরে বেশিরভাগ বাজারে সরকার থেকে ছোটো একটা স্টল খোলা হলো, সেখানে দাম বাঁধা। সঙ্গে সঙ্গে যৌথখামারিরা দাম অনেক কমিয়ে দিল।

খরিদ্দারের তুলনায় উৎপন্ন এখনো কম, তাছাড়া লোকের কেনার ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। সেজন্য দোকানে-দোকানে প্রায় সমস্তক্ষণ ভিড় লেগে থাকে।

শুধু দোকানে নয়। ব্যালে, থিয়েটার, সিনেমা, সর্বত্র ভিড়। সন্ধেবেলায় মনে করলেন একটা ব্যালে দেখে আসি, সেটা হবার নয়। বেশ-কিছুদিন আগে টিকিট কেটে রাখতে হয়। কপাল ভালো থাকলে "লিশ্‌নি বিলিয়েত"—ফালতু টিকিট হয়ত পাবেন, কিন্তু সে-রকম কপাল কদাচিৎ ঘটে।

পার্কে পার্কে মুক্তাঙ্গন আছে। সেখানে থিয়েটার, গণনৃত্য চলে গ্রীষ্মকালে। পার্কে যাওয়ার একটা বিপদ, রেডিওর গান। চুপচাপ একটা কোণে বসে থাকা মুশকিল। প্রত্যেক অফিস ও কারখানায় প্রায়ই "ভেচের" হয়। "ভেচের"-এর আক্ষরিক মানে সন্ধ্যাবেলা, এক্ষেত্রে সান্ধ্য-সম্মেলন। বক্তৃতা, নানারকমের অনুষ্ঠান, বলরুম-নাচ ভেচের-এর বিশেষ বিশেষ অঙ্গ। একটা ইনস্টিটিউটের এ-রকম একটা ভেচের-এ গিয়ে ভারতীয় বলে প্রথমসারিতে জায়গা পেয়েছিলাম। হঠাৎ স্টেজে আবির্ভাব হলো মায়া প্লিসেৎস্কায়ার। নাচলেন The Dying Swan। সে-সন্ধ্যার কথাটা চিরকাল মনে থাকবে।

সাংস্কৃতিক স্থযোগের জন্য মোটা টাকা লাগে না। বল্‌শয়, মস্কো আর্ট থিয়েটার ইত্যাদিতে চড়া দামের টিকিট আছে, কিন্তু আগেভাগে কাটলে কম দামের সিট দুর্লভ নয়। তাছাড়া, পয়সা খরচ করার ক্ষমতা দিনে দিনে বাড়ছে। একটা কারণ, বাড়িভাড়া অসম্ভব কম, মাইনের শতকরা পাঁচভাগের বেশি নয়। প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক। স্কুল থেকে বেরিয়ে ইনস্টিটিউট (কলেজ) বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে ঢোকার পর প্রত্যেকে বৃত্তি পায়। পাশ

করে চাকরির জন্য বিনিদ্র রাতযাপনের দরকার নেই, কেননা সোবিয়েত সংবিধানে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক যুবক বা যুবতীর কর্মাধিকার স্বীকৃত।

আমাদের দেশে অসুখ হলে অনেকসময় দমকা খরচ হয়ে যায়, ধার করে হয়ত ধাক্কা সামলাই। সোবিয়েত রাশিয়ায় চিকিৎসায় খরচ লাগে না, ওষুধের দাম ছাড়া। ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকলে বাড়িতে বিশেষজ্ঞকে ডাকতে পারেন, কিন্তু হাসপাতালে একই বিশেষজ্ঞ দেখাশোনা করেন বলে লোকে সেখানেই যায়। লোকে প্রথমে যায় পলিক্লিনিকে, শহরের প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য পলিক্লিনিক আছে—শিশুদের জন্য আলাদা। পলিক্লিনিক থেকে দরকার হলে রোগিকে হাসপাতালে পাঠায়।

চিকিৎসার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। শীতকালে মস্কোয় পৌঁছবার কয়েক-দিন পর বড়ো মেয়ের নিউমোনিয়া হয়, সঙ্গে হাঁপানি। ওষুধ ছাড়া অক্সিজেন-ব্যাগের কথা ডাক্তার বলেন। ভাষা তখন কিছুই বুঝি না, ডাক্তারখানা থেকে অক্সিজেন-ব্যাগ আনতে অনেকটাকা লাগল। আরো দু-তিনবার আনার পর যখন শেষ ব্যাগ ফেরত দিলাম তখন আগেকার দেওয়া সমস্তটাকা ফিরে পেলাম! টাকাটা ডিপোজিট। নিউমোনিয়ার চিকিৎসায় খরচ দশরুবলের বেশি হয় নি (অর্থাৎ পাঁচটাকার কম)।

বাড়িভাড়া কম, শিক্ষা ও চিকিৎসার খরচ নেই, সুতরাং মাইনে অপেক্ষাকৃত কম হলেও দুশ্চিন্তা সে-অনুপাতে প্রখর নয়। তাছাড়া এক-একটি সংসার শুধু গৃহকর্তার আয়ের মুখাপেক্ষী নয়; হয়ত স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজ করেন ও বড়ো ছেলে বা মেয়ে কলেজে বৃত্তি পায়। সব মিলিয়ে চলে যায়; ক্রমশ রেডিও, গ্রামোফোন, এমনকী রেফ্রিজেরেটর কেনার মতো পয়সা জমে। যেটা অস্বস্তিকর সেটা হলো গৃহসমস্যা। এক ফ্ল্যাটে ভাগাভাগি করে থাকার অসুবিধা আছে। কিন্তু কোনো রুশকে জিজ্ঞেস করলে সে আপনাকে হয়ত বলবে, 'আমাদের আগে কিছুই ছিল না। এখন তবু তো বড়ো বড়ো শহরে মাথা গোঁজার জায়গা আছে, আছে ঠাণ্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থা, সেণ্ট্রাল হিটিং। তাছাড়া যুদ্ধ না-বাধলে বছরকয়েক পর আলাদা ফ্ল্যাট পাব নিশ্চয়ই। বুদিত, বুদিত।' বুদিত কথাটার মানে 'হবে', এবং কথাটি রুশদের খুব প্রিয়।

গৃহ-সংস্থানের ব্যাপারে এ-কথাটির প্রয়োগ প্রায়ই করতেন আমাদের প্রতিবেশী একটি মধ্যবয়সী পাইলট। একটি ঘরে চারজন প্রাণী, স্বামী, স্ত্রী, ইনস্টিটিউটের ছাত্রী তাঁদের বড়ো মেয়ে ও বারোবছরের আর-একটি। পাইলটটি বিমানবিদ্যার বিষয়ে বইটই লিখতেন; কলম চালাতে সময় লাগত বেশ, কাজের পর ফিরে এসে নিরালায় কোনো জায়গা পেতেন না বলে। মাঝে-মাঝে সেজন্য বিরক্তি প্রকাশ করলেও তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে বছরপাঁচেক পরে আলাদা ফ্ল্যাট পাবেন।

ফ্ল্যাটের আরো-দুটি ঘরের একটিতে থাকতেন স্বামী-স্ত্রী (দুজনেই কর্মী) এবং আরেকটিতে স্বামী-স্ত্রী ও দুটি বাচ্চা ছেলে। এদের মধ্যে গুরুতর মনোমালিন্য কখনো দেখি নি। শুধু বাচ্চাদুটির বাবা রবিবারে একঘণ্টা ধরে স্নান করতেন বলে অন্যরা হাসাহাসি করতেন, বলতেন 'ঘণ্টাখানেক ধরে স্নান না-করলে ও চুল ঠিকমতো বাঁধতে পারে না।' ভদ্রলোকটি ট্যাঙ্ক-রেজিমেণ্টে কাজ করলেও চুলের পাতা কাটতে বড়ো ভালোবাসতেন।

মস্কোয় 'তাজা হাওয়া'র জন্য সবাই ব্যস্ত। কেন প্রথম প্রথম বুঝতাম না। রাস্তাঘাট চওড়া, পরিষ্কার, ধোঁয়া বা ধুলো নেই, শীতকালে আবহাওয়া তো ক্ষুরধার। পরে মনে হলো এক্টা ঘরে একটা সংসার থাকলে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, লোকে চায় খোলা জায়গায় যেতে। এমনকী প্রচণ্ড শীতেও দেখবেন বাচ্চারা বাড়ির ('দোম', যেখানে কয়েকশো লোক থাকে) অঙ্গনে বরফে লুটোপুটি খাচ্ছে ; কোলের শিশুরা পেরাম্বুলেটরে শুয়ে কিছুক্ষণ হাওয়া খায়। গ্রীষ্মকালে শনিবার রবিবার দলে দলে লোক কাছাকাছি বনজঙ্গলে বেড়াতে যায় ; অনেকের 'দাচা' অর্থাৎ কটেজ আছে। 'দাচা' রাষ্ট্রের সম্পত্তি নয়। শীতকালে শিইং ও স্কেটিং।

প্রত্যেক কর্মী মাইনেসমেত বছরে ছুটি পায় দু-তিন সপ্তাহ বা একমাস। ট্রেড ইউনিয়ন থেকে ছুটি কাটাবার বন্দোবস্ত করে নিতে পারেন। নিজেরা বন্দোবস্ত করলে খরচ বেশি। আয় কম হলে অনেকসময় ট্রেড ইউনিয়ন থেকে খরচার অনেকটা পায় লোকে। মাঝে-মাঝে সমস্তটাই দেয় ট্রেড ইউনিয়ন। "তুরিস্তকায়া পুতিওভকা" বা টুরিস্ট টিকিট কিনে বিশজনের দলে ভিড়ে গেলে ব্যয় অনেক কম। অবশ্য এ-টিকিট থাকলে বড়ো হোটেলে থাকবেন না। পাকাবাড়ি বা তাঁবুতে থাকার বন্দোবস্ত আছে। ট্রেনভাড়া দিয়ে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় পৌঁছবার পর থেকে খাওয়াদাওয়া ঘোরাফেরার জন্য কোনো খরচ লাগে না।

যদি দল বেঁধে ভ্রমণে স্পৃহা না-থাকে তাহলে Rest House-এ থাকতে পারেন। রেস্ট হাউসের সংখ্যা অগুণতি। বিভিন্ন সঙ্ঘের, সাহিত্য, শিল্প বা বিজ্ঞান সঙ্ঘের আবার নিজস্ব রেস্ট হাউস আছে। এমন-একটি বিখ্যাত এলাকার নাম পিরিদেল্‌কিনো। মস্কোর কাছে এই সাহিত্যিক এলাকায় অনেক সাহিত্যিক বাড়ি করেছেন। সরকারি রেস্ট হাউসও আছে। পাস্তেরনাক মারা যান পিরিদেল্‌কিনোয়।

শরীরে কোনো গ্লানি বা ব্যাধি থাকলে স্যানাটোরিয়াম। জারের আমলের অনেক প্রাসাদ এখন স্যানাটোরিয়াম। কৃষ্ণসাগরের কূলে বিখ্যাত শহর সোচিতে এমন-অনেক স্যানাটোরিয়াম আছে যেখানে পা দিতে প্রথম প্রথম সংকোচ হয়।

প্রতিবছর প্রায় ৫০ লক্ষাধিক লোক যায় বাইরে বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য।

সোবিয়েত সরকার স্যানাটোরিয়াম, রেস্ট হাউস, ক্লিনিক এবং বোর্ডিং হাউসের তত্ত্বাবধানের ভার ছেড়ে দিয়েছেন ট্রেড ইউনিয়নের হাতে।

সোবিয়েত রাষ্ট্রনেতারা বলেন যত বেশি ব্যাপার জনগণের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় তত ভালো। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার মিলিৎসিয়ার হাতে, সরকারি মতে মিলিৎসিয়া হলো জনসাধারণ দ্বারা চালিত। এ-ছাড়া ছোটোখাটো ছিঁচকেমি, পাড়ার বখাটে ছেলেদের ব্যবহার বা বিদেশিমুদ্রা নিয়ে অবৈধ কারবারের মতো গুরুতর ব্যাপার নিয়েও মাথা ঘামানোর জন্য আরো-একটি দল সম্প্রতি গড়ে উঠেছে ; নাম দ্রুজনিকি।

লোকের ব্যবহার নিয়ে প্রাচীরপত্রে কার্টুন বেরোয় প্রায়ই। উদ্দেশ্য, জনমতের চাপে ব্যক্তিবিশেষের বিবেকবোধ জাগানো। বাসে কণ্ডাকটার নেই, টিকিটের পয়সা একটা বাক্সে ফেলতে হয়। যদি পয়সা না দেন, এবং সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে হয়ত একদিন দেখবেন আপনার একটা ছবি বাসে টাঙানো আছে কিংবা যে-পাড়ায় থাকেন তার প্রাচীরপত্রে।

সাধারণত রুশদেশে লোকজনের ব্যবহার সহজ স্বচ্ছন্দ এবং অতি আন্তরিক। প্রতিদেশের জনগণের প্রতি অনুরাগ সোবিয়েত রাশিয়ার বিশেষত্ব। শৈশব থেকে শেখানো হয় এ-ব্যবহার। কোনো দেশের সরকার হয়ত পুঁজিবাদী ও অত্যাচারী, কিন্তু সে-দেশের সাধারণ মানুষ তো আলাদা—এ-ধারণাটা রুশিদের বদ্ধমূল। এমনকী জার্মানদের প্রতি প্রকাশ্য-বিদ্বেষ কখনো দেখি নি।

উত্তরতিরিশে সিড্‌নি ও বিয়েট্রিস ওয়েব্‌ একটি বৃহদাকার বই লেখেন। নাম "Soviet Communism : A New Civilisation ?" পরের সংস্করণে প্রশ্ন-চিহ্নটি তাঁরা বাদ দেন। বইটির মালমশলা তাঁরা পান স্তালিনযুগের রাশিয়া থেকে। তারপর অনেক ঘাটে অনেক জল গড়িয়েছে এবং এমন-অনেক তথ্য স্বয়ং খ্রুশ্চভ প্রকাশ করেছেন যা ওয়েব্‌দের (পরে লর্ড এবং লেডি প্যাস্‌ফিল্ড) হাতে পড়লে তাঁরা হয়ত বইটির নামকরণে দ্বিতীয়বার এত নিশ্চয়তা দেখাতেন না।

অতীত নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে, নইলে বর্তমান ও ভবিষ্যতে অনেক গলদ থেকে যাবে। সে-আলোচনা রাশিয়ায় বর্তমানে চলেছে অনেকটা একতরফা ভাবে। নিজেদের বক্তব্য পেশ করার কোনো সুযোগ নেই স্তালিনপন্থীদের। দু-পক্ষের আলোচনা ও সমালোচনায় ছবিটা পরিষ্কার হতো।

রাশিয়ায় দৃঢ় বিশ্বাস, ও-দেশে নতুন মানুষের উদ্ভব হয়েছে। এ-কথা সত্যি, বিপ্লবের পর গৃহযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—সমস্ত প্রবল বাধা অতিক্রম করেছে ও-দেশের মানুষ, রাশিয়া পরিণত হয়েছে পৃথিবীর দ্বিতীয় শক্তিতে। পুরুষকারের প্রচণ্ড ছাপ রাশিয়ায়। কিন্তু স্তালিনযুগের দায়ভাগ দশবছরে কমিয়ে নতুন মানুষের উদ্ভব কি এত সহজ ?

উড়ো খৈ

১৯৭১ সাল বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন লোকের মনে থাকবে অনেকদিন। ফিল্ড মার্শাল মানেকশ সেদিন বম্বের রোটারি ক্লাবে বলেছেন (টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া, বম্বে, ১৭ নভেম্বর) যে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ (ডিসেম্বর ১৯৭১) শুরু হবার মাসকয়েক আগে (অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তানে বিক্ষোভ ও দমন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তাঁকে তলব করে বলে যে ইয়াহিয়া খাঁর অত্যাচারেব বিরুদ্ধে 'অ্যাকশন' নিতে হবে। মানেকশ বলেন অ্যাকশনের অর্থ হলো যুদ্ধ। 'Go to war then', মন্ত্রিসভার মন্তব্য। মানেকশ রাজি হন নি, কেননা তখন যুদ্ধ লাগলে ভারতের পরাজয় নিশ্চিত, সৈন্য-সমাবেশের জন্য অন্তত মাসখানেক লাগবে, তারপর বর্ষা শুরু হলে পূর্ব-পাকিস্তানে যুদ্ধ করারপ্রশ্ন ওঠে না। প্রস্তুতির জন্য বেশ-কিছু সময় ও সর্বপ্রকারের সাহায্য চান মানেকশ। তখনো ইন্দিরা গান্ধী এ-দেশের সম্রাজ্ঞী হন নি, এই যা রক্ষে। মানেকশর স্মৃতিশক্তি প্রখর। কিন্তু তাঁর কথার মানে এই দাঁড়ায় যে অগণন শরণার্থীর ভিড়ে রুদ্ধশ্বাস ভারতকে রক্ষা করার জন্য আমরা যুদ্ধে নামি নি।

ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার আগে আভ্যন্তরীণ অবস্থার মোকাবিলা করা দরকার। নকশালপন্থীদের বিরুদ্ধে তৎপরতা ১৯৭১-এ তুঙ্গে ওঠে। বীরভূমে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। কলকাতা ৭১। অগস্টের একটি করাল রাত্রে সরোজ দত্ত নিখোঁজ হন। শেষের সেই ভয়ংকর মুহূর্তেব মুখোমুখি কী-ভাবে তিনি হন শুধু ত্রিকালজ্ঞ পুলিশ জানে।

সরোজবাবুর সঙ্গে শেষদেখা কবে হয়েছিল ? খুব সম্ভব তিরিশের দশকের শেষে দিল্লি যাবার আগে ? একটি বন্ধু সবিস্ময়ে মনে করিয়ে দিলেন, ১৯৬৬-র জানুয়ারিতে একটি বৌভাতের নিমন্ত্রণে সরোজ দত্তের সঙ্গে আমার গল্পগুজব হয়, খেতে বসেছিলাম পাশাপাশি। মনে না-থাকাটা অহমিকার দরুন নয়, ক্ষীণ স্মৃতি-শক্তি প্রায়ই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। অনেকদিন-অদেখা প্রিয় বান্ধবীদের মুখ পর্যন্ত অস্পষ্ট ধূসর হয়ে আসছে।

একটি বাংলা পত্রিকায় সেদিন সরোজ দত্তের কলমের তীব্র ধার আবার অনুভব করলাম। অতি-আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ে একটি প্রবন্ধের সমালোচনা, ১৯৪০এ লেখা। সরোজবাবুর সংক্ষিপ্তসার ও তাঁর ভাষা-অনুযায়ী আলোচ্য প্রবন্ধের বক্তব্য হলো : ১. ধনতন্ত্রী সমাজে যে-প্রগতি স্তব্ধ হইয়াছে বিপ্লবোত্তর সাম্যবাদী সমাজে

সেই প্রগতি অব্যাহত চলিবে, অতএব প্রবন্ধকার আশাবাদী ও প্রগতিতে বিশ্বাসী ; ২. ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রী সমাজ decadent অতএব এ-সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা অসম্ভব এবং decadent সাহিত্যই একমাত্র আন্তরিক সাহিত্য। এই আন্তরিকতার জন্য decadent হইয়াও তাঁহাদের সাহিত্যে বৈপ্লবিক শক্তিমত্তা বর্তমান। নজির ইংরেজ কবি টি. এস. এলিয়টের কাব্য ; ৩. ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে-কোনোরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি ; ৪. কিষাণমজদুর ল'লঝাণ্ডা ব্যারিকেড সংঘর্ষ লইয়া নাকি তাহাদের উত্তেজক সাহিত্যরচনার নির্দেশ অথবা ফরমাইস দেওয়া হইতেছে এবং ঐ-সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহাদের না-থাকায় রোমাণ্টিক হইবার ভয়ে ঐ-নির্দেশ বা ফরমাইস তাঁহারা পালন করিতে পারিতেছেন না।

সংক্ষিপ্তসার দেবার পর সরোজ দত্ত জোরালো ভাষায় বলেন যে 'ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে-কোনোরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি নয়, living, passionate ও sensitive মনে এই অন্তঃসারশূন্যতার প্রতিক্রিয়াই প্রতিফলিত হয় বিপ্লবী সাহিত্যে। আন্তরিকতার খড়্গাঘাতে নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কবিলাস সেখানে মুহূর্তে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। তাই একদা যখন রোমাঁ রোলাঁ গান্ধি-রামকৃষ্ণে বিশ্বাসী ছিলেন তখনো তাঁহার সাহিত্য বিপ্লবী সাহিত্য ছিল, অহিংস টলস্টয়ের সাহিত্য সম্পর্কে লেনিনের প্রশংসোচ্ছ্বাস তো বহুবিদিত। ···মন যেখানে জাগ্রত ও জীবন্ত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও প্রবহমান পারিপার্শ্বিকতার আঘাতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও ভাবাদর্শ সেখানে আন্তরিকতায় উদ্বেল এবং ক্রম-বিবর্তনের বেদনাময় পথে সত্য-উপলব্ধির অভিমুখে গতিমান। এই সত্য-উপলব্ধির পথে পরিবর্তনশীল ভাবাদর্শের প্রতিটি মুহূর্ত বৈপ্লবিক, বেদনায়, উৎকণ্ঠায়, আর্ত-ক্রন্দনে নিবিড়। 'Decadence'-এর প্রতিটি বন্ধনরজ্জু ছেদনের সঙ্গে সঙ্গে তাই তাহার আর্ট হইতে যন্ত্রণার আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠে। শেষরজ্জু ছিন্ন হইবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাহার শান্তি নাই। এই অশান্তি, উদ্বেগ ও আর্তনাদ মহাভুজঙ্গের নির্মোক-পরিহারের এই প্রতিটি মুহূর্ত বৈপ্লবিক···ইহা নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কজীবীর বিলাপ-বিলাস নহে !'

সরোজ দত্তের বক্তব্য বলিষ্ঠ। উপসংহারে তিনি কবি-প্রবন্ধকারকে নির্বোধ, প্রবঞ্চক ইত্যাদি বলেছেন।

বহুদিন পরে লেখাটি পড়ে মনে হলো সরোজ দত্ত ঠিক লিখেছিলেন। তিরিশের দশকে অনেক লেখক বোধ হয় বিপ্লবীর অভিনয় করে বাহবার চেষ্টায় থাকতেন, তাঁদের আসল চেহারা সরোজ দত্ত চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

কিন্তু পরের দু-তিনটি পৃষ্ঠায় আক্রান্ত প্রবন্ধকারের জবাব পড়ে মনে হলো ব্যাপারটা অত সহজ নয়। প্রবন্ধকার বলেছেন যে নিজেকে তিনি কখনো 'বিপ্লবী'

বলেন নি। তাঁর কবিতায় যে-টাইপের জীবন এবং আত্মপরিক্রমার কথা আছে, সে-টাইপ বিপ্লবী নয়, মুমূর্ষু শ্রেণীর প্রতীক। অবক্ষয় এদের আকর্ষণ করে তার কারণ বোধহয় এই যে উদীয়মান কোনো শ্রেণীর প্রাণশক্তি এদের নেই, বরং পাতি-বুর্জোয়ার গভীরে এদের শিকড় ইত্যাদি। অবক্ষয় বিষয়ে সচেতনতা একধরনের শক্তি কিন্তু এমন-একটা সময় আসছে যখন সেই শক্তিটুকু দিয়ে চলবে না, তখন মনস্থির করতে হবে। যে-কবি তাঁর ব্যক্তিসত্তা অটুট রাখতে পেরেছেন গণ-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলে তাঁর উপকার নিশ্চয় হবে। আর…'He who is bent on living in a little cell, all will be dying with a little patience.' প্রবন্ধকারের জবাবটা বালখিল্যসুলভ নয়, যদিও কোথাও একটা ফাঁকি রয়ে গিয়েছে। সরোজবাবুর প্রত্যুত্তরটা কিন্তু অনেকটা উকিলসুলভ। যেমন, কবি-প্রবন্ধকার যে-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সেই পত্রিকায় তাঁকে এবং অন্যদের মাঝে-মাঝে বিপ্লবী বলা হয়েছে। প্রবন্ধকারের কবিতায় বিপ্লবীসুলভ উক্তি আছে, অতএব বিপ্লবী শব্দটি আরোপ করা অযৌক্তিক হয় নি ইত্যাদি; সে-সময়কার মনোভাব বিষয়ে সরোজ দত্ত যা লিখেছিলেন তা উপভোগ্য—'এখনো তাঁহারা আলগোছে গণস্পর্শ বাঁচাইয়া 'dozen or so' হাত-ধরাধরি করিয়া কিছুকাল আত্মপরিক্রমায় অতি-বাহিত করিবেন; তারপর গণ-আন্দোলন আরম্ভ হইলে…তাঁহারা রাতারাতি স্বগতোক্তি পরিত্যাগ করিয়া গণকবি হইয়া বসিবেন'। তবু নির্বোধ প্রবঞ্চক কথাগুলি অস্বস্তিকর ঠেকল, কেননা প্রবন্ধটি আমার লেখা ১৯৩৮ সালে; এম. এ. পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৃত্তি পেয়ে তখন জীবনটা মন্দ কাটছিল না।

তারপর অনেককাল অতিবাহিত হয়েছে। সাহিত্য-বিষয়ে বিতর্ক নানা রূপ নিয়েছে, চল্লিশদশকের শেষাশেষি রবীন্দ্রনাথকে ইতিহাসের ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করার প্রস্তাব উঠেছে, তারপর গান্ধি রবীন্দ্রনাথ আবার কম্যুনিস্টদের অনুরাগ আকর্ষণ করেছেন, নকশালপন্থীরা আবার তাঁদের বর্জন করেছেন। তিরিশদশকের বেশ-কিছু লেখক এখন বিগত। গণ-আন্দোলনে যোগ দিয়েও অনেকে লেখক হিশেবে মহান হতে পারেন নি; পার্টির ভাবাদর্শ অনেকসময় বাঁদরনাচ নাচিয়েছে। এর জন্য দায়ী অবশ্য গণ-আন্দোলন নয়, 'লাইন' বেঠিক হলে আন্দোলনে যোগ দিয়েও ব্যর্থতা আসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শক্তিমান লেখক পার্টির প্রভাবে কোনো মহারচনা করতে পেরেছিলেন? তাঁর বিচ্ছিন্ন ডায়েরিতে একটা অবিশ্বাসের ভাব তো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিরিশের দশকে ও পরে কবিদের মধ্যে সহজ ও বলিষ্ঠ ভাষায় লেখেন সুভাষ, সুকান্ত, পার্টির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু মাও থেকে মেয়াওতে সুভাষের উত্তরণ যুগান্তকারী কিছু একটা হয় নি এবং সুকান্ত বেঁচে থাকলে মস্কোমুখী সি. পি. আই-এর জালে আটকে পড়ার যথেষ্ট ভয় ছিল। সি. পি. এম-এ অবশ্য সাহিত্যিক ও বিলেত-ফেরতের সংখ্যা অনেক কম। সাংসারিক

বিবিধ ক্ষেত্রে সি. পি. আই-এর মত সি. পি. এম তাই গুছিয়ে নিতে বড়ো একটা পারে নি।

তিরিশের দশকের শেষে নবীন কবিদের ভাষা স্বচ্ছ হওয়াতে আশার কারণ ছিল। তাব আগে কবিদেব অনেকেই ইংবেজির ছাত্র ও পরে অধ্যাপক হওয়াতে পেশার দোষে বড়ো-বেশি পাউণ্ড-ইয়েটস-এলিয়ট-অডেন চর্চা করতেন, কবিতার ভাষা ও ভাবভঙ্গি সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হতো না। কিন্তু কিছুদিন কিছু কবির সহজ ভাষার পর ব্যাপারটা আবার গোলমেলে হয়ে গেল, খুব সম্ভব অনেকটা জীবনানন্দ দাশের ক্রমশ প্রসারিত প্রভাবের ফলে। জীবনানন্দের অসাধারণ শক্তি যাঁদের নেই তাঁদের সন্ধ্যাভাষা হজম করা কঠিন। তাঁরা গণ-আন্দোলনে গেলে দেশের দশের সুবিধে হবে না।

সত্তরদশকের চালচিত্র

রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক বামনদের পক্ষে কোনো দশকের সংক্ষিপ্তসার করা রীতিমতো অসুবিধাজনক। লেনিন-স্তালিন-মাও-এর মতো অন্তর্দৃষ্টি কার আছে? বুর্জোয়া জগতেও ইতিহাসবোধসম্পন্ন মানুষ আর নেই। যা করা যেতে পারে তা হলো বিভিন্ন ঘটনা ও আন্দোলন সম্পর্কে টুকরো টুকরো ব্যক্তিগত অভিমত-গুলো সাধ্যমতো সাজানো।

ষাটদশক শেষ হয়েছিল বিশাল রাজনৈতিক প্রত্যাশা ও ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী উত্তেজনার মধ্যে। জাতীয় ক্ষেত্রে চলেছিল নকশালপন্থী আন্দোলন। এই আন্দোলনের নেতা ১৯৭৫ সালকে চূড়ান্ত বছর বলে ঘোষণা করেন। কংগ্রেসের একচেটিয়া আধিপত্য ১৯৬৭ সালেই নষ্ট হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধি সেই আধি-পত্যের আংশিক পুনরুদ্ধার করেছিলেন। ১৯৬৯-এ পুরনো লোকজনদের হটিয়ে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রভৃতি ভাঁওতার মাধ্যমে বামপন্থীদের তিনি বোকা বানান। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে ভিয়েতনাম রচনা করছিল প্রতিরোধের এক অনবদ্য গাথা। ১৯৬৮-র "ফরাসি বিপ্লব"-এ হলো ছাত্রশক্তির অভ্যুত্থান। চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সূচনা করল সদর দপ্তরে কামান দাগার এক নতুন অধ্যায়; সেখানে শুরু হলো পুঁজিবাদী পথের পথিক আমলাতন্ত্র এবং পুরনো ভাবনা ও প্রথার বিরুদ্ধে এমন-এক প্রচার যা মাও ভেবেছিলেন বছরের পর বছর চলবে। পূর্ব এবং পশ্চিম-পাকিস্তানে জাগে অশান্তি। এইসব ঘটনার কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাত্রদের ভূমিকা সম্ভবত তাদের ক্ষমতার অনুপাত অনুযায়ী ছিল না।

এ-সমস্তকিছুই সত্তরের প্রথমদিকে জের টেনে আসে। আশা তখনো ছিল; কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ঠেকে শিখল, তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র শানিয়ে নিল। এদেশে ১৯৭০-৭১ প্রত্যক্ষ করল 'উগ্র' বামপন্থীদের বিরুদ্ধে এক বর্বর দমননীতি। অত্যাচারের কোনো পদ্ধতিই বাদ গেল না; পুলিশ এবং মিলিটারি, মাঝে মাঝে সংসদীয় বামপন্থীদের সঙ্গে মিলিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল 'উগ্র' বামপন্থীদের উপর; যারা শত্রু-মিত্রের তফাত কীভাবে করতে হয় না-জেনে অনেক ভুল করেছিল। পাকিস্তান-আক্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে ইন্দিরা গান্ধিকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল তার পশ্চাদভূমি পরিষ্কার করতে। ১৯৭০-এ পাকিস্তানে নির্বাচন হলো। পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামি লীগ বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এরপর নেমে এল ইয়াহিয়ার সেনা-

বাহিনীর বর্বর পাল্টা আক্রমণ ; পরোক্ষ এবং প্রকাশ্য হস্তক্ষেপের ফলে শেষ পর্যন্ত ঘটল ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে পাকিস্তান-বিভাজন। এর আগে একই বছরে শ্রীলঙ্কায় সিরিমাভো বন্দরনায়কও পড়েছিলেন বিপাকে ; কিন্তু তিনি টি'কে গেলেন পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সমস্ত-অংশের বিপুল সহযোগিতায়। ভারত, পাকিস্তান, পশ্চিমি দুনিয়া, রাশিয়া এবং চীনের সম্মিলিত সাহায্যের ক্ষেত্র হিশেবে শ্রীলঙ্কা একটা দুর্লভ এবং বিস্ময়কর উদাহরণ ! আমরা এর আগে জানতামই না যে এই দ্বীপটির ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব এতটা। যাঁর মস্তিষ্কের তুলনায় কণ্ঠ ছিল তীক্ষ্ণ, এবং শত্রুর চেয়ে যাঁর বন্ধুরা ছিল বেশি ধড়িবাজ সেই মুজিব বাংলাদেশে ক্ষমতায় এসে এমন-এক শাসনব্যবস্থা চালু করলেন যার বিশেষত্বই হলো ঔদ্ধত্য, নির্লজ্জ পৃষ্ঠপোষকতা, দুর্নীতি এবং বামপন্থীদের উপব নির্বোধ অত্যাচার ; ওদিকে ভুট্টো আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন পাকিস্তানের অবশিষ্ট দেশকে ধবে রাখতে। দক্ষিণ-এশিয়ার ঘটনাবলিতে মনে হলো রুশিরাই কিস্তিমাত করছে। এ-ধরনের সংঘাত শেষে শাসকের চিরাচরিতভাবে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষেই চলে গেল —সেগুলির প্রধান লক্ষ্যই ছিল, দেশের আভ্যন্তরীণ অন্যশক্তিগুলোর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাহীন কানুন চালু রাখা।

১৯৭১-এ কিসিংগার পিকিং-এ তাঁর বিখ্যাত গোপন ভ্রমণ সারলেন, শক্তি-ভারসাম্যে শুরু হলো নাড়াচাড়া ; ভারত পাল্টা মার হিশেবে রাশিয়ার সঙ্গে করল মৈত্রীচুক্তি। এই রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস তখনকার 'দুই মেরুবর্তী' দুনিয়ায় ফেলল এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব। পরের বছর নিকসন পিকিং গিয়ে 'এক চীন' নীতি স্বীকার করেন। হাইফং অবরোধ করে কয়েকসপ্তাহ বাদে তিনি গেলেন মস্কো। রুশিরা যে তাঁর সফর বাতিল করল না তাতে বোঝা গেল তৃতীয় দুনিয়ার স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বৃহৎ শক্তিগুলি নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাস্তববাদীই হবে।

ইন্দোচীনের যুদ্ধ চলছিল—এ-যুদ্ধে ব্যাপক বোমাবর্ষণ, ফসল নষ্ট, পরমাণু বোমা ছোঁড়া, বস্তুত মানুষমারার প্রতিটি পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয়েছিল। ক্রিসমাসের সময়ও হলো বোমাবাজি, তখন একটা চুক্তির কথাবার্তা চলছিল : ওই চুক্তিতে সই হলো ১৯৭৩ সালে।

যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পশ্চিম-ইউরোপের বিশ্রামের সুযোগ এল না। ১৯৭৩-এর আরব-ইজরেল যুদ্ধ দেখিয়ে দিল ইজরেলিরা নাৎসিদের মতোই অপরাজেয় নয় ; ইহুদিরা অনেকসময় নাৎসিদের কায়দাতেই চলে। আরবদের প্রাথমিক সাফল্যে ইজরেল-বিরোধী শিবিরে শক্তি ও সংহতির বোধ জন্মাল, প্যালেস্টিনীয় আদর্শকে জোগাল উৎসাহ। সম্ভবত আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে আরো সুদূরপ্রসারী এবং ফলপ্রদ ঘটনাটি হলো তৈল নামক অস্ত্রটির প্রথম কার্যকর প্রয়োগ। সাম্রাজ্যবাদী

পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত এই অস্ত্রটিকে স্বাগত জানাল তৃতীয় দুনিয়া, যদিও এ-দুনিয়ার অর্থনীতি ভীষণভাবে ঘা খেয়েছিল। পরবর্তীকালে তেলের দামের লড়াই নিদারুণ প্রভাব ফেলেছিল গরিব দেশগুলোতে। পক্ষান্তরে পশ্চিমি দুনিয়া দেখিয়ে দিল যে চোট সামলাতে তারা বেশ সমর্থ। আরবরা তাদের অবিশ্বাস্য মুনাফার অধিকাংশই বিনিয়োগ করল পশ্চিমে এবং পশ্চিমি দুনিয়া তৈলসমৃদ্ধ দেশগুলিতে রপ্তানিযোগ্য সমরাস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। দরাদরিতে প্যালেস্টিনীয় যোদ্ধারা পড়েছে দুর্বল হয়ে। আরো পরে ইজরেলের সঙ্গে সাদাতের শান্তিচুক্তির ফলে আরবদুনিয়াও ভাগ হয়ে গেল।

১৯৪৭ এল; ইন্দিরা-ভক্তিতে তখন মন্দা ভাব। সাংঘাতিক মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক অসন্তোষ সারা দেশ জুড়ে। ইন্দিরা গান্ধি মেকিয়াভেলীয় দমননীতিতে রেল-ধর্মঘট ভেঙে দেখিয়ে দিলেন পবের কঠিন সময়ে তিনি কতখানি কঠিনতর হবেন। যখন গুজরাটের ছাত্র-অসন্তোষ (এবং সাফল্য) বিহারের হাওয়াকে গরম করল, ইন্দিবা গান্ধি জয়প্রকাশকে কঠিনতর আঘাত দিতে প্রস্তুত হলেন। শহরভিত্তিক আন্দোলনকে গ্রামে টেনে নেবার চেষ্টায় ছিলেন সর্বোদয় নেতা; কিন্তু অহিংস গান্ধিবাদী হওয়ায় গুজরাটের ছাত্রদের মতো তিনি বিহারি মন্ত্রীসভাকে উৎখাত করতে পাবলেন না। শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়াই তিনি ভারতব্যাপী আন্দোলনের পরিকল্পনা ফাঁদলেন।

জরুরি অবস্থার সময়ে কী ঘটেছিল তা সবারই জানা—যদিও মাফিয়াদের অত্যাচার তেমন তীব্রতার সঙ্গে এখন আব স্মরণ করা হয় না, অসংখ্য তদন্তকমিশন বসানো সত্ত্বেও—এটাই হলো আমাদের রাজনীতিবিদদের চরিত্র। তাছাড়া যাঁরা জরুরি অবস্থার আগে সংগঠিত অপরাধগুলো সম্পর্কে নীবব থাকা শ্রেয় মনে করেন, সেই উদার গণতন্ত্রীরা তাঁদের ক্রোধ বেশিদিন জিইয়ে রাখতে পারলেন না। শ্রীমতী কিছুসময়েব জন্য ভয় পেয়ে ছিলেন ১৯৭৫-এর ১৫ই অগস্ট মুজিবের পরিণতি দেখে (ভুট্টোর পরিণতি আলাদা ব্যাপার)। নিজেরই মিথ্যে-প্রচারে ফুলে-ফেঁপে শ্রীমতী গান্ধি অবশেষে ১৯৭৭-এর জানুয়ারিতে RAW-র শিকারগ্রস্ত হয়ে নির্বাচনের আদেশ দিলেন। এবার তিনি কুটোর মতো ভেসে গেলেন, এবং মনে হলো চিরকালের জন্য সমস্তরকমের কংগ্রেসিরাই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু জনতা পার্টি নিজেকে এবং দেশকে যে-অবস্থায় এনে ফেলল তাতে শুরু হলো ভাঙাচোরা। গুপ্ত এবং প্রকাশ্য দ্বন্দ্বগুলি সি. আর. পি., সি. আই. এস. এফ. আর্মি সংঘর্ষ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উত্তেজনার রূপ নিয়ে দেখা দিল। আমাদের বামপন্থীরা অন্তহীন বিতর্কে লিপ্ত। পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার বামফ্রণ্ট কোনো ঐতিহাসিক তাৎপর্যেই মণ্ডিত হতে পারে নি।

জরুরি অবস্থার বছরটি অবশ্য সার্বিক নৈরাশ্যেই শেষ হয় নি। এই বছরই

ইন্দোচীনের জনসাধারণের চূড়ান্ত জয়লাভ হলো—যা পরবর্তীকালের ঘটনাবলি সত্ত্বেও এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। ১৯৭৬-এ চীনের মাটি দুলে উঠল, মাও সে-তুঙ মারা গেলেন। শোক শেষ হবার আগেই উৎখাত হলো 'দুষ্টচক্র', এবং সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত হলো চারচক্রের বিরুদ্ধে প্রচার। ১৯৭৮-এর ২৫ শে ডিসেম্বর ভিয়েতনাম-বাহিনী তার পূর্ব-সহযোগী এবং আশ্রয়স্থল কামপুচিয়ায় শুরু করল ব্যাপক আক্রমণ, এবং অবিমিশ্র রুশ সাহায্য ও সমর্থন নিয়ে প্রতিষ্ঠা করল হেং সামরিনের শাসন। পরের বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে চীনারা "ভিয়েতনামিদের একটা শিক্ষা" দিল। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় যা চলছে তাতেও বিগত দশককে বিভ্রান্তির দশক বলতে চাইবেন অনেকে।

১৯৭৫ এবং ১৯৭৬-এর মধ্যবর্তী সময়ে দক্ষিণ-আফ্রিকার মুক্তি-আন্দোলনের ফলে গিনি বিসাউ এবং মোজাম্বিকের জন্ম হলো। অ্যাঙ্গোলায় রপ্তানি করা হলো 'বিপ্লব'; পৃথিবীর এই অংশে আমরা দেখি হাজার হাজাব কিউবান ফৌজ। জিম্বাবোয়েতে হয়েছে একটা পরীক্ষামূলক চুক্তি; দক্ষিণ-আফ্রিকায় রয়ে গেছে সেই একই বর্ণবিদ্বেষ। লাতিন আমেরিকায় বইছে পরিবর্তনের হাওয়া, যদিও সেখানে গেরিলা যুদ্ধের প্রকোপ অতটা আর নেই। ইরানে হলো এক অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ, যাতে এক রুদ্রতেজ শাহ গদীচ্যুত হলেন। তার আমেরিকান বন্ধুরা বর্বর সাভাক ব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখতে কিছুই করতে পারল না। তেহেরানে মার্কিনদের অবরোধসহ তারপব থেকে সেখানে যা ঘটছে, তা বিতর্কসাপেক্ষ, পরিণতি অজানা। ইসলামীয় গোঁড়ামির উত্থান লক্ষ্য করার মতো ঘটনা।

গত দশকের অতি-সংক্ষিপ্ত এই পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে যে ইউরোপ হচ্ছে রুশিদের ভাষায়—শান্তির মহাদেশ। তৃতীয় দুনিয়াকে সামলাতে হচ্ছে তাণ্ডব, আক্রমণ, অনুপ্রবেশ, আভ্যন্তরীণ কলহ, বর্বর দমন; কিছু কিছু গৌরবময় প্রতিরোধ আমরা অবশ্য দেখেছি। সাম্রাজ্যবাদ এবং সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের সম্পদ-বৃদ্ধি এই দুনিয়াকে দেখাচ্ছে তাদের হলুদ আর লাল চোখ; তৃতীয় দুনিয়া আটের দশকেও কোনো বিশ্রামের অবকাশ পাবে না। মুদ্রাস্ফীতির ভূত ক্রমেই চেপে বসছে তার ঘাড়ে। এই দেশের ক্ষেত্রে কী বৈপরীত্য? ষাটদশকের শেষভাগের বিপ্লবী প্রত্যাশার পরিবর্তে চূড়ান্ত নীতিবিগর্হিত নির্বাচনের জন্যে আজ প্রতীক্ষা।

বিষ্ণু দে : সমসাময়িকের দৃষ্টিতে

উনিশশো পঁয়ত্রিশে বুদ্ধদেব বসুর ত্রৈমাসিক 'কবিতা' প্রকাশের জন্য যে-পাঁচজন পাঁচটাকা করে চাঁদা দিয়েছিলেন, বিষ্ণু দে ছিলেন তাঁদের একজন। 'কবিতা'য় আর তার আগে 'পরিচয়'-এ বিষ্ণু দে-র বেশ-কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতা বেরিয়েছিল।

যাঁরা এককালে রবীন্দ্র-বিরোধিতার গর্ব ক'রে পরে রবীন্দ্রনাথের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছিলেন, বিষ্ণু দে তাঁদের মধ্যে ছিলেন না। ব্যক্তিত্বের গড়নে পরম্পরার ভূমিকা বোঝার ক্ষমতা তরুণ বয়সেই তাঁর ছিল। কিন্তু এটাই বেখাপ্পা লাগে যে, রবীন্দ্রনাথ প্রাক্তন বিদ্রোহীদের কেবল প্রশ্রয়ই দেন নি, এমনকী 'গুরুদেব'কে যিনি গালি-গালাজ করতেও কসুর করেন নি—সেই ব্যক্তিও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন, অথচ তিরিশের শেষদিকে তাঁর সম্পাদিত কবিতা-সংগ্রহে বিষ্ণু দে-র কবিতা নেন নি। হয়ত বিষ্ণু দে-র গোড়ার কবিতা তাঁর কাছে অতি-মিশ্রিত ঠেকে।

আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় উনিশশো পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ নাগাদ। সে-সময় গুরুতর পেটের অসুখের জন্য তিনি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। সেই আয়ুর্বেদিক পাচন ছিল তাঁর গোড়ার কিছু কবিতার মতো অদ্ভুত। তখন তাঁর মেজাজ ছিল তিক্ত। আর জিভ ছিল তীক্ষ্ণ ও জ্বালাধরা, যেটা অনেকের কাছে অস্বস্তিকর ঠেকত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাঁর তিক্ততা কেটে যায়, তাঁর সান্নিধ্যে সবাই স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন সমকালীন মানুষদের ব্যক্তিগত জীবন ও নানা দুর্বলতা সম্পর্কে তাঁর দুরন্ত কৌতূহল ও মন্তব্য সত্ত্বেও, কিংবা সেই কারণেই।

পাশ্চাত্যের আর এ-দেশের সংগীতে তাঁর ছিল নিরন্তর আগ্রহ। আর ছিল ছবি সম্পর্কে, বিশেষ করে যামিনী রায়ের সম্পর্কে আগ্রহ। অশোক মিত্র আর চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা আড্ডা দিতাম। আমরা তিনজন একবার ঠিক করলাম যে তাঁর বাখ্, মোৎসার্ট, বিঠোফেন ও অন্যান্য সংগ্রহ শোনার অছিলায় প্রত্যেকদিন গিয়ে তাঁকে আমরা নাস্তানাবুদ করব। প্রথমদিকে বিকেলের চা ছাড়াও জলখাবার আর সিগারেট দিয়ে তিনি আমাদের আপ্যায়িত করলেন। কদিন বাদেই জলখাবার বন্ধ হলো আর আমরা নিজেদের সিগারেট পোড়াতে লাগলাম। কয়েকসপ্তাহের মধ্যে আমরা স্নায়ুবিকারের অবস্থায় এসে পৌঁছলেও বিষ্ণুবাবু রইলেন অবিচলিত। এই অবিচলভাব তাঁর কবিজীবনেও দেখা গেছে, যা তাঁকে দিয়েছিল আপাত-গাম্ভীর্য। তাঁর কবিতায় বিষয়-বৈচিত্র্য থাকলেও এই কারণে ছিল না অস্থিরতা। তিনি প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে

আমার প্রতিবেশী হয়ে আসার আগে আমাদের সেই স্নায়ুযুদ্ধ ঘটে—প্রতিবেশী হবার সময় জানতাম না যে, তাঁর নৈকট্য ছিল এক দুর্লভ সৌভাগ্য।

তিরিশের কবিদের মধ্যে কে কার চেয়ে বড়ো, এই নিয়ে চলত ঠাণ্ডা লড়াই। রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ছিল অমোঘ। নানা খামৃতি সত্ত্বেও এই বিরাট মানুষকে সরিয়ে আর-কারো সেখানে দাঁড়াবার প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু তরুণ কবিসহ প্রত্যেকেরই ছিল বিশিষ্ট একটা রীতি: জীবনানন্দ দাশের যাদুর জগত আর ভাষা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তর যুক্তি ও আবেগের যুগলমিলন, বুদ্ধদেব বসুর নির্ভেজাল রোম্যান্টি-সিজম্, প্রেমেন্দ্র মিত্রর বস্তিবাসী আর খেটে-খাওয়া-মানুষের প্রতি আগ্রহ আর বিষ্ণু দে-র সামাজিক ব্যঙ্গ এবং দিকবদলের একটা প্রাথমিক উপলব্ধি।

ফ্যাসিস্ত ও নাৎসিদের তৈরি সংকটজনক বিশ্বপরিস্থিতির সময় এককালে ফ্যাসি-বিরোধী একতায় লেখকেরা সমবেত হয়েছিলেন। বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর পরের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অনুরাগী ছিলেন না। কিন্তু ফ্যাসিবাদ আর নাৎসিতন্ত্র সভ্যতার যে-সংকট সৃষ্টি করেছিল, সে-বিষয়ে এই দুই কবি সজাগ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও যাবার আগে এই সংকটবোধে পীড়িত হয়েছিলেন।

সোবিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিতে সুধীন্দ্রনাথের মতো মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছিল। 'বামপন্থী' কবিদের লড়াকু মেজাজ কিছুদিনের মধ্যে বুদ্ধদেবকে বিচলিত করে। অবিচল ছিলেন বিষ্ণু দে। তিনি মানুষের কাছাকাছি আসার ও তাঁর ভাষায় অসাধারণ কারিগরির ভিতর দিয়ে সরল হবার চেষ্টা করছিলেন, যদিও মানুষ তাঁর কাছাকাছি এসেছিল কিনা সেটা আরেক প্রশ্ন। মানুষের শ্রম ও সংগ্রামে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু তাঁর কবিতায় সংগ্রামের উর্ধ্বের এক পরিস্থিতি এসে গেল, এসে গেল এই ধারণা যে তিনি সময়ের অস্থিরতা সত্ত্বেও অন্তরের গভীর এক শান্ত কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছেন। এটা তাঁর বহু পাঠকের কাছে ঠিক মনে হয় নি। কিন্তু তাঁর মৌলিকতা প্রশ্নাতীত আর তাঁর প্রভাবও থাকবে অবিচ্ছিন্ন।

জনৈক সাংবাদিকের ভাষায় তিনি ছিলেন 'আন্তর্জাতিক', কিন্তু নানা আমন্ত্রণ ও প্রলোভন সত্ত্বেও তিনি বিদেশে যান নি ; তাঁকে কেউ বিদেশি পোশাকে দেখে নি। আদবকায়দায় প্রায় খাঁটি বাঙালি এই মানুষটির বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান ছিল ঈর্ষণীয়। এই ধরনের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সৃষ্টিশীল মানুষ মস্তিষ্কের রোগে যে-ভাবে ধীরে-ধীরে চলবার ও বলবার ক্ষমতা হারালেন, সেটা মর্মান্তিক।

প্রসঙ্গ কলকাতা

একসময় কলকাতায় মানুষ হতে পারলে বরাতজোর মনে করত লোকে। কলকাতা থেকে ইংরেজের তৈরি রাজধানী অবিশ্যি অনেক আগেই চলে গিয়েছিল মন্ত্রণালয়-মহিমান্বিত দিল্লিতে। তাছাড়া কলকাতার খুব যে একটা সৌন্দর্য ছিল তাও নয়। তবু দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক জগতে কলকাতার একটা বড়ো ভূমিকা তখনো ছিল, সকলেই সেজন্য রীতিমত গর্ব বোধ করত।

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে বছরতিনেক বিদেশে কাটিয়ে আমি কলকাতায় ফিরি। প্রথম ধাপে দিল্লি পৌঁছে ভালোই লাগছিল, কিন্তু কলকাতায় ফেরার জন্য মনে আগ্রহও কম ছিল না। দমদম থেকে, শহরের ভিতরে আসার রাস্তা ফুল-ছড়ানো নয়। চারদিকেই রয়েছে ছিরিছাঁদহীন দুঃখকষ্টের ছবি। তবু মনকে চোখঠারা গেছে এই ভেবে যে ভ্রমণের জৌলুশ বাড়ানোর জন্য অন্য-সব শহরের মতো চেষ্টা না-করে কলকাতা হয়ত ইচ্ছে করেই তার এয়ারপোর্ট থেকে ভিতরে ঢোকার রাস্তাটিতে জাঁকজমকের চেষ্টা করে নি।

কিন্তু দিনকাল বদলে গেছে। দমদমে নামুন বা ট্রেনে করে হাওড়ায় আসুন, কিংবা দুর্ভাগ্যক্রমে পৌঁছান এসে শেয়ালদায়, অস্বস্তি আপনার বাড়তেই থাকবে। মনে হবে যেন ফিরে আসছেন পোড়ো একটি মফস্বল শহরে; ভাগ্যবানেরা যে-শহর আগেই ছেড়ে গেছে, আর গরিবেরা হানাহানি করছে নিজেদের মধ্যে। যে-শহরে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সবরকম আয়োজনই অসফল হয়ে যায়।

গোড়ার কারণটিকে অবিশ্যি আর্থিক বলা হয়, রাজনৈতিক কারণও রীতিমতো ঘাবড়ে দেবার মতো। আগে হয়তো উপর থেকে দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু আসল ব্যাপারটি শুরু হয়েছিল তিরিশের দশকেই। বিশের দশকে নেতারা কলকাতা কর্পোরেশন দখল করলেন। তখন থেকেই তাঁদের আসল চেহারা ধরা পড়ে এবং ইঙ্গিত মেলে কী ঘটবে সারা ভারতে ১৯৪৭-এর পর। রাজনীতিই তখন সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। কি সে কী রাজনীতি! নেতারা ছিলেন একনম্বর স্বার্থপর, আর তাঁদের চেলাচামুণ্ডারা যেন একেবারে গিলেই ফেলল গোটা প্রতিষ্ঠানটিকে। মুখে তাঁরা জাতীয়তার বুলি কপচাতেন, কিন্তু ঝোল টানতেন নিজেদের কোলেই। দুর্নীতি আর স্বজনপোষণেরও বেশ ফাঁকফুরসুৎ করে দিতেন তাঁরা। কিন্তু তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাতীয়-আন্দোলন চলছিল বলে দেশের মানুষ নেতাদের সমীহ করত। আর নেতারাও তাঁদের দোষত্রুটির জন্যে দায়ী করতেন ব্রিটিশ

রাজকে। তাঁরা বলতেন, ইংরেজরা দেশ থেকে তল্পি গোটালেই সবকিছু আবার আমরা নতুন করে ঢেলে সাজাব।

এরপর বাধল যুদ্ধ। কলকাতায় কয়েকটা বোমা পড়ল। যারা মনে মনে চাইত যে জাপানিরা আসুক, তারাও শহর থেকে কেটে পড়ল। জিনিশপত্রের দাম বাড়তে থাকল। ঠিকেদার, দালাল আর বেশ্যাদের বাজার হলো রমরমা। যুদ্ধের ফলে চাকরির বাজারও ভালো হলো। হয়ত-বা ভারত-ছাড়ো-আন্দোলন যে ভণ্ডুল হয়ে গেল তার খানিকটা কারণ ছিল যুদ্ধের ফলে এইসব নতুন সুযোগ-সুবিধের আমদানি। তারপর এল ৪৩ সালের মানুষের তৈরি মন্বন্তর। প্রথমদিকে এর জন্য সকলের মনে করুণার ভাব জন্মেছিল, তারপর এল দায়িত্ব-এড়ানোর ইচ্ছে, তারপর স্রেফ উদাসীনতা। ছেলে-বুড়ো-মেয়ে নির্বিশেষে দলে দলে না-খেতে-পাওয়া মানুষকে পোকামাকড়ের মতো মরে থাকতে দেখত সবাই ফুটপাতের উপর। সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ একেবারে শূন্যে মিলিয়ে যেতে লাগল।

কিছুটা পালাবদল ঘটল ১৯৪৫ সালের ক্রোধ ও বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গের ভিতর দিয়ে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর্থনে বিশাল এক হিন্দু-মুসলিম মোর্চা গড়ে উঠল। '৪৬-এর ২৯ জুলাই হলো মনে রাখবার মতো একটা সাধারণ ধর্মঘট। সম্ভাবনা দেখা দিল সাম্প্রদায়িক বিভেদ কাটিয়ে উঠে যুগ্ম আন্দোলনেব, মার্কস-বাদীরা যা চাইছিল, কিন্তু সেইসময় কে এটা ভাবতে পেরেছিল যে কংগ্রেস আর মুসলিম লীগেব মারমুখী কিছু লোকেদের উস্‌কানিতে অগস্ট মাসের আধাআধি পার না-হতেই গোটা ছবিটা একেবারে পাল্টে যাবে? গণহত্যার যে বীভৎস কাণ্ড ঘটল তা অবর্ণনীয় বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। বোঝা গেল যে রবীন্দ্র-সংগীত-গাওয়া মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরাও আশা-ভরসাহীন অশিক্ষিত মানুষের মতোই বর্বর হয়ে উঠতে পারে। বরং অশিক্ষিত মানুষের এই ধরনের মাত্রা-হারানো কাণ্ড, ঠিক ক্ষমা করা না-গেলেও, কিছুটা তবু বোঝা যায়। দেশভাগ হবার পরেই পর্ববঙ্গ থেকে কাতারে কাতারে উদ্বাস্তু এসে কলকাতার চারপাশে জলাজমি পর্যন্ত ভরিয়ে ফেলল।

অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে, এ-শহরের আর নিস্তারের পথ নেই। দিন-গুজরানের জন্যে বল্‌গাহারা খরচের কথা বাদই দেওয়া গেল। কলকাতার জল-নিকাশের নালা ও নর্দমাগুলো তৈরি হয়েছে উনিশশতকের শেষে, তখনকার সামান্য সংখ্যার নাগরিকদের জন্য। সেগুলো একেবারে বুজে গেছে। সি. এম. পি. ও আর সি. এম. ডি. এ. থাক বা না-থাক, নিম্নবিত্ত মানুষদের দমবন্ধ-করা বসতি-এলাকার বাইরে যে-সব ছড়ানো-ছিটানো বস্তি রয়েছে, সেগুলো দেখে মনে হয় যেন মরামানুষের কাটা হাত-পা। বর্ষা এলে তো কথাই নেই। আগে রাস্তায়

জল জমত একটু দেরিতে, কিন্তু জল ছেড়েও যেত তাড়াতাড়ি। এখন ব্যাপার আলাদা। আলো-পাখা-যন্ত্রপাতি বিগড়ে যায় ঘন ঘন, শিল্পব্যবসা হোঁচট খেতে থাকে। শহরের বাইরে ১০,০০০ (নাকি ২০,০০০) গ্রামকে বিদ্যুৎ যোগানোর জন্য যে-সব কাঠের খুঁটি পোঁতা হয়েছিল, তা এখন মনে হয় কাষ্ঠ-রসিকতার মতো। যাতায়াতের কথা ভাবলে গায়ে জ্বর আসে। বড়লোকের পাড়া বাদ দিলে বাড়িঘর ছোটো ছোটো আর ঘিঞ্জি। বিশাল এক মানুষের বাহিনী বাস করে খুপরিতে, অথবা খোলা জায়গায়। চক্রাকারে চলে তাদের আহার নিদ্রা ঝগড়া প্রেম এমনকী মলমূত্র-ত্যাগও। হাজার হাজার মানুষ ফুটপাথে ঘুমোয়। গ্রাম থেকে যে-সব মানুষ আসে তারা ভাবে শহরে তবু যাহোক কিছু মিলবে, গ্রামে তো খাবারও নেই, মাথা-গোঁজারও ঠাঁই নেই।

চাকরির বাজার মন্দা। একটা পুরো প্রজন্ম যেন বাধ্যতামূলক অলসতা আর হতাশার শিকার। মাস্তান আর পাড়ার দাদারা আগেও সব থেকে ক্ষমতাশালী দলের আশ্রিত ছিল. ক্রমে তারা রাজনীতিতেও খেল দেখাতে শুরু করল। লোকেরাও মেনে নিল তাদের। জোর-করে-আদায়করা চাঁদায় তারা অনেকরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আর তাতে মন্ত্রীরা এবং দলনেতারা এসে সভাপতি হয়ে বসেন। এই রকম পরিস্থিতিতে স্বল্পকালস্থায়ী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলের বামপন্থী লড়াকু মনোভাবের পরিণাম হলো এই যে তাদের জমানা শেষ হতে-না-হতেই পুরো চাপটা এবার তাদের উপরেই বুমেরাঙের মতো ফিরে এল। হাজার হাজার কর্মীদের ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে হলো। যারা পুলিশের নির্যাতনের পরেও বেঁচে থাকল তারা পচতে লাগল জেলে, আর যারা চিরকালের জন্য শেষ হয়ে গেছে তাদের সংখ্যা যে কত কেউ জানে না।

অবিশ্যি খাস কলকাতা শহরের মধ্যে অনেকগুলো কলকাতা আছে। মধ্য কলকাতা তৈরি করেছিল ইংরেজ ; তাকে বাসযোগ্যও করেছিল তারাই। সেখানে যারা বাস করে তারা তো বটেই এমনকী যারা বালিগঞ্জে বা আরো-একটু দক্ষিণের দিকে থাকে, তারা ঠিক আন্দাজ করতে পারে না যাদবপুর, গড়িয়া বা টালিগঞ্জে কী ঘটে। অন্যদিকে আবার আছে সেইসব ঘিঞ্জি-এলাকা যা গড়ে উঠেছে এলোমেলোভাবে শিল্প-এলাকার কাছাকাছি। এখানে চটকল আর বিচিত্র-সব কলকারখানা গোটা অঞ্চলটাকে বসন্তের দাগের মতো কুৎসিত করছে, আর গঙ্গাতে ঢেলে দিচ্ছে যত রাজ্যের নোংরা-ময়লা। দিনের বেলায় নদীকে মনে হয় বিশাল এক মন্থরগতি হড়হড়ে ময়াল সাপের মতো। আকণ্ঠ ছাইপাশ গিলে সে যেন বদহজমে গা মোচড়াচ্ছে। কিন্তু এইসব নিকাশী ময়লা আর পলিমাটির বোঝা সত্ত্বেও ভোরবেলায় বা গোধূলির আলোয় তাকে কখনো কখনো, এখনো সুন্দর মনে হয়।

দক্ষিণ-কলকাতায় বালিগঞ্জ তৈরি করেছিল রিটায়ার-করা সরকারি নানা

কর্মচারী, পশারওয়ালা উকিল, প্রফেসার, ডাক্তার এবং আরো-সব পেশার লোকেরা। লেকের চারপাশের এলাকায় এখনো মাধুর্য আছে। সেই সঙ্গে রয়েছে মধ্যবিত্তের ফাঁকা আভিজাত্য। এ হলো একটা কলকাতা। এখনো উত্তরের এলাকা থেকে অনেক লোককে টেনে আনে এই দক্ষিণ-কলকাতা। পুজোর সময় তাদের ভিড় অনেকগুণ বেড়ে যায়। উত্তর-অঞ্চলে পুরনো দিনের অনেক বড়ো বড়ো দোকান থাকলেও গড়িয়াহাট আর তার আশপাশের কেনাকাটার এলাকায় উত্তরের দিক থেকে ক্রমেই আরো বেশি-বেশি লোকেরা বাজার করতে আসছে। এখানে ভিখিরির সংখ্যাও অবিশ্যি অগুণতি। কিন্তু এখানকার যুবক-যুবতীরা তিরিশ ও চল্লিশের দশকের যুবক-যুবতীদের চেয়ে অনেক বেশি স্বাস্থ্যবান, আর তাদের পোশাক-আশাকও অনেক ভালো। উত্তরের দিকে গেলে দেখা যায় লোকজন রীতিমতো শীর্ণকায়, আর তাদের অবস্থাও তত ভালো নয়। যুবকদেরও মনে হয় যেন আধপেটা খেয়ে রয়েছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, বাসস্থানের অকুলান আর চিকিৎসাপত্রের অভাব তাদের স্বাস্থ্যকে ব্যাহত করেছে।

মোটামুটি বলা যায়, উত্তর-কলকাতায় যাদের জন্ম তারা ইংরেজদের বেনিয়ান হিশেবে প্রথমে তাদের কাছাকাছি এসেছিল। এটাই হলো সেই তথাকথিত পুনর্জাগরণের কেন্দ্র। তিরিশের যুগেও এখানকার শিবমন্দির, গঞ্জিকাসেবার দল আর সাধারণ মানুষজন নিয়ে এলাকাটির নিজস্ব একটা মজা ছিল। এটাও ঠিক যে শহরের ব্যায়াম-কসরতের আখড়াগুলিও ছিল উত্তরের দিকে, আর সেখান থেকেই তৈরি হতেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা। কিন্তু এর আসল পরিচয় ছিল সাহিত্য, শিল্পকলা আর নাট্যশিল্পের কেন্দ্র হিশেবে। এই নিবন্ধের লেখক যখন উত্তর-কলকাতায় থাকত তখন তিরিশের যুগে তার সঙ্গে বিখ্যাত যে-সব মানুষের চেনা হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন যামিনী রায়, শিশির ভাদুড়ি ও সুধীন দত্ত। এঁরা সকলেই এখন প্রয়াত। রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িও এই এলাকাতেই। এখান থেকেই বেরোত কল্লোল, পরিচয়, প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউয়ের মতো পত্রিকা। কয়েকটি নামকরা বাংলা ও ইংরেজি দৈনিকও বেরোত এখান থেকে। (এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ডিকেন্স ও হপ্‌কিন্সের উপর উল্লেখ করার মতো কাজ করেছিলেন হাম্‌প্রে হাউস নামে একজন ইংরেজ অধ্যাপক, তিনি বলতেন, ভালো করে বাংলা শেখার জন্য তিনি এই এলাকার একটি ইংরেজি পত্রিকা পড়েন)। কেউ কেউ বলতে পারেন এটাকে ঠিক উত্তর-কলকাতা বলা যায় না। কিন্তু কলকাতার লোকেরা এটাকে উত্তর আর দক্ষিণ এলাকাতেই ভাগ করে থাকে, কখনোই বলে না পুব এবং পশ্চিম-কলকাতা। বোধকরি এর কারণ হলো কলকাতার বিস্তার ঘটেছিল এই উত্তর-দক্ষিণেই, কোমরের দিকটি ছিল রীতিমতো সরু।

নতুন বড়োলোকের সংখ্যা যতই বাড়তে লাগল, তাদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা

ক্রমেই দক্ষিণের দিকে সরে যেতে লাগল। কারণ এলাকাটি অনেক পরিকল্পিত-ভাবে বাড়ছিল, আর ফাঁকা জায়গাও ছিল বেশি। কলকাতায় 'পার্ক স্ট্রিটের দক্ষিণে' বলে একটা দেমাকিভাব আছে, সেইরকমই আছে দক্ষিণ-কলকাতাই চালিয়াতি। অবিশ্যি এটা একধরনের মানুষের মধ্যেই আছে। বেশিরভাগ মানুষ যারা দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে তাদের কাছে এর কোনো মানে নেই। শহরতলির দিকে এগোলে দেখা যায় দুর্দশার পরিমাণ বেড়ে চলেছে। এখানে বাস করে উদ্বাস্তুরা। তাদের সমস্যাগুলো যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেছে। এই সব কলোনিতে সব থেকে কর্মচঞ্চল, সব থেকে বিপ্লবী আর সেই সঙ্গে সব থেকে বাজে ছোকরারাও বেড়ে উঠেছে। এককালে এরা ছিল মধ্যবিত্ত, আর প্রাণপণে এরা ব্যর্থ চেষ্টা করে নিজেদের অবস্থা ফেরাতে।

কিন্তু কলকাতার অবস্থা যদি এই রকম তালগোল পাকানো হয়, বৃহত্তর কলকাতা এলাকা, অর্থাৎ ৩৬টি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে যে কলকাতা নগরাঞ্চল জেলা (সি. এম. ডি) তার অবস্থা আরো ভয়াবহ।

সংখ্যাতত্ত্বের ব্যাপারটি ঠিক ধরতে পারে না লোকে। মানুষের দুঃখদুর্দশাকে অঙ্ক দিয়ে বুঝতে পারে না সকলে। কিন্তু যারা তা বোঝে তাদের জন্য কিছু নমুনা দিচ্ছি। খাস কলকাতা শহরে লোকবসতির ঘনত্ব হলো প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৩০,৫০০ জন (নিউইয়র্ক শহরের চেয়ে তিনগুণ বেশি)। এর অর্ধেক অঞ্চলে জল-নিকাশের ব্যবস্থা নেই। জল-নিকাশের ব্যবস্থা যেখানে আছে, সেটা তৈরি হয়েছে ১৮৯৬ থেকে ১৯০৫-এর মধ্যে, তখনকার লোকসংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ। আর এখন খাস কলকাতার লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ। কিন্তু ড্রেন প্রায় বুজে এসেছে এখন।

শহরের জলসরবরাহও বন্ধ হয়ে যায় মাঝে-মাঝে। জলের বড়ো বড়ো পাইপে জং ধরেছে, পাম্পের মেশিন পুরনো হয়ে গেছে, আর বিদ্যুৎ-ছাঁটাইয়ের ফলে অনেক সময়েই তা অকেজো হয়ে থাকে।

তারপর যাতায়াত। বছর-বছর ট্রাম-বাসের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, এদিকে লোকসংখ্যা যাচ্ছে বেড়ে। শহরটা গোল হয়ে বাড়ে নি, বেড়েছে উত্তর-দক্ষিণে লম্বাভাবে। ফলে উন্নয়নের সুযোগ এখানে কম। অবিশ্যি শহরের পুব দিকে সল্টলেক অঞ্চলে নতুন-কিছু বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এই-যে পতনমুখী ঝোঁক, এর মূল কারণ কী? সমাজতাত্ত্বিক আর অর্থনীতিবিদরা বলছেন কলকাতা হলো বেওয়ারিশ শহর। সব থেকে প্রভাবশালী শিল্পব্যবসায়ীরা ভারতের অন্যপ্রদেশের মানুষ। কারিগর আর দিন-মজুররাও বেশিরভাগ এসেছে বাইরে থেকে।

লাভ আর রোজগার তাই বাইরে চলে যায়। সেই ১৯৩২ সালে যখন যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিত্বে এসেছিল তখন থেকেই বহু ব্যক্তি বলে আসছিলেন যে কেন্দ্রীয়

সরকার পূর্বাঞ্চলের প্রতি অবিচার করে আসছে। কলকাতা বন্দরকে নতুন করে ঢেলে সাজান হয় নি এবং তা প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য। এদিকে ইস্পাতের দাম সারাদেশে একরকম, কয়লার পরিবহণের জন্যে দেওয়া হয় মাল-পাঠানোর ভরতুকি, তারপর আছে লাইসেন্স বিতরণের নীতি। এরি পরিণামে লোহা আর কয়লা কাছাকাছি থাকার জন্য পূর্বাঞ্চলের যে বিশেষ সুবিধে ছিল তা থেকে এ-অঞ্চলকে বঞ্চিত হতে হয়। এর ফল হলো এই যে, যন্ত্রপাতি তৈরি আর অন্যান্য শিল্পে মহারাষ্ট্র অন্য রাজ্যগুলোকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেল।

পশ্চিমবঙ্গকে বহু পণ্যের জন্য অনেক চড়া দাম দিতে হয়, যেমন তুলো। এদিকে পাটের দাম ন্যায্যমূল্যের আধাআধি, বিশেষ করে যদি মনে রাখা যায় যে খাদ্যশস্য, তেল আর চিনি কিনতে পাটচাষিদের কী-পরিমাণ খরচ হয়। সত্যি বলতে কি কেউ কেউ মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা প্রায় উপনিবেশের মতো। আর কলকাতা তো সেই কলোনিরই রাজধানী, কাজেই তার বিকাশের রাস্তা বন্ধ। আবার অন্য কেউ কেউ এটা স্বীকার করেন যে কলকাতা অবাঙালী স্থিত-স্বার্থের দাবে রয়েছে এটা ঠিক, কিন্তু প্রশ্ন তোলেন, কেন্দ্র তো এইসব ব্যবসায়ী-দেরই প্রতিনিধি, তাঁরা কেন শহরের এই পতনের ব্যাপারটা ভুলে থাকেন? এখানে তো শ্রমিক মেলে সস্তায় আর আঞ্চলিক কিছু সুযোগ-সুবিধেও রয়েছে! এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলবে, আর সেইসঙ্গে চলবে কলকাতাকে একেবারে ফোঁপরা-করে-ফেলা।

কলকাতার এখন-আর-কোনো আশা-ভরসা নেই। এ হলো একটা মুমূর্ষু শহর। এটা অবিশ্যি অনেকেই মানতে চাইবে না। পেটিবুর্জোয়ারা বাস্তবের মুখোমুখি হতে পারে না। তারা মনে করিয়ে দেবে তাদের এই মহানগরের প্রাণ-শক্তির কথা। ঠিকই যে কলকাতা এখনো অনেকদিক দিয়েই আলাদা। কলকাতা দিল্লির মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে নি, খোদ কলকাতা এখনো ছোটো শহর। সে-জন্য বৃষ্টি না-হলে যাদবপুর থেকে বাগবাজার পর্যন্ত অল্পসময়েই যাতায়াত করা যায়। এর ফলে মতামত-বিনিময় আর বুদ্ধিজীবীদের মেলামেশার সুযোগ রয়েছে যথেষ্ট। তাছাড়া রয়েছে শস্তা রেস্তোরাঁ, মদ্যপানের বার, থিয়েটার আর অ্যাকাডেমি ইত্যাদি।

এ-শহরের লোকজনরা উত্তেজনাপ্রবণ। ঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া করে না। খাওয়াটা নির্ভর করে কখন তারা বাড়ি ফেরে অথবা কখন সন্ধ্যার সরগরম আড্ডার শেষে বন্ধুরা বিদায় নেয়, তার উপর। মদ্যপানের ফলে চিন্তাশক্তিতে জোয়ার লাগে প্রথমদিকটায়, জিভের কোনো আড় থাকে না। রাজনীতি প্রায়ই মারমুখী আর প্রাণঘাতী হয়ে দাঁড়ায় এবং তা শুধু আলংকারিক অর্থেই নয়।

নকশালপন্থীরাই ছিল শেষদশকের বিপ্লবী যারা মানুষকে জাগিয়ে তুলতে

পেরেছে, এমনকী বুদ্ধিজীবীদেরও। তারা সবাইকে এবং সবকিছুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল, আর অন্য পার্টির যুবকদের মতো না-হয়ে তারা মরতেও রাজি ছিল।

কোনো কোনো বিদেশি ব্যক্তি এই বিশাল, বুনো আর নোংরা শহরকে খুব তারিফ করেন। আর সত্যিই শহরটা এখনো মন কাড়েও বটে। অর্ধশিক্ষিতরা যে অতীত কলকাতার বড়াই করে, সেইসব রবীন্দ্রসংগীত ইত্যাদি, তার কথা বাদ দিন, তারপরেও আছেন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, উৎপল দত্ত, বিষ্ণু দে এবং আরো-অনেকে যাঁদের সঙ্গে খোশমেজাজে কথা বলা যায়।

সত্যজিৎ রায় দীর্ঘকায় এবং ঈষৎ দূরে থাকতে অভ্যস্ত, মৃণাল সেন নড়েচড়ে বেড়ান আর ঘরোয়া মেজাজের মানুষ ; বিষ্ণু দে ঠাট্টা-রসিকতা ভালোবাসেন, কিন্তু লোকজনকে কাছেও টানেন। উৎপল দত্ত দলে দলে 'মুক্তি ফৌজ' তৈরি করে দিতে পারেন। এখানকার সিনেমা তো সকলের দেখা, তারিফও করেছেন অনেকে। নাটকের মধ্যে অনেকগুলোই বিদেশি নাটকের ছায়ায় তৈরি, আর বেশ-কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলে সেখানে ; বহুলোক দেখতে যায় সে-সব নাটক। পত্র-পত্রিকার তো লেখাজোখা নেই, আর তাদের বৈচিত্র্যই বা কত। ছবি-আঁকিয়ে শিল্পীরা রীতিমতো সৃষ্টিতৎপর। সবদিক মিলিয়ে বলা যায়, একালের তরুণদের মধ্যে যারা ভালো তারা আগে যাদের দেখেছি তাদের চেয়ে অনেক ভালো, আবার খারাপেরা আরো-বেশি খারাপ।

কিন্তু যে-শহরের অর্থনীতি গোটা পূর্ব-অঞ্চলের অর্থনীতির সব থেকে বড়ো সহায় হওয়া সত্ত্বেও, আরোগ্যের অতীত অবস্থায় পৌঁছেছে সেই শহরে কি সংস্কৃতির বিস্তার হওয়া সম্ভব ? এখানে বেকারের সংখ্যা আকাশছোঁয়া, নোংরা-আবর্জনা যত্রতত্র ছড়ানো, এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনযাত্রা বিভীষিকায় ভরা, এখানে আমলাতন্ত্রের মধ্যে ময়ূরের কলাপবিকাশ থাকলেও সর্বোপরি জেগে রয়েছে লোভ আর লাভের শ্যেনচক্ষু।

সাহিত্যের ব্যাপারে বলা যায়, কয়েকজন লেখক বাদ দিলে বড়াই করার মতো ভালো কিছু এখন হচ্ছে না। গদ্য যা কিনা পরিণত যুক্তিপূর্ণ চিন্তার বাহন তাকে করে তোলা হচ্ছে অপরিচ্ছন্ন চিন্তার তালগোল-পাকানো কথার মারপ্যাঁচ। বেশিরভাগ কবিতাই একঘেয়ে। উপন্যাস ভারতীয় হুইস্কির মতোই নকল। বামপন্থী কিছু লেখক খুবই সোচ্চার, তাঁদের বিবেক, ক্রোধ এবং সহানুভূতি আছে ঠিকই, তাঁরা ইচ্ছাপূরণে গা ঢেলেও দিয়েছেন। এ-রকম একটা অবক্ষয়গ্রস্ত বনেদের ওপর শিল্পসাহিত্যের জাঁকালো এক সৌধ উঠবেই বা কী করে ? আর এ-ধরনের একটা ক্ষয়িষ্ণু শহরে বুদ্ধিজীবীরাই বা আর কতকাল তাঁদের সেই 'প্রাণশক্তি'র গল্প নিয়ে টিঁকে থাকতে পারবেন ?

কলকাতার দরকার এখন আমূল রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস। উদারপন্থীরা ভাবতে পারেন এটা হবে সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ উপায়ে, আর এতে থাকবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুযোগ এবং সবটাই ঘটবে আইনসভার বিধিবিধান মেনে। অন্য কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, গোটা ব্যবস্থাকেই সবলে উৎপাটিত করে ফেলা দরকার। আমরা যারা কলম আর টাইপ রাইটারের কারবারি তাবা এ-ব্যাপারে কিছুই প্রায় করতে পারি না। আমরা শুধু কী হয় দেখার জন্য অপেক্ষা করতে পারি। সভয়ে অপেক্ষা করতে পারি মেট্রো রেলপথেব কাজ কখন শেষ হবে। মাটির তলা দিয়ে দ্রুত যাতায়াতের ব্যবস্থা হলে অনেকেই হয়তো বেশ তাড়াতাড়িই শেষ গন্তব্যে পৌঁছে যাবে!

গ্রন্থ-সমালোচনা

১

ক্রন্দসী : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

অষ্টাদশশতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশশতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের একটি ঐতিহাসিক, সুতরাং নৈতিক, ভিত্তি ছিল। কিন্তু এই সর্বগ্রাসী ভূতকে ঘাড় থেকে নামানোই হলো আজকের দিনের প্রধান সমস্যা। বর্তমান পৃথিবীতে তাই সনাতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নৈতিক ভিত্তি আর নেই। সুধীন্দ্রনাথ মৃতপ্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কবি ; কিন্তু আজকের বিশ্বব্যাপী বিশৃঙ্খলার কথা এবং কারণ তাঁর অজ্ঞাত নয়। তবু জ্ঞানের চেয়ে মোহ বড়ো, এবং আভিজাত্যটা সুধীন্দ্রনাথের কবিতার রক্তে মেশানো। সে-জন্য বারেবারে তাঁর মন পুরাতন স্বাতন্ত্র্যের অসম্ভব আদর্শের দিকে ছোটে, এবং ব্যর্থতায় ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে। এরি ঘাত-প্রতিঘাত তাঁর কাব্যের মূল প্রেরণা। দুটি পৃথিবীর মধ্যে তিনি দণ্ডায়মান, তার একটি মৃত, আর একটি জন্মাবার ক্ষমতাহীন। মৃত পৃথিবীর বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু নবজন্মের সম্ভাবনায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের কাছে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার মানসিক যন্ত্রণা শেষ পর্যন্ত ফাঁপা বলে ঠেকলে অবিচার হবে না। তিনি এসে পড়েছেন বিনষ্টপ্রায় বণিক-বিশ্বের প্রান্তে, উত্তরকালে তাঁর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, পূর্বকালের স্মৃতি তাঁর কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেছে। প্রাক্তন, জাতিস্মর ইত্যাদি কথা এবং পৌরাণিক কল্পনার প্রাদুর্ভাব তাঁর কাব্যে সে-জন্যই হয়ত বেশি। রানীকে মৃত জানলেও বাঁদীতে তাঁর কোনো আসক্তি নেই। ব্যক্তিগতভাবে সনাতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আমি আস্থাহীন, তবু ফীড্রামের উদ্ধতিকে শ্রদ্ধা করতে পারি, কারণ এটা তো সহজে কল্পনা করা যেতে পারে যে 'অন্তরঙ্গ-সৌন্দর্যে'র আদর্শ আর তার বাস্তব সম্ভাবনার মাঝখানে আছে অনাগত সমাজ-বিপ্লবের ব্যবধান। ততদিন অন্তরঙ্গ-সৌন্দর্য আনাটা নেহাৎ ব্যক্তিগত ব্যাপার ; আধুনিক আভিজাত্যের এই ধ্রুপদী অভীপ্সার প্রতি প্রবল অনুরাগ আনাটা ততদিন শক্ত, কারণ বহুদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই আদর্শ আত্মকেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়ার খোলস হিশেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। 'ক্রন্দসী' পড়ার সময় উপনিষদের বৃক্ষের পরিবর্তে চোখের সামনে ভাসে শূন্যমুখী শিকড়, উৎপাটিত গাছের ছবি। 'What are the roots that clutch, what branches grow'—এই প্রশ্নের উত্তর ক্রন্দসীতে মেলে না।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় আকর্ষণের অনেক জিনিশ আছে আঙ্গিকের এবং মননের

দিক দিয়ে। তাঁর কবিতার মেরুদণ্ড অত্যন্ত দৃঢ়, যেটা অধিকাংশ বাঙালি কবিতে একান্ত বিরল। আঙ্গিকের দিক দিয়ে ছন্দের বলিষ্ঠ এবং বেগবান ঝংকার 'ক্রন্দসী'র প্রধান বিশেষত্ব। তাঁর লেখায় কয়েকটি বর্জনীয় উপাদান বর্তমান, যেমন স্থানে স্থানে পুনরুক্তির এবং অতি-কঠিন শব্দের প্রাচুর্য। এখানে দুটি জিনিশ উল্লেখ করা উচিত। প্রথমত ছন্দের গতিবেগে অধিকাংশ কঠিন শব্দই নিজেদের বোধগম্য করতে সমর্থ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সঠিক শব্দ ব্যবহারের সতর্কতা 'ক্রন্দসীর' অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুধীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার প্রায় প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তিতে বিস্ময়কর এবং বেগবান সংহতি আছে। দু-একটি পঙ্‌ক্তিতে তিনি যা প্রকাশ করেছেন তা অন্যান্য কবিদের হয়ত একটি সম্পূর্ণ কবিতাব খোবাক জোটাতে পারে। তবু তাঁর দীর্ঘ-রচনার কয়েকটিতে পঙ্‌ক্তিগত সংহতি সত্ত্বেও অসংহতি দোষ বর্তমান।

'ক্রন্দসী'র পটভূমিকা প্রধানত ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য, কিন্তু আধুনিক জ্ঞানের রাসায়নিক প্রক্রিয়া তাকে বিচিত্রভাবে রূপান্তরিত করেছে। এতদিন বাঙালি সাহিত্যিকেরা রামায়ণ ও মহাভারতের মূল উপাখ্যান এবং বহুবিধ ঘটনাবলিকে চলতি ভাষায় গপ্প' হিশেবে ব্যবহার করে এসেছেন। বর্তমান সমাজ এবং ইতিহাসের আলোয় যাঁরা উপরোক্ত ঘটনাবলিকে নবরূপ দিতে পেরেছেন সুধীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। তথাকথিত প্রেমের কবিতা 'ক্রন্দসী'তে একটিও নেই, এ-ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য। 'ক্রন্দসী'র মূলভাবের কথা প্রথমেই লিখেছি। ধ্বংসপ্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেব বিশ্ব সুধীন্দ্রনাথেব কাব্যে ব্যর্থতাবোধ এনেছে, এবং এটিই 'ক্রন্দসী'র বিশিষ্ট বৈচিত্র্য। এর ফলেই তিনি লিখতে পেরেছেন :

মিশরি সমাধিসম মরুগ্রস্ত এই যাদুঘরে
নিঃস্ব রোমন্থক কাল আপনারে পরিপাক করে।

(যাদুঘর)

এ-জিষ্ণুসেনার পাছে, জানি জানি, আজিকার মতো
ভ্রমিবে কবন্ধযূথ, অন্ধকার, ত্রস্ত বিভীষিকা,
নৈর্ব্যক্তিক হাহাকার, ভ্রান্তিসার, শূন্য মরীচিকা,
মড়ক কঙ্কালশেষ, বিকলাঙ্গ গতানুশোচনা,
অক্ষম ক্রোধের দাহ, নিষ্কারণ অতৃপ্তিযন্ত্রণা,
ক্ষুব্ধ আত্মধিক্কারের ধূমাঙ্কিত, খিন্ন তুষানল।

(বর্ষপঞ্চক)

মনে হলো আশা নাই,
মনে হলো ভাষা নাই পিঞ্জরিত ব্যর্থতা বলার।
মনে হলো

সংকুচিত হয়ে আসে মরণের চক্রব্যূহ যেন।
মনে হলো রন্ধ্রচারী মূষিকের মতো
শটিত জঞ্জালকণা কুড়ায়েছি এতকাল ধরে
কৃপণের ভাণ্ডারে ভাণ্ডারে ;
এইবার ফুরায়েছে পালা,
ঘাতক যন্ত্রের কারা অবরুদ্ধ হলো অবশেষে ;
এইবার উত্তোলিত সম্মার্জনীমূলে
পিষ্ট হবে অচিরাৎ অকিঞ্চন উঞ্ছবৃত্তি মম ॥ (সমাপ্তি)

'ক্রন্দসী'র শেষ কবিতা 'প্রার্থনা'র মতো ব্যঙ্গরচনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। আশা করি সুধীন্দ্রনাথের ব্যর্থতাবোধ ভবিষ্যতে বেদনাবোধ দ্বারা সমৃদ্ধ হবে। মহাভারতে-কথিত জরৎকারু পূর্বপুরুষদের দুর্দশা দেখে তাদের দুঃখমোচন করে-ছিলেন ; তখন সেটার চেষ্টা না-করে মূষিকরূপী কাল দ্বারা ছিন্নপ্রায় শীর্ণ সূত্রের জন্য বিলাপ করতে শুরু করলে যে-ছবিটা আমাদের মনে আসে তার সঙ্গে 'ক্রন্দসী'র অধিকাংশ কবিতা তুলনীয়।

উত্তর ফাল্গুনী : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বোধ হয় মহৎ কবিতা রচনার অন্তরায়। এ-মহত্ত্বের অনেকগুলি বিশেষত্বের মধ্যে একটির অভাব সহজেই আজকালকার লেখায় চোখে পড়ে। আগেকার কবিদের সঙ্গে অধিকাংশের একটি অদৃশ্য যোগসূত্র ছিল। সে-যোগসূত্র নানাকারণে এখন ছিন্ন। সমাজে দুর্দিন আগত, এবং দুর্দিনে লেখকেরা গণ্ডির মধ্যে আশ্রয়প্রয়াসী হন। সেটা হয়ত স্বাভাবিক, এবং সেক্ষেত্রে তাঁদের কাপুরুষ কিম্বা পাতিবুর্জোয়া বলে সম্বোধন করলেই শেষকথা বলা হয় না। বিক্ষোভের যুগে narrow strictness-এর চর্চা অনেকেই করছেন, এবং চর্চাটা কিছু পরিমাণে ফলপ্রসূ। তবে এ-চর্চার জের টানতে থাকলে অবক্ষয়ের অনেক লক্ষণ নির্ঘাৎ প্রকাশ পায়। তখন লক্ষণগুলিকে স্থান, কাল, পাত্রের রূপনির্দেশক হিশেবেই নেওয়াই ভালো, সাহিত্যের মূল্যবিচারের শেষ সামাজিক মাপকাঠি হয়ত তারা, কিন্তু সে-মাপকাঠি প্রয়োগ করার সময় নির্ণয় করা কঠিন, এবং প্রয়োগ-কর্তাদের যোগ্যতাও বিচার্য। ইতিহাসে দেখা গিয়েছে যে decadent সাহিত্য অনেকসময় ভবিষ্যৎ রচনার পথ নির্দেশক হয়েছে। এ-ঘটনার উল্লেখ করে আমরা বলতে পারি যে, সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় অবক্ষয়ের অনেক লক্ষণ বর্তমান, কিন্তু তাঁর কবিপ্রতিভা অনস্বীকার্য।

সুধীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট জীবনদর্শন আছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইতিহাস কম্বুরেখায় চলে না, চক্রবৎ ঘোরে। সে-জন্য প্রগতির কল্পনা তাঁর কাছে অর্বাচীন ঠেকে। তাঁর মতে প্রগতি আর প্রলয়ের মধ্যে বিশেষ তফাত নেই। অতীতের ঐতিহ্যে তাঁর আসক্তি বেশি। এ-বিশ্বাস ও মনোবৃত্তি সুধীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাকে কাব্য হিশেবে সার্থক কবেছে, কিন্তু তাঁব অধুনাতন রচনায় কয়েকটি বিপজ্জনক লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাঁর বিশ্বাসের দার্শনিক মূল্য হয়ত থাকতে পাবে, সেটার বিচার বর্তমান সমালোচকের আয়ত্তের বাইবে, কিন্তু এটা ঠিক যে বিশ্বাসকে কাব্যের পর্যায়ে আনতে গেলে দার্শনিকতা ছাড়া অন্য আবো-কিছুব প্রয়োজন আছে, কাব্যে বিশ্বাসের নাটকীয় প্রকাশ আবশ্যক, ঘাত-প্রতিঘাতের ভিত্তিতে নাটকীয় রূপ ধারণ করলে ব্যক্তিগত জীবনদর্শনেব কাব্যশক্তি প্রমাণিত হয়। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের বিশ্বাস সম্প্রতি obsession-এ পরিণত, এবং বিশ্বাস যখন আবেগে পরিণত হয় তখন তাব কাব্যশক্তি কমে আসে, শেষ পর্যন্ত লেখক একটি বিষণ্ণ গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেন, যেখানে মহৎ সত্যেব সাক্ষাৎ মেলে না, যেখানে দেখি শুধু নিঃস্ব বোমন্থক কাল আপনাকে পরিপাক করতে ব্যস্ত। মুদ্রাদোষ, পুনরাবৃত্তির বিষচক্রে লেখা তখন ভারাক্রান্ত হয়। অবশ্য এ-কথা আগেই বলেছি সুধীন্দ্রনাথেব অনেক কবিতা তাঁর দর্শনের ভিত্তিতে শক্তিমান, কিন্তু দর্শন সেখানে পবোক্ষভাবে আছে। "উত্তব ফাল্গুনী"ব প্রথম কবিতা উৎকৃষ্ট সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথমে বিশ্বাস ছিল কাল বৈনাশিক বটে, কিন্তু স্বরূপে বিশ্বাসী. তাই কালের গুহাচিত্রে মৃৎপ্রদীপপরম্পবা নিবাত নিষ্কম্প দীপ্তি শেষ পর্যন্ত পাবে. কিন্তু—

অনেক শতাব্দী কাটে। প্রকীর্তিত সে-কন্দবে ক্রমে
বাদুড় বানায় বাসা, কালপেঁচা আনাচে-কানাচে
ইঁদুবেব ধ্যান কবে ; কোণে কোণে অর্ধভুক্ত শব
লুকায় হিশাবি শিবা ; ভূমিসাৎ বিগ্রহেব কাছে
মহীলতা জোট বাঁধে, মধ্যে-মধ্যে তুষ্ট জরদ্গব
জুড়ায় অন্নেব জ্বালা কণ্টকিত দ্বারদেশে বসে।
তাদের পুরীষে, ক্লেদে অতীতের সার্থক প্রতীক
চাপা পড়ে নিরন্তর, নোনা লেগে চূর্ণলেপ খসে
হাসে অস্থিসাব শিলা। সুখশ্রান্ত ধনী নাগরিক
ক্বচিত সদলবলে আসে বনভোজনে সেখানে
পণ্যস্ত্রীর হাত ধরে ; আহারান্তে রংমশাল জ্বেলে
ভিত্তিগাত্রে চেয়ে থাকে, কলঙ্কিত কবন্ধ যেখানে
দলে বৈদেহীর উরু ; ছেঁড়া পাতা, ভাঙা টিন ফেলে

সায়াহ্নে শহরে ফেরে। প্রদোষের নির্বেদ বাড়ায়
বিক্ষিপ্ত অঙ্গার, ভস্ম, অতিক্রান্ত উৎসবের গ্লানি।

এ-বর্ণনায় একটি সভ্যতার জরা ও মৃত্যু আমাদের চোখের সামনে ভাসে। শেষ কবিতা 'প্রতিপদ'-এর তুলনা আমাদের সাহিত্যে বিরল। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় একটি দুর্লভ প্রসার আছে। রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে আরব- বেদুইনের রোমান্টিক মরুভূমি দেখেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

শতশ্রেয় মরুভূমি—সম্মার্জিত সন্তপ্ত সিমুমে ;
বন্ধ্যা। ফণিমনসায় কণ্টকিত, বিষাক্ত, ধূসর ;

দুটি মরুভূমির মধ্যে একটি যুগের ব্যবধান আছে।

সুধীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা, কয়েকটি ছাড়া, আমার বিশেষ ভালো লাগে না, সেটা বোধ হয় আমার অক্ষমতা। এ-ধরনের রচনা—

এ-ভুজমাঝে হাজার রূপবতী
আচম্বিতে প্রসাদ হারায়েছে ;
অমরা হতে দেবীরা সুধা এনে,
গরল নিয়ে নরকে চলে গেছে ॥

আমার অনুরাগ আকর্ষণ করে না। প্রেমের সঙ্গে দার্শনিকতার সংমিশ্রণ সহজে ঘটে না, সেটাব অতি চেষ্টা একটু হাস্যকব হয়, শেলী থেকে লরেন্স তার নিদর্শন। সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য আধুনিক কবি, তিনি তাঁর দার্শনিক ব্যর্থতাবোধের সমর্থন খুঁজেছেন প্রেমিকের ব্যর্থতাবোধে, কিন্তু তাঁব এ-ধরনের অনেক রচনায় আত্মকরুণার আভাষ আছে, অবশ্য তাঁর প্রেমের কবিতার মধ্যে অনেক আশ্চর্য লাইন আছে। তিনি এ-ধরনের রোমান্টিক বিষণ্ণতা সহজে কবিতায় আনতে পারেন !

হেমন্তের উর্ধ্বশ্বাস সাঁঝে
উদ্বাস্তু কালের পায়ে ঝিল্লীর মঞ্জীর যবে বাজে
আচ্ছন্ন মাঠের প্রান্তে, পরিব্যপ্ত মৃত্যুর ছায়ায়
আগন্তুক তমস্বিনী আপনারে অচিরে হারায়,

আবার তিনি স্বচ্ছন্দে বৈজ্ঞানিক রূপকের সাহায্যে লেখেন ;

তোমার সান্নিধ্যে তাই বসে থাকি আমি মৌনপ্রায়
সৌজন্যের ঘটাটোপে আপনাকে পাকে পাকে ঘিরে ;
যে-দিকে তাকাই দেখি নিরাশ্বাস বুদ্ধির তিমিরে
মোদের বিয়োগধর্মী চৈতন্যের চক্রচর কণা
স্বতন্ত্র জ্বালার কক্ষে নিরুপায়ে করে আনাগোনা।

সুধীন্দ্রনাথের রচনায় অপরিচিত শব্দের প্রাচুর্য দেখে অনেকে বিরক্ত হন, ভাবেন ও বলেন এটা অহেতুক পাণ্ডিত্য। এ-সূত্রে মনে রাখা দরকার যে বাংলার কাব্যভাষা এত একঘেয়ে হয়ে এসেছিল যে নতুন ভাবের ভারগ্রহণে অনেক শব্দ অক্ষম হতো, সেক্ষেত্রে অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার সম্পূর্ণ কাব্যের ন্যায়সংগত। আর যাঁরা এ-ধরনের শব্দ ব্যবহার করেন না, তাঁরাও ভাষা-ব্যবহারের ভঙ্গি বদলাতে চেষ্টা করেন।

সুধীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ পরিণতির দিক কী সেটা জানি না। কিন্তু তিনি ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, এবং অতীত ঐশ্বর্যের অংশ নিজের কাব্যভাণ্ডারে সঞ্চিত করতে পেরেছেন, সেজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এ-ঐশ্বর্যের পরিচয় অবশ্য "উত্তর-ফাল্গুনী"র চেয়ে বেশি মেলে "ক্রন্দসী"তে, তার কারণ বোধ হয় আলোচ্য কবিতা-গুলির রচনাকাল "ক্রন্দসী"র পূর্বে।

পূর্বলেখ : বিষ্ণু দে

আমাদের কাব্যে বিদেশি প্রভাব যথেষ্ট থাকাটা অনিবার্য। জাতীয়তার জয়গানে উদভ্রান্ত হয়ে অনেক রসিক কাব্যকে খাঁটি স্বদেশি করতে অনুরোধ করেন, কিন্তু ইতিহাসের গতিতে সেটা সম্ভবপর হয় নি। ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালি, প্রথম বিদেশি ভাষার সাহায্যে বিদেশি শিক্ষা পায়, কিন্তু আমাদের সাহিত্যের প্রাণধারা-জাগ্রত ছিল বলে ভাবের সমন্বয় সম্ভব হয়। মাইকেল মধুসূদনের অসাধারণ কাব্য এ-সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে সে-কালের শিক্ষা আমাদের মনে অনেক আজগুবি জিনিশের সৃষ্টি বরাবর করে চলেছে এবং অনেকসময় আমাদের চিন্তাধারায়, আমাদের ব্যবহারে একটা নিরালম্ব, শূন্যজীবী ভাব এনেছে। ক্রান্তিকালে এ-ভাবটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। মেকি মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিভাবানেরা প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু বিদেশি ভাব গ্রহণে তাঁরা কুণ্ঠিত বোধ করেন নি, কারণ সাহিত্যের জনযুদ্ধে বয়কট আন্দোলন বোধ হয় চলে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিদেশি প্রভাবের অভাব নেই; তিনি নিজ বলে পরকে আপন করেছেন, একটি জাতির কবিতা সৃষ্টি করে গিয়েছেন। কিন্তু যে-প্রতিভার মুক্ত ধারায় নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে, পরবর্তী নিকৃষ্ট লেখকদের হাতে সে-ধারা কলের জলের মতো তরলগতিতে চলতে শুরু করল। কবিতা যে বুদ্ধি-বৃত্তির উপর যথেষ্ট নির্ভর করে, হৃদয়ের চেয়ে মস্তিষ্কের দাম যে কোনো অংশে কবিতায় কম নয়, এ-কথাটা পরবর্তীরা বেমালুম ভুলে যেতে শুরু করেন। তাঁর জীবনদর্শন কালক্রমে অধিকাংশ লেখককে মানসিক পরিশ্রমের দুরূহ ভার থেকে

মুক্ত করে। রবীন্দ্রনাথ নিজে লেখায় বরাবর মোড় নিয়েছেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, নিত্য নতুন বিস্ময় জাগিয়েছেন, কিন্তু সাধারণ লেখকেরা তাঁর ভাব ও ভাষার টুকরো ভাঙিয়ে জীবনযাপন করতে লাগলেন।

এ-শতাব্দীর দ্বিতীয়দশকের শেষদিকে কয়েকজন সাহিত্যিকের আবির্ভাব বাংলায় হয়, যাঁরা লেখায় কঠিন সংযম ও বুদ্ধিবৃত্তি ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। তাঁরা বুঝলেন যে হৃদয়ের কল ঘুরিয়ে ছন্দের তোড় নামালেই কবিতা হয় না, তারা বাংলা সাহিত্যের ঊনবিংশ ও অষ্টাদশশতাব্দীতে আবার মনোনিবেশ করলেন, বুঝলেন যে আমাদের কাব্যজীবনে অলসতা ও অকর্মণ্যতা সম্ভবপর হয়েছে তার কারণ এই যে, বাকতাল্লা সত্ত্বেও আমরা অতীতের বাংলা ঐশ্বর্যের সন্ধান করি না, আমাদের সাহিত্যাগ্রজদের স্বচ্ছন্দ রসবোধ এবং সহজ আক্কেলজ্ঞান থেকে ক্রমশ আমরা নিজেদের বঞ্চিত করেছি। এ-সঙ্গে তাঁরা দেখলেন চাবিদিকে ধ্বংসের রূপ, সমাজে সংহতির অভাব, মনের ও কর্মের জীবনে নৈরাজ্য জয়ী, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ থেকে সামাজিক জীবনের মুলসূত্র অদৃশ্যপ্রায়। এ-পরিস্থিতিতে আশাবাদী হওয়া ও তরলকণ্ঠে ছন্দে স্ফূর্তি করা বিরাট প্রবঞ্চনা ; এ-উপলব্ধি তাঁদের কাব্যে নৈরাশ্য ও বিদ্রূপের সুর আনল। কোনো সম্পূর্ণ সক্রিয় জীবনদর্শন না মানলে এ-বিদ্রোহ সস্তা সিনিসিজম্-এ শুরু ও শেষ হতো, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ১৯৩০-এর আন্দোলনের পর থেকে বামপন্থী ভাবধারা বাংলায় বিস্তারলাভ করে। বামপন্থী সমালোচনা কতদূর সাথক হয়েছে জানি না, কিন্তু অন্তত এটা বামপন্থীরা বোঝাতে পেরেছেন যে সংকীর্ণ কেন্দ্রে আসীন হয়ে সাহিত্যচর্চা করলে সাহিত্যেরই ক্ষতি হয়, ঐতিহ্যের সন্ধান ব্যর্থ হতে বাধ্য যদি না সাম্প্রতিক জনজীবনের সঙ্গে কোনোরকম সংযোগ থাকে, উপরন্তু লোকায়তে নিজেকে বাঁধলে লোকোত্তরের সন্ধান মিলতে পারে। বামপন্থী চিন্তাধারা আত্মন্তরিতার হাত থেকে অনেককে বাঁচিয়েছে।

বিষ্ণু দের 'পূর্বলেখ' প্রসঙ্গে উপরের ভূমিকা আবশ্যক। কারণ তাঁর লেখায় উপরে বর্ণিত কয়েকটি ধারার আবির্ভাব ও গতি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। বিদেশি প্রভাব মেনে নিতে, বিদেশি পুরাণের নিরন্তর উল্লেখ করতে তিনি কখনো ডরান-নি ; উর্বশী ও আর্টেমিস্ দ্রষ্টব্য। আমাদের মতো অনেকে তাঁর পূর্বলেখায় অস্বস্তি বোধ করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরে নিয়েছেন যে অন্তত দেশি ও বিদেশি পুরাণের স্বভাবগত ঐক্যের সন্ধান তাঁর প্রথমদিকের কবিতায় আছে। বিষ্ণুবাবু ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, তাঁর কাব্যে ব্যর্থতাবোধ আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে যে অন্তত 'চোরাবালি' পর্যন্ত তাঁর বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গি খুব সার্থক হয় নি, কারণ শিখণ্ডীর গানে যে-শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই তারা এতই অসার যে তাদের সম্বন্ধে কবিতাও সার্থক হতে পারে না। কিন্তু সাম্প্রতিক রচনায় বিষ্ণু-বাবুর ব্যর্থতাবোধ আরো গভীর হয়েছে, কারণ তাতে বেদনাবোধের প্রমাণ আছে;

তাঁর আধুনিক লেখায় সক্রিয় জীবনদর্শনের নিদর্শন পাওয়া যায়, যে-দর্শন কয়েকটি উগ্র বামপন্থীদের কাছে অসার হতে পারে, কিন্তু যার গতি সত্যিকারের বামপন্থী, বা হিউম্যানিজম্-এ প্রতিষ্ঠিত।

বিষ্ণুবাবুর একটি মহৎ গুণ এই যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ। এ-নিরপেক্ষতার জন্য তাঁর কবিতায় পরিবর্তন তিনি আনতে পেরেছেন, এবং আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এবং হয়ত বামপন্থী প্রভাবে তাঁর নিরপেক্ষতা শেষ পর্যন্ত আত্মম্ভরিতায় পরিণত হয় নি। তাঁর সাম্প্রতিক লেখায় আমাদের আশানিরাশা ও বিক্ষোভ সংযত ছন্দে প্রকাশ পেয়েছে, এবং এ-সবের পিছনে গভীর সূত্রের সন্ধান তিনি করেছেন। বাস্তবজীবনে দেশবিদেশের কাব্যের প্রতিচ্ছবির সন্ধান কবিকিশোরের থেমেছে।

নাট্যকাব্যে সাঙ্গ হল নেপথ্য বিহার

...   ...

বলিষ্ঠ বিলাসে ক্লান্ত স্বয়ংবর মন।

আদিজননীর সহস্রবাহু নীড়ে তীর্থযাত্রী বামার সন্ধানী, কিন্তু চারিধারে সরীসৃপ ধূর্ত নাগরিক অর্থকামস্বর্গছিদ্র ঘুরে ফিরে খোঁজে, বক্রগতি উদ্ধত কৌরবের জয়পতাকা উড্ডীন, উপলব্ধি হয় আত্মম্ভরী কাজে স্বয়ম্ভূ প্রকাশ আর সম্ভব নয়, ব্যক্তির কৈবল্যে বাহুল্য ব্যক্তিও। বিষ্ণুবাবুর এ-সব কবিতায় মহাভারতের শেষের দিকের কয়েকটি অধ্যায়ের উল্লেখ বারেবাবে পাওয়া যায়, কারণ একদা-গর্বিত বণিক-সভ্যতার মুমূর্ষার সময় মহাভারতের সেই দৃশ্য স্মরণীয় যেখানে বিরাট প্রতিষ্ঠার পর অর্জুন গণ্ডীবধনু তুলতে অক্ষম হন। এই পৌরাণিক ঘটনার সঙ্গে বর্তমান জীবনের সাদৃশ্য 'পদধ্বনি' কবিতায় বিষ্ণুবাবু মহৎভাবে আমাদের সামনে এনেছেন :

ঘুমন্ত নগর, ঘরে ঘরে খিল,
ঊর্ধ্বশ্বাস উৎসবে কাতর বিলাসী যাদবযুবাদল
অতীতঅর্জিত সুখে এলোমোলো অলসভোগের
স্বার্থপর আবিষ্কারে ক্লান্তিভারে নিদ্রান্ধ বিকল।

ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টিতে, দুটি যুগের প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্যের ইঙ্গিতে এ-কবিতাটি স্মরণীয়। বিষ্ণুবাবুর কবিতায় জন্মাষ্টমীর ঘটনা অনেকবার উল্লিখিত। সমাজের অন্তিম গ্লানির ছবি শুধু তিনি দেখেন নি, মুক্তির ইঙ্গিত করেছেন। 'জন্মাষ্টমী' অনেকটা সংগীতধর্মী, বিচিত্র সুরে নানা ব্যক্তি ও ঘটনার স্রোতে প্রবাহিত। এর বিস্তারিত সমালোচনা সময়সাপেক্ষ। যে-মুক্তি 'জন্মাষ্টমী'র রূপকের সাহায্যে তিনি দেখেছেন ফিনল্যাণ্ড-যুদ্ধের উপর লেখা 'পদধ্বনি'র শেষ কয়েকটি লাইনে সেটি আমাদের পরিচিত রূপ নিয়েছে :

চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দিঘি ও খামার
চায় সোনাজ্বালা খনি। চায় স্থিতি, অবসর !
দস্যুদল উদ্ধত বর্বর
আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিষ্যে নির্ভর
দস্যুদল এল কি দুয়ারে ?

'পূর্বলেখ' এত বিচিত্র কবিতায় ধনী যে বিস্তারিত সমালোচনার প্রয়োজন। বিষ্ণুবাবুর কবিতায় সংগীতের প্রভাব যথেষ্ট আছে, এবং সেটি তাঁর কাব্যশক্তির অন্যতম উৎস। 'পদধ্বনি' 'জন্মাষ্টমী' ইত্যাদি ছাড়া 'সপ্তপদী' এ-প্রভাবের নিদর্শন।

'পূর্বলেখের' শেষাংশে কয়েকটি অনুবাদ আছে। এদের মধ্যে এলিয়টের কবিতাগুলির অনুবাদ সবল, লরেন্স-এর কবিতা বোধহয় অনুবাদের পক্ষে উপযুক্ত নয়, কারণ তাঁর গদ্যকবিতা অপেক্ষাকৃত তরল।

আমাদের প্রিয় অনেক আদর্শ ও দেশ আজ রাহুগ্রস্ত, মড়ক দিগ্বিজয়ী। বিষ্ণু-বাবুর একটি সনেট নানাকারণে আমার স্মরণীয় লাগে, সেটি থেকে উদ্ধৃত করে·এ-সমালোচনা শেষ করা যাক।

মাতা তার পথচারী, অন্নের আদিম অন্বেষায়।
দুর্ভিক্ষ এসেছে রুদ্র মড়কের রাসভবাহনে।
ঠগে ঠগে গাঁ উজাড, বর্গি এল শ্রাবণপ্লাবনে।
গলিতবলভী ঘবে মুক্তদ্বাবে যুগান্ত-হ্রেষায়
নির্বোধ নির্বোধ শিশু হাসে একা আনন্দিত মনে !

বসুন্ধরা : চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

চঞ্চলকুমারের লেখায় সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র প্রভাব প্রত্যক্ষ। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে চঞ্চলকুমার আত্মম্ভরিতায় আস্থা রাখেন না। তিনি এঁদের প্রভাব স্বচ্ছন্দে মেনে নিয়েছেন, এবং নিজ কাব্যে স্বকীয়তা এনেছেন। ফলে তাঁর লেখায় সংহতি সর্বত্র বর্তমান, অস্পষ্ট ভাবালুতা ও নবীন লেখকদের ভারসাম্যের অভাব থেকে তিনি বিস্ময়করভাবে মুক্ত। কয়েকটি কবিতায় অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের রচনার এবং বিষ্ণু দে-র সনেটগুলির কথা একটু-বেশি মনে পড়ে, যেমন 'শীর্ণ পত্র ঝরে গেল' (পৃ. ১৪)-এর সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের বর্ষপঞ্চকের প্রথমদিকের মিল সহজেই মনে পড়ে।

আধুনিক সমাজের বিকলন ও ব্যর্থতা উল্লেখযোগ্য কবিমাত্রেই প্রকাশ করেছেন। এ-বিকলনের আর্থনীতিক ও সামাজিক কারণ অধিকাংশ বিজ্ঞেরই

বুদ্ধিগোচর, সে-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা বাংলা কবিতার জীবনীশক্তির প্রমাণ যে সাম্প্রতিক অনেক কবিই সক্রিয়ভাবে ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং বৃহত্তর জীবনের আভাস দিতে প্রয়াস করেছেন। অনেকদিন কবিরা মধ্যবিত্তের অন্ধ খোঁয়াড়ে ছিলেন, সেখানে আত্মরতিতে, উন্নাসিক বিদ্রূপে ও পলায়নী মনোবৃত্তির পরাজিত দৃষ্টিতে তাঁদের দিন কাটত। সম্প্রতি যে-নতুনসুর বাংলা কবিতায় দেখা দিয়েছে তা আশাজনক। চঞ্চল-কুমারের লেখায় খোঁয়াড়ি মনোবৃত্তি ও তার থেকে মুক্তির প্রয়াস দুই-ই আছে। এ-প্রসঙ্গে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বর্ষশেষ'-এর কথা মনে রাখলে সুবিধে হবে। 'বর্ষশেষ'-এ মোটের উপর, চঞ্চলের সামাজিক বিকলনের কারণানুসন্ধান বহির্মুখী ছিল, কিন্তু 'বসুন্ধরা'য় তিনি বোধহয় তুলনায় অনেকবেশি অন্তর্মুখী হয়েছেন। যে-মড়কের বীজ নানারূপে বিশ্বব্যাপী তার সংক্রামক উপস্থিতি তিনি নিজ সত্তায় অস্পষ্ট পাপবোধে ও বিচলিত অস্বস্তিতে আবিষ্কার করেছেন। যথা :

প্রাক্তন পাপের ভারে আজো বুঝি হবে পরাজয়।
ভ্রান্তিশেষে চেতনাও যাত্রাপথে নিতান্ত অক্ষম।
অনির্দিষ্ট পদচিহ্ন সম্মুখেতে এনেছে সংশয়।
সুমেরুর দূরে দেখি অনুদ্দেশ্য মৃত্যুর আগম।

(পলাতক)

মনে হয় সময়ের অন্তিম প্রয়াণে
মননের অভিযানে শবযাত্রী কোনো ;

(সনেট, ১৫ পৃ.)

এবং 'পাপী' কবিতার চার লাইন।

প্রথম-অংশে 'পলাতক', সনেটগুলি এবং কয়েকলাইনের ছোটো কবিতাগুলি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয়-অংশে কয়েকটি গ্রীক কবিতা আছে। 'বসুন্ধরা'য় চঞ্চলের দৃষ্টিকোণ অন্তর্মুখী, খোঁয়াড় থেকে মুক্তির জন্য গ্রীক নাটকের কয়েকটি কাহিনীর বহিবাশ্রয় অবলম্বন তিনি করেছেন। 'বর্ষশেষে' এ-ধরনের কাহিনীর বহিরাশ্রয় নেই, কারণ সেখানে সমাজের বাইরের রূপ নিয়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। 'বসুন্ধরা'য় হয়ত তিনি আবিষ্কার করেছেন যে সমাজের গ্লানির বর্ণনা করে অবক্ষয় থেকে নিস্তার নেই, কবির কাছে নানাকারণে অবক্ষয়ের নিকটতম উৎস নিজের মন। মনের বিকার কাটিয়ে স্বাবলম্বী সাহস তিনি অর্জন করতে চেষ্টা করেছেন ওডিসিয়ুসের প্রতিকূল প্রতিবেশের বিরুদ্ধে অভিযান ও সাফল্যের ইতিহাসের সাহায্যে।

বারেবারে ঠেকে গিয়ে এসেছে নির্ভয়,
একনিষ্ঠ স্বধর্মে প্রত্যয়।

কাসাণ্ড্রা পরাজিতা ও বন্দিনী, কিন্তু পরাজিতার ভবিষ্যদ্‌বাণীতে কবি আশ্বাস পেয়েছেন। বিজেতার পরাক্রম স্বদেশে ব্যহত হবে, যে-বীজ রোপণ রক্তে বাকি তার আছে পরিচয়। যে সংহারক মূর্তি সামাজিক অবক্ষয়ের চরম প্রকাশ তারো ভবিষ্যৎ সংকীর্ণ, কালের প্রতিশোধে সে-মূর্তিও অবিলম্বে চূর্ণ হবে।

এরপর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা 'বসুন্ধরা'। আমাদের জীবনে মধ্যবিত্ত অক্ষমতা ও ব্যর্থতার থেকে মুক্তির উপায় জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ। সে যোগা-যোগ এতদিন একেবারে ছিল না, তাই আমাদের মানসলোকে নানাধরনের ছেলেখেলা চলত। আজ কালান্তক যুদ্ধের পটভূমিকায় বোঝা যায় যে এ-যোগাযোগ না-থাকলে আমাদের যাত্রা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই নতুন উপলব্ধিতে আমাদের আগেকার পণ্ডশ্রম-প্রয়াসের রূপ বদলেছে।

'বসুন্ধরা' সম্বন্ধে একটি আপত্তি ওঠে। শেষের দিকে চঞ্চলকুমার যে-পথের ইঙ্গিত করেছেন তা রাজনৈতিক বাক্‌বিতণ্ডার পর্যায়ে পড়ে। শেষের এপিগ্রাম-গুলির কয়েকটি কবিতা হিসেবে চতুর এবং সার্থক, কিন্তু তাদের মূলমন্ত্র :

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে করো গৃহবিবাদের গান।
শ্রেণী-সংগ্রামে লিপ্ত থাকুক যুদ্ধনিরত দেশ।

যাঁরা ১৯৪১-এ পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত করো'—এই আওয়াজ তুলছেন তাঁদের রসবোধ রাজনীতির কারণে ব্যাহত হলে অস্বাভাবিক হবে না।

২

একসূত্রে : ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত

এ-কবিতাগুলির সংকলন করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোলাম কুদ্দুস। কবিতা হিশেবে সার্থক রচনা 'একসূত্রে' তিন-চারটি আছে, কিন্তু এ-কবিতাগুলি বাদ দিলে, সংকলন হিসেবে 'একসূত্রে' ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে রাজনৈতিক কবিতা বিশেষ নেই। এটা তাজ্জব ব্যাপার যে ১৯৩০-৩১-র আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে রেখাপাত করতে পারে নি, যদিচ উপরোক্ত আন্দোলনে মধ্যবিত্তেরাই নায়ক ছিলেন। ১৯৩০ থেকে '৩৫ পর্যন্ত প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কোনো কাব্য-গ্রন্থ পাঠ করলে বোঝা যায় না যে দেশে কোনোরকম আলোড়ন হয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম যে এই আন্দোলনের ভিত্তিতে ভারতের অসংখ্য মূক জন-সাধারণ না-থাকায় উজ্জীবনী শক্তির অভাব ছিল, এবং সেজন্য তৎ-সাময়িক সাহিত্য রূপান্তরিত হয় নি। কিন্তু 'একসূত্রে'র দুটি ভূমিকার পিছনে যে দৃষ্টিভঙ্গি আছে তাতে মনে হয় যে আধুনিক কবিরা জনগণের সঙ্গে লুপ্ত আত্মীয়তা ফিরিয়ে আনবার প্রয়াসের মহৎ মূল্য বোঝেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ-উপলব্ধি ভালো কাব্যে এখনো রূপান্তরিত হয় নি। যদি বোমা ও জাপানির জায়গায় ফুল ও প্রেম বসিয়ে কবিতাগুলি পড়ি তাহলে মনে হবে যে ম্রিয়মান হৃতশক্তি সনাতনী ঐতিহ্য থেকে আমরা একটুও বিচ্যুত হই নি। সেটা আশার কথা নয়। আমাদের সত্তায় ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন এখনো দানা বাঁধতে পারে নি, সেটা হতে কলোনিতে সময় লাগে। ইংরেজের এই উপনিবেশ, যেখানে কর্তারা আমাদের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে পরম উদাসীন, যেখানে ধান, গম ইত্যাদি বাজার থেকে বেমালুম উধাও, যে-দেশের নেতারা জেলে পচছেন, সেখানে জনযুদ্ধ ব্যাপারটা মজ্জাগত হতে যে বিপ্লবী চেতনার দরকার, তার অনুপস্থিতি 'একসূত্রে' স্পষ্ট। এ-প্রসঙ্গে হিরণবাবুর বক্তৃতার কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য। 'একসূত্রে'র অধিকাংশ কবিরাই 'শূন্যমার্গী আন্তর্জাতিকতায়' আশ্রয় খুঁজছেন। জাতীয় সংকটের পটভূমিকায়, দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে 'একসূত্রে' পড়ে নিতান্ত হতাশ হয়েছি। আশা করি সুভাষ ও গোলাম কুদ্দুস সমালোচকের বেয়াদপি মাফ করবেন। 'We call it self-criticism.'

Boatman Boy : Sachi Raut Ray

শচী রাউত রায় উড়িষ্যার নতুন কবি, আলোচ্য গ্রন্থের নাম-কবিতাটি উড়িষ্যার জনগণের মুখে ধ্বনিত, তাদের বিপ্লবী চেতনা এ-কবিতায় নাকি ভাষা পেয়েছে। শচী রাউত হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি এবং নাট্যকার বলে সম্বোধন করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, এবং অনুবাদক লিখেছেন শচী রাউত রায় কবিতায় এবং জীবনে সংকীর্ণ শ্রেণীর গণ্ডি উতরিয়ে গিয়েছেন। ১৯৩৮ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে বাজী রাউত ঢেঙ্কানলে সশস্ত্র পুলিশের হাতে প্রাণ হারায়। বাজীর বয়স তখন বারো। এ নবীন বিপ্লবী বালকের স্মৃতিতে আলোচ্য গ্রন্থটি লিখিত। 'বোটম্যান বয়'-এর সমালোচনা করাটা কঠিন ব্যাপার। কারণ এটা জানা কথা যে, অনুবাদে মূল কবিতার অনেকসময় রঙিন রূপান্তব ঘটে। এ-ক্ষেত্রে অনুবাদ সফল হয় নি! অনর্থক বাগাড়ম্বরে এবং heroics-এ কবিতার অধিকাংশ পঙ্‌ক্তি ব্যর্থ, এবং কবি যে-সব রূপচিত্রের সাহায্য নিয়েছেন সেগুলি মামুলি। বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ উনিশশতকী ভাববিলাসী ভাষায় মানায় না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিষয়বস্তুর পরিবর্তন একেবারেই হয় নি, যে-সুরে কবিতাটি আরম্ভ সেই সুরেই শেষ। এবং সুরটি (হয়ত অনুবাদের জন্য) তার স্বকীয় প্রাণশক্তি এবং ভাষা হারিয়ে পুনরাবৃত্তি এবং সস্তা নাটকীয়তায় বিরক্তিকর। তবে মাঝে-মাঝে, অক্ষম অনুবাদ সত্ত্বেও, শচী রাউত রায়ের শক্তি আমরা উপলব্ধি করি, যেমন :

> This is no funeral-flame, Comrade !
> No funeral-flame, but freedom's leaping flame
> To cleave the country's darks of death and shame ;
> A sacrificial mystery
> Of death turned life···Flame beyond price ;

কিংবা

> Lo, Death has made
> Out of this young life's insignificance
> Each man's significance,

শেষের দিকের কবিতাগুলি ব্যক্তিগতভাবে আমার আরো ভালো লেগেছে, তাদের কয়েকটি ছত্রে আমরা নগ্ন ক্ষুধিত উড়িষ্যার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।

বিষয়বস্তুর নির্বাচনের জন্য শচী রাউত রায় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

৩

খসড়া : অমিয় চক্রবর্তী

বাঙালি কবিরা ভারতের বাইরে গিয়ে কবিতা লিখলেও বিদেশের আবহাওয়া বিশেষ আনতে পারেন না। স্বয়ং বিশ্বকবি এর ব্যতিক্রম নন। কোনো কবিতার নিচে রিও ডি জেনারো ধরনের নাম থাকলে যে-প্রত্যাশা জাগে তা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোনার বাংলার বর্ণনায় অনেকবারই মাঠে মারা গিয়েছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী এ-বিষয়ে আমাদের হতাশ করেন নি, সেটা তাঁর কাব্যে হিউমিলিটি বোধের লক্ষণ :

চলো সেই চেনা পথে-পথে
এডেন পেরিয়ে।
আকাশ-চাকায় ঘোরো
জলের চাকায়,
পাহাড় দ্বীপের সারি বাঙা-ছাত বাড়ি
ঠাণ্ডা সহর এল, পুরানো বন্ধুর,
দ্বীপজ্বালা বিদেশি বন্দর।
... ...
রাত্রে মাস্তুলে মেঘে ছিন্ন চাঁদ ঝোলে
সিনাইয়ের বালু ছায়া দূরে যায় চলে।

'খসড়া' বেশিরভাগ চিত্রবহুল কবিতায় পূর্ণ। কয়েকটি ছবি স্থানবিশেষ ভালো হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্যদিকে তারা অধিকাংশ কবিতার স্বল্প জড়তার কারণ। যে-ছন্দের আশ্রয় অমিয় চক্রবর্তী নিয়েছেন তার ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু তার সম্পূর্ণ সাফল্যের অন্তরায় হয়েছে অনাবশ্যক চিত্রবহুলতা। দার্শনিক কবিতাগুলি আমার ভালো লাগে নি।

পঞ্জাবে, পাঁচই মাঘে, রং নিয়ে ওপাশের ছাতে
বিকেলের মূর্তি এল সেলাম জানাতে।
বিশেষ বিকেল।

(চায়ের বেলা)

... ...

দরজা, মলিন পর্দা, কুলি-টানা পাখা,
ভিস্তি-বওয়া জল, ঝাঁটা, বহুর বেদনারক্তমাখা
জমিদারি মঞ্চে রাখা
দুর্লভ আরাম। আর, বৃষ্টির প্রার্থনা,
কৃপালোভী ভিড়ের সান্ত্বনা।

(মর্মান্তিক)

ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিগুলি "খসড়া"র যে-ধরনের কবিতাগুলি সত্যিই সফল তার ভালো উদাহরণ। সহজ কথা এবং অনাড়ম্বরতা এদের বিশেষত্ব। কিন্তু এ-সঙ্গে এ-কথাটাও মাঝে-মাঝে মনে হয়, সত্যিকার সহজ প্রকাশভঙ্গির পিছনে যে-প্রয়াস কাজ করে "খসড়া"র কবি অনেক জায়গায় সেটা পিছনে রাখতে পারেন নি, পাঠককে বুঝতে দিয়েছেন।

ছন্দের নূতনত্বের জন্য "খসড়া" খুব সম্ভব সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, কিন্তু এই বিষয়ে বর্তমান সমালোচকের জ্ঞান নামমাত্র বলে অনধিকারচর্চা থেকে নিরস্ত হওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

স্বপ্ন-কামনা : কিরণশংকর সেনগুপ্ত।
ত্রিশঙ্কু-মদন : মণীন্দ্র রায়।
পটভূমি : অনুপম গুপ্ত।

আমার এক বন্ধু অধিকাংশ নবীন কবির কাব্যের উপরে একটি মন্তব্য লিখে রাখেন : Get married. রুদ্ধরতি কবিতার মাঝে সান্ত্বনা খোঁজে, এ-কথাটি অন্তত শ্রী মণীন্দ্র রায় স্বীকার করেছেন। হয়ত অনেক মূল্যবান কবিতার মূল শেষ পর্যন্ত নিরুদ্ধরতি ; কিন্তু মূল জিনিশটি কী-ভাবে প্রকাশ লাভ করে তার উপরেই সমালোচকের দৃষ্টি থাকা উচিত। কিরণশংকর সেনগুপ্তের এবং মণীন্দ্র রায়ের কবিতা পড়ার সময় অনেক পরিচিত কবির কথা মনে আসে, সেটার জন্য যতটা দায়ী প্রথম প্রয়াস, ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান ততটা নয়। কিরণশংকর নারীদেহের উপর বেশি মনোযোগ দিয়ে তবু কিছু স্বকীয়তা আনতে পেরেছেন, শেষের দিকে ভাষা-ব্যবহারে তিনি অপেক্ষাকৃত অবহিত হয়েছেন। গদ্যের চেয়ে ছন্দেই তাঁর হাত ভালো। কিন্তু এ-ধরনের কবিতা সরলভাষায় কী-উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন ?—

মাঝে-মাঝে মাঝরাতে নিশার প্রহরে
নিদ্রাদেবী নির্যাতন করে।

... ...

ওদিকে যত যুবকেরা বধূ ছেড়ে বসে অন্য ঘরে
সুরা আর নারী লয়ে মাঝরাতে মাতামাতি করে,
হাত ধরে টান মেরে আচমকা কাছে টেনে আনে,
হেসে ওঠে হো-হো করে—চুমো খায় চাঁদমুখ পানে।

মণীন্দ্র রায় মোটের উপর রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাডিশনে লিখেছেন বলে এ-ধরনের অধঃপতন তাঁর কখনো হয় নি। যে-সব কবিতায় এঁরা দুজন খুব বেশি ব্যক্তিগত নন, সেগুলোই আমার ভালো লাগল, যেমন কিরণশংকরের "জাতিস্মর" এবং মণীন্দ্র রায়ের "মুক্তি"।

অনেক স্থবির রাত্রি, ক্লান্ত সন্ধ্যা তিক্ত দীর্ঘ দিন
আর বহু উষাকাল, মধ্যাহ্নের বন্ধ্যা দাবদাহ
স্পন্দিত জীবনে এসে স্নায়ু সবি করে গেছে ক্ষীণ,
হৃদয়ে এনেছে যত দয়া আর মৃত্যুর আগ্রহ।

(জাতিস্মর)

নয়নে নেমেছে আজ
বিষণ্ণ জ্যোৎস্নার যত তন্দ্রা কোলাহল,
কল্পনার স্নায়ু কাঁপে মনে।
সুদূর বিস্মৃতপারে নতুন পৃথিবী এক হয়েছে উতল
আমার বিহঙ্গস্মৃতি স্খলিত কূজনে
ভরে দেবে তার বনতল।

(মুক্তি)

বিভিন্ন প্রভাবের মধ্যে থেকেও শেষ পর্যন্ত স্বকীয় পথ খুঁজে নেবার সামর্থ্য এঁদের আছে, এবং ভবিষ্যতে তার পরিচয় আশা করি পাব।

'পটভূমি' নামটি জাঁকালো, কিন্তু ভিতরের কোনো কবিতাই উল্লেখযোগ্য নয়। কয়েকটি জিনিশের তালিকা দিলেই সমাজবোধের পরিচয় দেওয়া হয় না, এ সহজ সত্যটি শ্রী অনুপম গুপ্ত ভুলে গিয়েছেন। তাঁর এই ক্যাটালগ করবার অভ্যেসের জন্যেই রচনাগুলি রসোত্তীর্ণ হয় নি, নয়তো দু-একটি লেখা কবিতা পর্যায়ে এসে পৌঁছতে পারত। এই পুস্তিকাটিতে কখনো কখনো অনুভূতির সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু শব্দপ্রয়োগ শিথিল ও ছন্দ অন্যমনস্ক বলে সে-অনুভূতির প্রকাশ পঙ্গু। কবিতার শিল্পকলা আয়ত্ত করতে পারলে এই লেখকের প্রচেষ্টা হয়ত অসার্থক হবে না।

৪

Look, Srranger ! W. H. Auden
Ascent of F 6 . Christopher Isherwood & W. H. Auden
More Poems : A. E. Heusman

সমবোত্তর ইংবেজি কবিতায় ১৯২৮-২৯-ব পবে একটি পরিবর্তন এসেছে। মহাযুদ্ধ এবং এলিয়ট, অর্থনৈতিক সংকট এবং অডেন-প্রমুখ কবি—মোটামুটি এইভাবে অতি-আধুনিক ইংবেজি কবিতাকে দেখতে পাবি। এলিয়টেব হতাশায় আর কঠিন অবিশ্বাসে, তাঁর শবযাত্রাব গানে একপুরুষেব জীবনদর্শন সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে, আজ পযন্ত তিনি ইংবেজি সাহিত্যে আমাদের শতাব্দীব শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু এই জীবনদর্শন যে পুরুষানুক্রমে চলতে পাবে না, অডেন ইত্যাদির কবিতা তারই প্রমাণ এবং যে-পরিবর্তন আজকাল সাহিত্যে লক্ষিত হচ্ছে তার পিছনে বিশেষভাবে রযেছে অর্থনৈতিক সংকটেব সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

আধুনিক কবিতায় বিশ্বাসেব প্রশ্ন উঠলে এলিয়টেব শেষেব দিকেব পরিণতির কথা অনেকেই উল্লেখ করবেন। অধুনা তিনি ব্যক্তিগত পরিত্রাণে বিশ্বাস করেন বটে, কিন্তু 'ফাঁপা মানুষের' ভবিষ্যতে কোনো আস্থা তাঁব নেই। এইখানে এলিয়টের সঙ্গে অডেন-প্রমুখ কবিদেব মতান্তর সুস্পষ্ট। যুদ্ধেব পবে যে-ফাঁপা সম্প্রদাযেব ছবি এলিয়ট এঁকেছিলেন, তার পর্যায়ে জনসাধাবণ পড়ে না, কারণ, ফাঁপা হওয়াটা surplus value-রই লক্ষণ এবং সেটা পাবাব সুযোগ অধিকাংশ লোকেবই ঘটে না। মানুষেব ভবিষ্যতে এলিয়টেব অবিশ্বাস এবং অডেনের কম্যুনিস্ট জীবনদর্শনে মূলগত পার্থক্য আছে। সেইজন্য Ascent of F 6-এর যেখানে যেখানে Sweeny Agonistes-এব ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আছে সেখানেও ইসারউডেব তীক্ষ্ণ সহানুভূতির পরিচয় পাই।

১৯২৯-এর অর্থনৈতিক সংকট জীবনে ও সাহিত্যে যে-আলোড়ন এনেছে, Look, Stranger !-এ তা সুস্পষ্ট। অবিশ্বাসের নিশ্চিন্ত খোলসে চিরদিন বসবাস করা যায় না, বাইবেব পৃথিবী বিপুল ও প্রবল। সামাজিক জীবনে সংঘাতের, অনাচাবের বিশিষ্ট উপলব্ধি অডেনের লেখায় আছে এবং ইংরেজি সাহিত্যে এই বেদনাবোধ ও সহানুভূতির প্রয়োজন ছিল। আমাদের অনেককেই Waste Land-এর ট্র্যাজিক গভীরতা বিশেষভাবে আলোড়িত করে, কিন্তু সাধারণ জীবনে শ্রেণী-সংঘাত, অর্থনৈতিক বৈষম্য, প্রাচুর্যের মধ্যে দৈন্য, ইত্যাদি ট্র্যাজেডি চোখে পড়ে না।

Concealing from their wretchedness
Our metaphysical distress,

কবিতায় metaphysical distress-টাই আমাদের মুগ্ধ করে, তার বাইরে যাওয়াটা রহস্যজনক বলে মনে হয়। Look, Stranger !-এ এর ব্যতিক্রম দেখি।

আধুনিক কোনো কবিকে ভালো-লাগা, না-লাগা শেষ পর্যন্ত নির্ভব করে পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির উপরে। অডেনের জীবনদর্শনে আস্থা যাঁদের নেই তাঁদের কাছে Look, Stranger !-এব কয়েকটি কবিতা (যেমন Brothers, who when the sirens roar) খেলো বলে হয়ত ঠেকবে, সমরোত্তর হাইব্রাউ অবিশ্বাসে অভ্যস্ত অনেকের কাছেই অডেনেব বেদনাবোধ এবং ঋজু আর স্পষ্ট সুর ভালো লাগবে না, কারণ মানুষে বিশ্বাস না-কবাটাই ছিল বিগত যুগের ধর্ম ও ফ্যাশন।

Look, Stranger !-এর বহু কবিতাই তত্ত্বমুখী, আর অডেনের তও নিয়েই যত বাদ-প্রতিবাদ। এছাড়াও অবশ্য অনেক লেখা এ-বইতে আছে যার মধ্যে সাংসারিক সচেতনতা থাকলেও তত্ত্বের ভাগটা কম, যেমন Casino-শীর্ষক কবিতাটি। আর খুঁজলে দু-একখানি বিশুদ্ধ কবিতাও উপরোক্ত বইতে পাওয়া যাবে। উদাহরণ-স্বরূপ নাম-কবিতাটির উল্লেখ করতে পারি—

Look, stranger, at this island now
The leaping light for your delight discovers,
Stand still here.
And silent be,
That through the channels of the ear
May wander like a river
The swaying sound of the sea. ইত্যাদি।

Ascent of F6 অডেন ও ইসারউডের দ্বিতীয় নাটক। বর্তমান সভ্যতার আবহাওয়ায় সামাজিক কিংবা ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতা অসম্ভব। Dog Beneath the Skin-এ এই সমস্যার সামাজিক দিকটার উপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল, ফলে ঘটনার সংঘাতে চরিত্রেব বিকাশ উপরোক্ত নাটকে ঘটে নি। Ascent of F6-এর লেখকদ্বয় প্রধানত ব্যক্তিগত দিকটাই দেখিয়েছেন এবং তার ফলে চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। বাইরের সংঘাতটা এখানে পটভূমিকা মাত্র। Ransom-এর ইতিহাসই Ascent of F6-এর আসল কথা। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নাটকে আরো একটি ধারা চলেছে যেটা বর্তমান সভ্যতার অর্থহীনতা বরাবর আমাদের চোখের সামনে রাখে। Mr. ও Mrs. A-এর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে নাটকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

আছে। এঁরা হচ্ছেন পেটিবুর্জোয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং এঁদের কথোপকথনে, এঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বণিক-সভ্যতার ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে—

A slick and unctuous time
Has sold us another shop-soiled day
... ...
Give us something to live for, we have, waited too long.

T.E. Lawrenee-এর সঙ্গে Ransom-এর সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। F6 আরোহণের ভালোমন্দ এবং ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে র‍্যানসম সচেতন ছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির অস্ত্র হবার আগ্রহ তাঁর ছিল না : র‍্যানসমের এই সচেতনা শেষ তাঁকে হানা দেয়, মৃত্যুকালীন মানসিক বিকারেও এর থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন নি— It was not virtue or knowledge, it was power। কিন্তু ঘটনার চক্রে মায়ের প্ররোচনায় F6 আরোহণের ভার তাঁকে নিতে হয়। মাতাপুত্র দৃশ্যটি স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু দুর্বল ও হাস্যজনক, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এই ব্যাপারটি হয়ত নিখুঁত, কিন্তু নাটকের মেরুদণ্ড হিশাবে অল্পবিস্তর তুচ্ছ। F6 আরোহণের অধিকাংশ দৃশ্যেই বলিষ্ঠতা ও শক্তির পরিচয় পাই। এইসব দৃশ্যের সাধারণ কথাবার্তায় অন্তরে গভীর একটি সুর বাজতে থাকে। র‍্যানসমের মৃত্যুকালীন দৃশ্যটি সাইকো-অ্যানালিসিসের আধুনিকতম একটি থিসিস হলেও বিসদৃশ হয় নি। এর শেষের দিকের কোরাসগুলিতে Paid of both sides-এর প্রতিধ্বনি আছে।

র‍্যানসমের মৃত্যুর ফলাফল কী যে হবে তার পরিচয় শেষ দৃশ্যে পাই, যখন নোয়েল কাওয়ার্ডের পৃথিবীতে আবার ফিরে আসি। Ascent of F6 পড়ার পরে স্বভাবতই Dog Beneath the Skin-এর কথা মনে হয়। আঙ্গিকের এবং গভীরতার দিক দিয়ে প্রথমোক্ত নাটকটি যে শ্রেষ্ঠতর সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। Dog Beneath the Skin-এর গল্পাংশ কয়েকদিনের মধ্যেই মন থেকে মুছে যায়। কিন্তু এর কোরাসগুলিতে অডেন ও ইসারউডের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, সহজ ভাষা ও স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গি অনেকদিন মনে থাকে।

More Poems হাউসম্যানের তৃতীয় কবিতার বই। এর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখার প্রয়োজন নেই, কারণ এর অধিকাংশ কবিতাই যে সাধারণ, তা লেখকও বোধ হয় জানতেন। বইটির পাতায় পাতায় হাউসম্যান-সুলভ বিষণ্ণতা আছে; কিন্তু পাতাকয়েক পড়ে যাওয়ার পরে এই সুর একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর ঠেকে। মনে হয়, হাউসম্যানের দুঃখবাদে কোনো বিশিষ্টতা নেই, তা নেহাৎই ভাসা-ভাসা এবং ব্যক্তিগত। কয়েকটি কবিতায় লেখক আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট

কোনো ছবি আনতে পেরেছেন সেইজন্য ভালো লাগে। হাউসম্যানের ব্যক্তিগত বিষণ্ণতার সঙ্গে তুলনা করুন—

Only a flicker
Over the strained time-ridden faces
Distracted from distraction by distraction

এখানে অল্পকয়েকটি কথার মধ্যে বিংশশতাব্দীর ছন্দ আছে। More poems আমার ভালো না-লাগার কারণ এই যে, হাউসম্যানের দুঃখবাদ অত্যন্ত রোমান্টিক; তিনি তাঁর বেদনাবোধকে কোনো বিশিষ্ট সংহত রূপ দিতে পারেন নি।

The Collected Poems of Hart Crane
The Still Centre : Stephen Spender

১৯৩২-এব ২৭শে এপ্রিল হাভানা থেকে প্রায় ৩০০ মাইল উত্তরে হার্ট ক্রেন একটি জাহাজ থেকে সমুদ্রেব জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা কবেন। রোমান্টিক আত্মহত্যা বোধহয় আমেরিকায় তাঁর প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ। অনেক বিখ্যাত সমালোচক তাঁর কাব্যশক্তির উচ্চ প্রশংসা করেছেন এবং করেন, কিন্তু সে-শক্তিব নিদর্শন এ-কাব্যসংগ্রহে অনুপস্থিত। ভূমিকায় ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্ক 'The Bridge' শীর্ষক কবিতাটিকে এলিয়টের Waste Land-এর সমকক্ষ বলে ঘোষণা করেছেন। সেতুর রূপকের সাহায্যে হার্ট ক্রেন নাকি একটি অতিকথা নির্মাণের চেষ্টা কবেছিলেন; কিন্তু এই অনাবশ্যক দীর্ঘ (৫৪ পৃষ্ঠা) কবিতার পাতায় পাতায় অপ্রয়োজনীয় শব্দ ও চিত্রের ভারে সে-প্রয়াস বাববার চাপা পড়েছে, ছত্রে ছত্রে সংযমের চেয়ে উচ্ছৃঙ্খলতাই পাঠকের চোখে বেশি পড়ে। অসংযমের জন্য সম্ভবত দায়ী ১৯২০-২৮-এর আমেরিকান স্বচ্ছলতা এবং কবিব অতিবিক্ত পানদোষ। অন্যান্য অনেক কবিতার মধ্যে For the Marriage of Faustus and Helen সবচেয়ে উল্লেখযোগ, হার্ট ক্রেনের বৈশিষ্ট্য এতে প্রত্যক্ষ।

Carped arbiter of beauty in this street
That narrows darkly into motor dawn—
You, here beside me, delicate ambassador
Of intricate slain members that arise
In whispers, naked of street;
Religious gunman!

Who faithfully, yourself, will fall too soon,
And in other ways than as the wind settles
On the sixteen thrifty bridges of the city ;
Let us unbind our throats of fear and pity.

'দি ষ্টিল সেণ্টার' স্পেণ্ডরের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। স্পেণ্ডর তাঁর কবিতাগুলিকে চার-অংশে ভাগ করেছেন ; প্রথম-অংশেরগুলি মোটামুটি বর্ণনামূলক, কয়েকটির শেষে ভবিষ্যদ্‌বিশ্বাসী উচ্ছ্বাস আছে। ইতিহাসের কুটিল গতি, চারদিকে কর্কশ পাহাড় ইত্যাদি ; কিন্তু পরে কবি আশা করেন যে সূর্যোদয়গোছের কিছু-একটা আসবে, যন্ত্রণার শেষ হবে। দ্বিতীয়-অংশের কবিতাগুলি আমার অনেক ভালো লাগল, এর কয়েকটির ভাষায় ইয়েট্‌সের প্রভাব প্রত্যক্ষ, যেমন :

In the sunset above these towns
Often I watch you lean upon the clouds
Momently drawn back like a curtain
Revealing a serene, waiting eye
Above a tragic, ignorant age.

স্পেনসংক্রান্ত কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য, কারণ এরা স্পেণ্ডরের চরিত্র বুঝতে সাহায্য করে। তাঁর কবিতা পড়লে এ-ধারণা হয় যে কোনো শান্তিবাদী আচমকা খেয়ালে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পড়েছেন, সেখানে তাঁর প্রতিক্রিয়াটি স্যালভেশন আর্মি-সুলভ। স্পেণ্ডর আসলে লিবেরল ক্রিশ্চান :

My love and pity shall not cease
For a lifetime at least.

এ-সব কবিতায় তিনি বীররসের বক্তা স্বেচ্ছায় হন নি, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বীররসের স্থান নেই, তাঁর মতে ভবিষ্যতে কোনো কবি হয়ত সহজভাবে বর্তমানের heroics সম্বন্ধে লিখতে পারবেন, এখন লিখলে সেটা, 'utilitarian heroics' হবে। এ-বিষয়ে জিজ্ঞাস্য মালরোর 'ডেস্‌ অব্‌ হোপ্‌' কিম্বা অডেনের স্পেন কি শুধু utilitarian heroics ?

স্পেন গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর স্পেণ্ডরের উৎসাহ পড়ে এসেছে, কারণ তিনি বাবরার বিপ্লবীর চেয়ে বিলাসী বেশি ছিলেন। ব্যক্তিগত সমাধানের সন্ধানে তিনি এখন ব্যস্ত ; তাঁর মধ্যে যে একটা-কিছু দুর্বলতা আছে সেটার আবিষ্কার যদি তিনি করে থাকেন, তাহলে তাঁর আত্মজ্ঞান আশা করি ভবিষ্যতে পাঠক ও লেখক উভয়ের পক্ষেই শুভ হবে। আপাতত তাঁকে আমরা তাঁর প্রেমস্বর্গে অবিচলিত অবস্থায় রেখে বিদায় গ্রহণ করতে পারি :

Shuttered by dark at the still centre
Of the word's circular terror,
O tender birth of life and mirror
Of lips, where love at last finds peace
Released from the will's error.

The Complete Works of Isaac Rosenberg

মহাযুদ্ধের অনতিপূর্বে অনেক লেখকের দেশভক্তির তীব্রতা আজকাল আমাদের বিস্মিত করে। সভ্য সমাজের গতানুগতিক জীবনযাত্রায় অনেকেই বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মহাযুদ্ধের প্রখর সমারোহ জর্জিয়ানদের মন্থর জীবনে উত্তেজনার যথেষ্ট খোরাক জোটাল, কয়েকজন তো যুদ্ধকে অভ্যর্থনা করলেন—যথা, রুপার্ট ব্রুক। বর্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার অভিযান ইত্যাদি আদর্শের অভাব তখন তাঁদের যে হয় নি সেটা বলা বাহুল্য। এটা তাঁদের অজ্ঞাত ছিল যে এই সভ্য-অভিযানের পিছনে আছে সাম্রাজ্যবাদের বৈশ্য কূটনীতি, এবং এর পরিণাম সভ্যতার জীবনপ্রাপ্তি নয়, সুদীর্ঘ মড়ক। দৈনিক পত্রিকা-সুলভ মতবাদে শেষ পর্যন্ত আস্থা রেখে যে-সব সাহিত্যিক দেশভক্তির জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁদের আত্মবিসর্জনে মহত্ত্ব আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাতে বিকারের মাত্রাটাই ছিল বেশি। ধরুন রুপার্ট ব্রুক। তিনি তো মৃত্যু পর্যন্ত মহাযুদ্ধের শূন্যগর্ভ আদর্শবাদের কবি ছিলেন। তিনি এবং অন্য-কয়েকজন লেখক সে-সময় ভালো কবিতা লিখে গিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু দেশভক্তির মতো, তথাকথিত 'ভালো' কবিতাও যথেষ্ট নয়। সমর-কবিদের কয়েকজনের অন্তত ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি অল্পবিস্তর ছিল, যুদ্ধের বিপুল অসারতা প্রথম থেকেই তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। উইলফ্রেড ওয়েনের লেখা সেইজন্যই শুধু 'ভালো' কবিতার সংকীর্ণ গণ্ডির উর্ধ্বে উঠেছিল; তাঁর ব্যর্থতাবোধ, তাঁর যুদ্ধের দৈনন্দিন যন্ত্রণার বর্ণনায় বিপুলতর ট্র্যাজিডির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। যুদ্ধকে হাততালি দিয়ে তিনি যুদ্ধে নামেন নি। 'হাততালি' বলতে আমি 'Blow out, you bugles, over the rich Dead !'—ধরনের কবিতা বুঝি।

রোজেনবার্গ জাতিতে য়িহুদি, তাঁর কবিতায় দেশভক্তির বালাই সে-জন্য অনুপস্থিত। রোজেনবার্গের চিঠিপত্র পড়লে এ-সন্দেহ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় যে যুদ্ধের অসুবিধা তাঁকে বিরক্ত করেছিল, যুদ্ধের ট্র্যাজিডি তাকে পীড়িত করে নি। চিঠিপত্র থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আকৃষ্ট করে নি। স্বলিখিত কবিতা অ্যাবারক্রোমবি, বিনিয়ন ইত্যাদিকে

পাঠাবার, তাঁদের মতামত জানার অবিরাম আগ্রহ, মধ্যমশ্রেণীর কবিতার প্রতি প্রবল অনুরাগ, যুদ্ধের বহু অসুবিধার উল্লেখ—মোটামুটি এইসব বিষয়ে এবং অবিষয়ে তাঁর পত্রগুচ্ছ পরিপূর্ণ। তিনি বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, স্বরচিত কবিতা বিভিন্ন ব্যক্তিকে পাঠাবার কারণ তাঁর সাহিত্যানুরাগ। প্রলয়ের সময় সাহিত্যের রক্ষণাবেক্ষণ ভালো জিনিশ সন্দেহ নেই, কিন্তু লেবু বেশি কচলালে তেতো লাগে।

কিন্তু রোজেনবার্গের যুদ্ধকবিতা পড়লে চিঠিপত্রের স্মৃতি থাকে না, তখন তার নিত্যনৈমিত্তিক যন্ত্রণার বর্ণনায় যুদ্ধের ভয়াবহতার সাক্ষাৎ মেলে, এবং যুদ্ধ যে ক্রুসেড নয়, মড়ক, এ-কথাটাই বারেবারে মনে পড়ে। রোজেনবার্গের তৎকালীন কবিতার রং চিঠিপত্রের রং থেকে আলাদা। এর কারণ খোঁজার জন্য বেশিদূর যেতে হয় না। আর্থিক অনটন সত্ত্বেও রোজেনবার্গ স্বভাবতই নিজের তালে থাকতে ভালবাসতেন, বাইরের পৃথিবীর ছোঁয়াচে বিশেষভাবে আসাটা তিনি অপছন্দ করতেন, অপরাপর বহু প্রাক্-সামরিক জর্জিয়ান কবির মতো আত্মকেন্দ্রেই ছিল তাঁর সমস্ত আনন্দ। চিঠিপত্র, এবং এমনকী ১৯১৪-১৫ পর্যন্ত রচিত তাঁর কবিতা এই দিকটার পরিচয় দেয়। কিন্তু মহাযুদ্ধের সংস্পর্শে এসেও উদাসীন থাকাটা মানুষের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কবিতা যখন অনেকটা অনুভূতির জিনিশ, এবং ১৯১৪-১৮-এর অনুভূতি যখন তীব্র হতে বাধ্য, তখন রোজেনবার্গের তৎকালীন কবিতায় মহাযুদ্ধ যে আমাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে তাতে বিস্মিত হবার কোনো কারণ নেই। ওয়েনের অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ছিল না, কিন্তু দেশভক্তি আর সমর-কালীন আদর্শবাদের বিকার থেকে তিনি মুক্ত। তাঁর যুদ্ধ-কবিতা রোমান্টিক নয়, রুপার্ট ব্রুকের মতো আদর্শবাদের ক্লিষ্ট করুণ উজ্জ্বলতায় তাঁর লেখার সমাপ্তি হয় নি, এই মর্ত্যলোকে চারবৎসরব্যাপী প্রেতলোকের বিকৃত ইঙ্গিত রোজেনবার্গকে শেষ পর্যন্ত হানা দেয়। তখনকার অভিজ্ঞতাকে তিনি বিশিষ্টভাবে বলিষ্ঠ রূপ দিয়েছেন।

যুদ্ধের পূর্বে লিখিত রোজেনবার্গের অধিকাংশ কবিতা কাঁচা হলেও দু-এক হিশেবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমদিকের জর্জীয় কবিতার অনেক গুণ তাতে বর্তমান, এবং রোজেনবার্গের বিশিষ্ট ক্ষমতা মাঝে-মাঝে পাঠকের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু এ-ধরনের কবিতার প্রতি স্থায়ী অনুরাগের পক্ষে তীব্র অন্তরায় আছে। যুদ্ধের অনতিপূর্বে রচিত কবিতার জলবায়ু আমাদের কাছে অত্যন্ত পাতলা লাগে, কারণ ১৯১৪-১৮-এর বিষাক্ত গ্যাস সে-জলবায়ুকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করেছে। তৎকালীন ভালো কবিতা লেখার একান্ত উদ্যমকে প্রলয়ের ঠিক পূর্বে একটি গোলাপ ফোটানোর প্রচেষ্টা বলে মনে হতে পারে। রোজেনবার্গের কাব্যসংগ্রহ না করে তাঁর কাব্য সংকলন করলেই কবির প্রতি সুবিচার করা হতো।

ইয়েট্স সম্প্রতি যুদ্ধকবিতার প্রতি তাঁর বিরাগ প্রকাশ করেছেন। যে-পৃথিবীতে যুদ্ধ আবার আসন্ন, সেখানে যুদ্ধকবিতার মহৎ প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা অসম্ভব। সে-সময়কার মানসিক যন্ত্রণা এবং বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা যদি বর্তমান মানুষকে যুদ্ধের দুর্যোগের পূর্বে জতুগৃহে খনকের মত উদ্যোগী করতে পারে তাহলে সেটাই হবে গত যুদ্ধকবিতার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা, 'Passive suffering'-এর ঐতিহাসিক মূল্য আর মহত্ত্ব। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে অভ্যর্থনা করার মনোবৃত্তি আশা ক'র তখন অধিকাংশ মানুষের হবে না।

Last Poems and Plays W. B. Yeats

ফরাসি-বিপ্লবের কিছুদিন আগে থেকে জনগণ সম্বন্ধে বুর্জোয়া কবিমনে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আজ পর্যন্ত চলেছে তাঁর বেশ ইয়েটসের সমগ্র কাব্যে বর্তমান। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসী, এবং এ-বিশ্বাসের ফলে ইউরোপীয় অনেক কবির জীবনে এবং কাব্যে যে বিয়োগান্ত নাটকের পালা এখনো চলেছে, ইয়েটস বোধহয় ইংরেজি কবিতায় তার শ্রেষ্ঠ প্রতীক। স্বাতন্ত্র্যে তাঁর একাগ্র বিশ্বাস, অনাবশ্যক ভাবালুতার হতে থেকে তাঁর কাব্যের মুক্তি এবং বৃদ্ধবয়সে বিস্ময়কর পরিণতি, এ সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি নিজের জন্য যে দুর্গ গড়ে ছিলেন তাকে গজদন্তমিনার বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না, কারণ শেষ পর্যন্ত তিনি যুগবিক্ষোভ সম্বন্ধে স্বকীয়ভাবে সচেতন ছিলেন, এবং বিচ্ছিন্ন, কেন্দ্রচ্যুত সমাজের প্রতিমাপে যে-আভিজাত্যের জয়গান করেছিলেন সেটা মূলত বোধহয় মননের আভিজাত্য। এ-কথা বোধহয় বলা চলে যে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে একটি যুগের শেষ হলো।

এ-বইয়ের বিষয়বস্তু নতুন নয়। ইয়েটস-পাঠকেরা অধিকাংশ কবিতারই জগতের সঙ্গে সুপরিচিত আছেন। তবে শুদ্ধমাত্র প্রকাশভঙ্গির উপর কবিতার আবেদন কতখানি নির্ভর করে এবং কী-পরিমাণে প্রকাশভঙ্গি পুরাতন বিষয়কে নতুন করে তার পরিচয় এ-বইয়ের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। 'Purgatory' নাটিকাটির বক্তব্য ইয়েটস 'Words upon the Window Pane'—এ সুইফ্‌টের জীবনের একটি অধ্যায়ের সাহায্যে পূর্বেই বলেছেন। অথচ সে-বক্তব্যের আবেদন প্রথমোক্ত নাটকে কিছুমাত্র কমে নি। সমাজগতি গতশতাব্দীর কবিমনকে বহুমূল গ্লানির মুখোমুখি করে যে-সমস্যায় ফেলেছে তার সমাধানের প্রয়াস ইয়েট্স করেছেন। তাঁর সমাধান বর্তমান মানুষের প্রিয় নয়, কিন্তু বিকৃতি কত গভীরভাবে আধুনিক জগতে প্রসারিত, এবং আত্মম্ভরী উপায়ে এ-বিকৃতি থেকে মুক্তি যে সম্ভবপর নয় সে-উপলব্ধি রূপকের সাহায্যে ইয়েট্স মাঝে-মাঝে করেছেন। তাই পুত্রহত্যার পর 'Purgatory'-তে বৃদ্ধ লোকটি প্রথমে বলে—

Study that tree,
It stands there like a purified soul,
All cold, sweet, glistening light.
Dear mother, the window is dark again,
But you are in the light because
I finished all that consequence.
I killed that lad because he had grown up,
He would have struck a woman's fancy,
Begot, and passed pollution on.

কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝতে পারে : Twice a murder and all for nothing, এবং প্রার্থনা করে :—

O God,
Release my mother's soul from its dream !
Mankind can do no more. Appease
The misery of the living and the remorse of the dead.

আধুনিক কবিতায় হত্যা, বিকৃতি ও বিশুদ্ধির কথা যে বারেবারে ওঠে, এবং এ-সমস্ত কথা যে ইংলণ্ডের কয়েকজন প্রধান কবির মূল বক্তব্য, এ-তথ্যটি নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য, এর মূলে নিশ্চয়ই গভীরতর কোনো কারণ আছে। এ-দিক থেকে এলিয়টের কাব্য এবং নাটক এবং ইয়েট্স-এর শেষদিকের লেখার মধ্যে একটি ঐক্য মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে।

ইয়েট্স কবিতায় অলংকার ব্যবহারের সারমর্ম বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলে যে স্বচ্ছ, কঠিন এবং অনাড়ম্বর ভাষায় তিনি লিখে গিয়েছেন তার তুলনা ইংরেজি কবিতায় দুর্লভ। গতশতাব্দীর কয়েকটি সদর্থক বিশ্বাস, জাতীয় জীবনের কয়েকটি অধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, এবং বিচিত্র জীবনযাত্রায় আসক্তি, এ-সবের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গি গড়ে উঠেছে। বিশেষণ পরিহার করা কবিতায় অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু ইয়েট্স-এর কয়েকটি কবিতায় বিশেষণ-প্রয়োগ নামমাত্র। যেমন :

Picture and book remain,
An acre of green grass
For air and exercise,
Now strength of body goes ;
Midnight, an old house
Where nothing stirs but a mouse.

Grant me an old man's frenzy,
Myself must I remake
Till I am Timon and Lear
Or that William Blake
Who beat upon the wall
Till Truth do eyed his call ;

ব্যক্তিগত জীবনে অতিরিক্ত আস্থা যে মাঝে-মাঝে ইয়েট্স-এরও কবিতায় হাস্যকর হয়ে পড়ে তার প্রমাণ হিশেবে একটি কবিতা উদ্ধৃত করে এ-সমালোচনা শেষ করা যায় :

Politics

'In our time the destiny of man presents its meaning in political terms.'—Thomas Mann.

How can I, that girl standing there,
My attention fix
On Roman or on Russian
Or on Spanish politics ?
Yet here's a travelled man that knows
What he talks about,
And there's a politican
That has read and thought,
And may be what they say is true
Of war and war's alarms,
But O that I were young again
And held her in my arms !

৫

On the Frontier : W. H. Auden and Christopher Isherwood
The Trial of a Judge, A Tragic Statement : Stephen Spender

অডেন এবং ইসারউডের এ পর্যন্ত তিনটি নাটক প্রকাশিত হলো। তিনটির কথা মনে রাখলে মোটামুটি কয়েকটি সিদ্ধান্তে আমবা আসতে পারি, এবং সেগুলো স্পেণ্ডরের নাটকটি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এঁরা যখন কোনো বুর্জোয়া চরিত্র নিয়ে লেখেন তখনি সত্যিকার শক্তিমত্তার পবিচয় দেন, তখন এঁদের নাটকীয় দখল সম্বন্ধে গুরুতর কোনো সন্দেহ আসে না, মনে হয় শক্ত মাটির উপরেই এঁরা আছেন। কিন্তু যখনি কোনো সাম্যবাদীব জীবন, ভবিষ্যৎ, আশা ইত্যাদি এঁরা লিপিবদ্ধ করেন তখনি প্রচাব-সাহিত্যেব বিরুদ্ধে যে কয়েকটি সত্যিকার অভিযোগ আনা চলে তাদের সম্মুখীন হন। ইচ্ছাপূরণেব অনাবশ্যক চেষ্টা, মেরুদণ্ডহীন আদর্শবাদ (বিশেষভাবে স্পেণ্ডরের) ইত্যাদি দোষ তখনই প্রকট হয়ে ওঠে। স্থানবিশেষে মানসিক অশান্তির বর্ণনায় এঁরা সিদ্ধহস্ত কিন্তু যাকে জিদ্ Literature of Struggle নামে অভিহিত করেছেন তাতে এঁদের পারদর্শিতা নামমাত্র। মাল্‌রোর দুটি বিখ্যাত উপন্যাসের সঙ্গে এঁদের লেখার তুলনা করলে কথাটা সহজবোধ্য হয়। মাল্‌রোর অসাধারণ শক্তি ইচ্ছাপূবণের সস্তা চেষ্টায় উত্তেজিত নয়, ভবিষ্যতের নতুন পৃথিবীতে সমস্ত গোলমালেব অবসান হবে এ-সব কথা জোর গলায় ভালো ভাষায় প্রচাব না-কবলেও তাঁর পুস্তকপাঠ পাঠকের মনে নৈরাশ্যেব সৃষ্টি করে না। কিন্তু On the Frontier কিম্বা Trial of a Judge-এর ভবিষ্যদ্‌ব্যঞ্জক কবিতা পড়লে সে-ধরনের পৌরুষেব সাক্ষাৎ মেলে না। বোধ হয়, ইংলণ্ডের এতদিনকার সফল সাম্রাজ্যবাদ তাব কাবণ। Ascent of F6-এর পেটিবুর্জোয়ার প্রতিনিধি Mr. & Mrs. A সাহিত্য হিশেবে On the Frontier-এর Eric এবং Anna-র চেয়ে ভালোভাবে উৎরেছে। এরিক্ ও আনাকে রোমিও-জুলিয়েটের আধুনিক সংস্করণ বলে ঠেকে। শেষদৃশ্যে মৃত্যুর পর তাদের আবির্ভাব এবং কথোপকথন মধুর হলেও নিষ্ফল সান্ত্বনালাভের চেষ্টামাত্র। কোনো মহৎ নাটক এ-সান্ত্বনালাভের প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না।

তাছাড়া অডেন ও ইসারউডের নাটকীয় কায়দা সম্বন্ধে দু-এক জায়গায় আপত্তি করা চলে। কয়েকটি দৃশ্যে দু-দেশের দুটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন পরিবারের জীবনী একসঙ্গে অথচ বিচ্ছিন্নভাবেই দেখানো হয়েছে। তার মাঝে হঠাৎ এদেশের এরিক্ অন্য-

দেশের আনাকে দেখতে পাবার ভঙ্গি যখন করে তখন সেটা বিসদৃশ ঠেকে। একটি convention-এর সুযোগ একভাবেই নেওয়া উচিত। সিনেমার পন্থার সঙ্গে টেলিপ্যাথি, টেলিভিজন সব কটাই একত্রে মেশানো শক্তিমান নাট্যকারের পক্ষে অন্যায়। এ-নাটকে লিডার এবং ভ্যালেরিয়ানের চরিত্রসৃষ্টি কয়েক হিশেবে উল্লেখযোগ্য।

স্পেণ্ডরের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে আমার বরাবর সন্দেহ আছে। Trial of a Judge-এর অধিকাংশ স্থান তাঁর অতিরিক্ত কাব্যপনার চেষ্টা দুষ্ট করেছে। কোনো-একটি ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তখনকার প্রয়োজনীয় গণ্ডি মনে রাখার অবশ্যকর্তব্যটা ভুলে গিয়ে সমস্ত বিশ্বসংসারের চিন্তা করতে শুরু করেন, এবং সানন্দে ভবিষ্যতের দিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। তিনি আসলে শেলীর মতো স্বপ্নবিলাসী, বিপ্লবী-সাহিত্যের পৌরুষ তাঁর মেরুদণ্ডে নেই। The poetry is in the pity—এটা বোধহয় তাঁর মূলমন্ত্র, কিন্তু তিনি কখনো এ-মন্ত্রকে ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন কিনা সেটা বিচার্য। ভাষার ব্যবহারে স্পেণ্ডর সতর্ক নন; খুঁটিনাটি, সঠিক স্থানোপযোগী শব্দের প্রয়োগে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আসে অধিকাংশ সময়েই তিনি তার ধার ধারেন না, ভাসা-ভাসা মোটামুটি প্রকাশের দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি। এ-বিষয়ে স্পেণ্ডর স্যুইনবর্ণপন্থী। উপমার সাহায্যে বর্ণনার ঝোঁকটা তাঁর মুদ্রাদোষ।

নাটকটি সাজাতে স্পেণ্ডর মাঝে-মাঝে যে-কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। নাৎসি জার্মানির নূতন আদর্শের পটভূমিকায় তিনি সভ্যতার সংকটের চিত্র এঁকেছেন। ইউরোপ যে উদ্যত ধ্বংসের আজ সম্মুখীন, তা শুধু অর্থনৈতিক নয়, নৈতিক। এই মানসিক ধ্বংসের বীজ রোপিত হয়েছিল গত মহাযুদ্ধের সময়। সে সময়কার নিষ্ঠুরতা আজ ফ্যাসিস্টদের মজ্জাগত, এবং যে লিবেরল আদর্শ মহা-যুদ্ধের পরেও টিঁকে ছিল আজ তার নাভিশ্বাস উপস্থিত। নাৎসি সভ্যতায় সত্যা-সত্যের দাম নেই, এতদিন ধরে যে-আদর্শ কাজে না-চালালেও লোকে মুখে মানত, গলিত ধনতন্ত্রের শেষ পৃষ্ঠপোষকেরা তার পরোয়া করেন না। বিচারকের চরিত্রে স্পেণ্ডর খুব সম্ভব নিজের মতোই একটি বুর্জোয়া লিবেরলের সমস্যা বর্ণনা করেছেন, এবং প্রমাণ করেছেন যে সমস্যাটি আজ ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বজনীন। যুদ্ধ ও মনস্তত্ত্বের উপরে গ্লোভারের বিখ্যাত বইটির সাহায্য স্পেণ্ডর সচেতনভাবেই নিয়েছেন। নাটকের চেয়ে Trial of a Judge কবিতা বলেই বেশি মনে হয়, এবং সেটা কাব্যনাট্যের বেলায় খুব সম্ভব দূষণীয়। কয়েকটি দৃশ্যে স্পেণ্ডর সত্যিকার শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, এবং সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনে যদি তাঁর প্রকাশভঙ্গিতে এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে উপযুক্ত সংহতি আসে তাহলে ভবিষ্যতে হয়ত তিনি

সর্বাঙ্গসুন্দর কাব্যনাট্য রচনা করতে পারবেন। এ-নাটকটিকে tragic statement বলা চলে না, যদি স্টেটমেণ্ট বলতে কলিংউড যা বলেছেন তাই বুঝি।

Family Re-union · T. S. Eliot

এলিয়টের কাব্য এবং নাটককে অনেকে একটি কবিতা বলে ধরেন; প্রথম থেকেই তাঁর রচনায় একটি একাগ্র অনুসন্ধিৎসা আছে; প্রুফ্রককে যে-সুর বেজেছে তাব সঙ্গে সংযোগ পরবর্তী প্রত্যেক কবিতারই আছে। বহির্জগতের এবং ব্যক্তিগত ঘাত-প্রতিঘাতের পীডনে এলিয়ট সম্প্রতি কবির চেয়ে ধর্মযাজকের কথাই মাঝে-মাঝে আমাদের মনে করিয়ে দিতেন। তাছাডা প্রবহমান ঐতিহ্যের যে-আশ্রয় এলিয়ট ব্যবহার করতেন তাও দু-একবাব পাঠকেব কাছে কষ্টকৃত ঠেকেছে। এদিক থেকে তাঁব অতি-আধুনিক কাব্যনাট্য 'ফ্যামিলি রিইউনিয়নে' যে দক্ষতার পরিচয় এলিয়ট দিয়েছেন তা সত্যই চমকপ্রদ। তাঁর একাগ্র অনুসন্ধিৎসার শেষ এখনো হয় নি; এবং উপরোক্ত নাটকটি যে-সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছে তাতে আধুনিক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি যে পাদ্রির গম্ভীর ভূমিকার সমাপ্তি পাবেন সে আশঙ্কা করার কোনো কারণ নেই।

স্বাভাবিকতার দিক দিয়ে গ্রীক নাটকের কায়দায় রচিত নাটকগুলিব মধ্যে 'ফ্যামিলি রিইউনিয়ন' সহজেই উচ্চস্থান অধিকার করবে। আধুনিক ইংলণ্ডের একটি বনেদি ঘরে বহুদিন পর জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুনরাগমনে যে-পরিস্থিতির সূচনা করল তাব বর্ণনায় এলিয়ট ইসকিলাসের কথা বাববার আমাদের স্মরণে এনেছেন; এমনকী মহাজনের পন্থা অনুসরণ কবে তিনি জানলার উপরে ইউমেনিডিসকে বসিয়ে পাঠকদের হঠাৎ চমক লাগিয়েছেন; কোরাসগুলি উৎকণ্ঠায় 'আগামেম্‌ননেব' বৃদ্ধদের কোরাসগুলির সঙ্গে তুলনীয়; এবং যে চরম পরিত্রাণ 'অরিসটিয়ার' শেষ নাটককে মহিমান্বিত করেছে তাব অল্প আভাস এলিয়টের নাটকেও আছে। অবশ্য এলিয়টের পরিত্রাণের অনুসন্ধান মরুভূমিতে কৃচ্ছ্রসাধনব্রত মধ্যযুগেব ক্রিশ্চানদের ছবি চোখের সামনে আনে।

In and out, in an endless drift
Of shrieking forms in a ciicular desert
Weaving with contagion of putrescent embreces
On dissolving bone. In and out, the movement
Until the chain broke, and I was left
Under the single eye above the desert.

এই অন্তহীন পরিক্রমা থেকে মুক্তির উপায় :

> Where does one go from a world of insanity ?
> Somewhere on the other side of despair,
> To the worship in the desert, the thirst and deprivation,
> A stony sanctuary and a primitive alter,
> The heat of the sun and the icy vigil,
> A care over lives of humble people,
> The lesson of ignorance of incurable deseases,
> Such things are possible.

ভর্সের উপর অসামান্য দখল, এবং অন্যান্য উৎকর্ষ সত্ত্বেও 'ফ্যামিলি রিইউনিয়ান' অনেকটা শূন্যজীবী, এবং তার কারণ খুঁজতে বেশি দূব যেতে হয় না। এলিয়টের ঠিক পূর্ববর্তী নাটক বেকেটের ইতিহাস-ঘটনার সংঘাতে গড়ে উঠেছে ; সে-জন্য প্রচারক-সুলভ সংকীর্ণতা থাকা সত্ত্বেও 'মার্ডার ইন্ দি ক্যাথিড্রালের' গঠন আরো কঠিন এবং ঘন। কিন্তু 'ফ্যামিলি রিইউনিয়নে' নাটক-বহির্ভূত কোনো আবেগকে (obsession) এলিয়ট রূপ দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। আধুনিক মনস্তত্ত্বের সাহায্যে ও'নিল যে-সফলতা অর্জন করেছিলেন আদিম পাপের আধিদৈবিক বিষয় এলিয়টকে সে-সাহায্য করে নি। এলিয়টের এই নাটকে অনেকস্থানেই তার আশ্চর্য কাব্যশক্তি আমাদের বিস্ময় জাগায় ; কিন্তু নাটকীয় চরিত্র এবং গতি যখন নাট্যকারের দর্শনের মুখপাত্র তখন নাটকগঠনে দক্ষতাও একধরনের চালিয়াতি মনে হয়। Objective correlative-এর অভাব আবিষ্কার করে (Selected Essays, পৃঃ ১৪৫) এলিয়ট 'হ্যামলেট'কে আর্ট হিশেবে বিফল বলেছিলেন ; অতি-নাটকীয় obsession-এর জন্য 'ফ্যামিলি রিইউনিয়ন' 'হ্যামলেটে'র কথাই বারবার আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

The Well of the People : Bharati Sarabhai

ভারতীয় যখন ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা করেন তখন তার স্থান নির্ণয় করার মতো অপ্রীতিকর কাজ নেই। এ-রকম সাহিত্য আলোচনা করার সময় আমরা দোটানায় পড়ি ; মুক্তকণ্ঠ-প্রশংসার প্রবৃত্তি ও সাহস থাকে না। কোনো জায়গায় সত্যকার ক্ষমতার পরিচয় পেলে সে-সাফল্যের সঙ্গে যে-ভাষায় লেখা সে-ভাষার সমভাবাপন্ন অংশের তুলনার প্রবৃত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। যে-জিনিস মাতৃভাষায় দাঁড়িয়ে যেত, তুলনামূলক সমালোচনার ফলে তার সম্বন্ধে মোহ হয় না। মনে মনে বলি,

বন্যেরা বনে সুন্দর। শ্রীমতী সরাভাই গান্ধিবাদী, অথচ নাটকটি ইংরেজিতে লেখা। এ-ধরনের অসামঞ্জস্য ভারতীয় জীবনে ও সাহিত্যে যত কম হয় ততই ভালো। যে-মনোভাব বাঙালি উনবিংশশতাব্দীতে কাটিয়ে এসেছে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তার পুনরাবির্ভাব জাতীয় জীবনের পক্ষে শুভ নয়।

নাটকটি আঙ্গিকের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য নয়, এবং ভূমিকায় লেখিকা বলেছেন যে তিনি সাধারণ নাটক লেখার প্রয়াস করেন নি, তাঁর মনে 'People's theatre গোছের ধারণা ছিল। কোন people? প্রশ্নটা অবশ্যম্ভাবী, কারণ নাটকটি ইংরেজিতে লেখা।

অবশ্য বিদেশি ভাষার উপরে লেখিকার দখল আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং, অন্তত কয়েকটি জায়গায়, তিনি আধুনিক কোনো-কোনো ইংরেজ কবির ভাষা এবং ঢং আমাদের মনে করিয়ে দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্য আমাদের খোঁচা দেয়, সহজ স্বাভাবিকতার মহিমা থেকে নাটকটি বঞ্চিত। যে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণমহিলাকে লেখিকা যুগযুগান্তের অমর ভারতের প্রতীক হিশাবে দেখিয়েছেন তার মুমূর্ষার সময় চেতনের (একটি চরিত্র) চিন্তাধারা যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে, তা ইউরোপীয়র মুখে মানায়, তার সঙ্গে ভারতীয় অভিজ্ঞতার বিশেষ কোনো সংশ্রব নেই। চেতনের ব্যর্থতাবোধের বর্ণনা আরো বিচিত্র ঠেকে যখন মনে আনি যে সে চরকা ও পল্লীসংগঠনের ভক্ত।

যাই হোক, নবভারতের প্রাণশক্তি লেখিকা যে মাঝে-মাঝে আকস্মিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে পেরেছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। জনসাধারণের সঙ্গে নাড়ির যোগ সহজে আসে না, তবু নাড়ির সন্ধান প্রশংসনীয়।

৬

A Date with a Duchess : Arthur Calder-Marshall

আর্থার কলডর্-মার্শেল নব্য ইংরেজ লেখকদের অন্যতম। বামপন্থী সাহিত্যিক হিশেবে ভারতীয় অনেকেই তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত আছেন। কলডর্-মার্শেলের উপন্যাস 'পাই ইন দি স্কাই'-এ তাঁর ক্ষমতার পরিচয় লাভে যাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন তাঁদের 'এ ডেট্ উইথ এ ডাচেস্' হতাশ করবে না। এ-বইটি ছোটো গল্পের সমষ্টি। দু-তিনটি বড়ো গল্প ছাড়া অধিকাংশই মাঝারি এবং ছোটো। আয়তনের কথাটা উল্লেখ করতে হলো কারণ কয়েকটি গল্প মাত্র দু-তিনটি পাতায় সম্পূর্ণ। এত ছোটো গল্পে ভারসাম্য বজায় রাখাটা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। চরিত্র-অঙ্কনে, বিভিন্ন লোকের মনস্তত্ত্বে কলডর্-মার্শেলের অসামান্য দখল; সমাজের নানাশ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রায় ও স্বতন্ত্র ভাবভঙ্গিতে তাঁর মতো স্বচ্ছ অথচ তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি বিরল। অনেকদিন পরে একজন লেখকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হলো যিনি মর্বিডিটি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। কলডর্-মার্শেল মর্বিড নন বলেই তাঁর ভাষায় এত বৈচিত্র্য, বিষয় এত বিভিন্ন, কারণ স্বভাবের ছায়া ভাষা এবং বিষয়-নির্বাচনে পড়ে। স্থানকালপাত্রভেদে ভাষার স্বচ্ছন্দ পরিবর্তন, কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে একটি স্বচ্ছ ছবি চোখের সামনে আনা, ছোটো একটি কথোপকথনে একটি চরিত্র বর্ণনা, ইত্যাদি ক্ষমতা অধিকাংশ গল্পেই বর্তমান। 'এ ডেট্ উইথ এ ডাচেস্' পড়ার সময় contrast হিশেবে উপহাস-রসিক হাক্স্‌লি, কিংবা জয়েসের কথা মনে আসা অস্বাভাবিক নয়। কলডর্-মার্শেলের মতো স্বাস্থ্য তাঁদেরই থাকতে পারে মানুষের ভবিষ্যতে যাঁদের আস্থা আছে। উন্নাসিক অবিশ্বাস এবং তার শেষফলের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হাক্স্‌লি। লরেন্সের লেখায় অসাধারণ ক্ষমতার ছাপ আছে, কারণ সমসাময়িক সমাজযাত্রার উপর তীব্র বিতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও তিনি জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু যে-ধরনের মানুষকে তিনি বিশ্বাস করতেন তার অস্তিত্ব আকাশ-পাতালে নেই। শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে গঠিত পৃথিবীতে অতি-পুরাতন কোনো সমাজের আদর্শ খাড়া করাটা আপাতসুন্দর হলেও অবান্তর, এবং একধরনের মর্বিডিটিরই নামান্তর।

প্রথমে বলেছি কলডর্-মার্শেল বামপন্থী লেখক। কিন্তু মামুলি প্রচারকার্যের ভারে তিনি পীড়িত নন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সাধারণ মানুষ সামাজিক বৈষম্য ও অনাচারের কথা যে-ভাবে, যে-ভঙ্গিতে উপলব্ধি করে সেই ভাব ও ভঙ্গি তিনি

প্রকাশ করেছেন। এ-সূত্রে 'One of the Leaders' এবং 'The Smuggler's Wife' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকেরই ধারণা আছে যে উৎপীড়িত শ্রেণীকে নিয়ে সস্তা কান্নাকাটি করলেই তা বামপন্থী সাহিত্যের পর্যায়ে পড়তে বাধ্য। কলডর-মার্শেলের লেখা তাঁদের ভুল ভাঙাতে, এবং সাহায্য করতে পারে। এ-কথাটা সর্বদা মনে রাখা উচিত যে সস্তা, বাক্যবাগীশ সহানুভূতি পেটি-বুর্জোয়া মনোবৃত্তিরই প্রকাশক। ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নতুন যুগের সাহিত্যের ভিত্তি, এবং এর থেকে প্রসূত সামাজিক অন্তর্দৃষ্টি সাহিত্যেও অন্তর্দৃষ্টির সংযম আনে।

Joseph in Egypt : Thomas Mann

টমাস মানের অসমাপ্ত কাহিনীর এটি মধ্যাংশ। কূপ থেকে উদ্ধারের পর জোসেফের মিশর আগমন, পটিফারের গৃহে ক্রমোন্নতি, এবং পটিফারের স্ত্রীর অবৈধ কামনার ফলে জোসেফের কারাবাস, মোটামুটি এই তিনটি অংশে 'জোসেফ ইন ইজিপ্ট'-এর দুই খণ্ডকে ভাগ করা যায়। প্রাচীন মিশরের জীবনযাত্রার পদ্ধতি, পূজারীতি, কুসংস্কার ইত্যাদি মান জোসেফের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সুকৌশলে বর্ণনা করেছেন। প্রথমখণ্ডে জোসেফের নিজের দৈবলিখন সম্বন্ধে সচেতনতা, এবং মরুভূমি, পিরামিড, স্ফিন্‌ক্স, সূর্যমন্দির ইত্যাদির অপরূপ বর্ণনা মনের উপর গভীর রেখাপাত করে।

ঐতিহাসিক পটভূমির বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। বাইবেলের একটি গল্পের কাঠামোকে মান যে-ভাবে রক্তমাংসে প্রাণবন্ত করেছেন সেটা বিস্ময়ের বিষয়। শুধু পুরনো কাঠামোকে প্রাণবন্ত করা যেতে পারে বোধহয় তখনি যখন লেখকের সাম্প্রতিক সমাজবোধ তীক্ষ্ণ থাকে। জেকব ও জোসেফের গল্পটির উপরে মান আধুনিক মনস্তত্ত্বের আলোকপাত করেছেন। অবচেতনের নামে মনস্তত্ত্বের অপলাপ এত করা হয়েছে যে মানের সহজ সাফল্য বিস্ময়কর। সাফল্যের কারণ বোধহয় এই যে মানের সমাজবোধ এবং পাপবোধ (Sense of sin) আছে। তাঁর কাহিনীতে বরাবর সংগতির সুদীর্ঘরেখা বর্তমান। চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়ে জোসেফ, পটিফার এবং পটিফারের স্ত্রী, এরাই প্রধান স্থান অধিকার করেন। কিন্তু এঁদের আব-হাওয়ায় মান আরো-কয়েকটি চরিত্র বর্ণনা করেছেন যাঁদের মূল্য মোটেই স্বল্প নয়, যেমন মন্ট-কাও, পটিফারের গৃহস্থিত বামনদ্বয়।

জোসেফের চরিত্রে যে-জিনিশটি উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে তাঁর মিশরীয় সভ্যতা সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি, পাপবোধ, এবং নিজের ভবিষ্যৎ বিষয়ে সহজ সচেতনতা। নবীন বর্ধিষ্ণু সভ্যতার দৃঢ়তা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই দৃঢ়তা কখনো কাঠিন্যে পরিণত হয় নি। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার এবং আদর্শবাদের সংগত সংমিশ্রণ জোসেফের চরিত্রের এবং জীবনের মূলধন।

একদিক থেকে পটিফারই 'জোসেফ ইন ইজিপ্ট'-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র। বর্দ্ধিষ্ণু সভ্যতার প্রতিনিধি জোসেফ, ভবিষ্যতের নবীন সূর্য তাঁর সামনে; কিন্তু আধুনিক পাঠকের সঙ্গে আরো অন্তরঙ্গ যোগ স্থাপিত হয় পটিফারের সঙ্গে। তাঁর জীবনযাত্রার এবং মনস্তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে মান পরজীবী, অলস সভ্যতার একটি অধ্যায় আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। পটিফারের চরিত্রে মানের অন্তর্দৃষ্টি, তাঁর জীবনযাত্রায় লেখকের সংযত সহানুভূতি, এ-দুয়ের ফলাফল বিস্ময়কর। এ-চরিত্রের, এবং মিশরীয় সভ্যতার সে-অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠাংশের বিশেষত্ব ছিল আত্ম-কেন্দ্রিক অনুভূতির তীক্ষ্ণতা। পটিফারের ক্ষেত্রে পরশ্রমজীবী বিশ্রাম ছাড়া সে-তীক্ষ্ণতার আরেকটি কারণ ছিল নিরুদ্ধরতি। পটিফার সম্বন্ধে বামপন্থী পাঠকের সহানুভূতির অভাব আশা করি হবে না, কারণ বর্তমান সভ্যতার বিকর্ষণে ধ্বংসপ্রায় শ্রেণীর এককালীন মূল্য বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানের অভাব হওয়া অনুচিত। পটিফার এবং মুটের কথোপকথনে মান এই শ্রেণীর আত্মকেন্দ্রিক আতঙ্কের এবং স্বার্থপর অর্থহীনতার ইঙ্গিত করেছেন বটে, তবুও এই আরামবিলাসী, সুসভ্য মানুষটির উপর পাঠকের আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত অবিচলিত থাকে।

পটিফারের স্ত্রীর কাহিনীতে মান তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। বইটি মাঝে-মাঝে একঘেয়ে লাগে, কিন্তু শেষের দিকে নিরুদ্ধরতি এই স্ত্রীলোকটির আশাহীন কামনা এবং ক্রমাবনতি, জোসেফের মানসিক দ্বন্দ্বের উপর অতীত-জীবনের সর্বদা-প্রসারিত সতর্ক ছায়া ইত্যাদি আমাদের স্তিমিত কৌতূহলকে আবার উত্তেজিত করে। তাছাড়া, সমস্ত মহৎ উপন্যাস সম্বন্ধেই স্থানে স্থানে একঘেয়েমির অভিযোগ বোধ করি আনা চলে। 'জোসেফ ইন্ ইজিপ্ট' মহত্ত্বের এই বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম নয়।

কালো হাওয়া : বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেববাবুর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কালো হাওয়া' সহজেই প্রথম স্থান অধিকার করবে। তার কারণ 'কালো হাওয়া'র কয়েকটি চরিত্র লেখকের ব্যক্তিত্ব-নিরপেক্ষ। বুদ্ধদেববাবুর নায়কেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামত এবং চরিত্রের মুখপাত্র। সে-জন্য শেষ পর্যন্ত তারা পাঠকের মনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাবি করতে পারে না। কিন্তু এ-অভিযোগ 'কালো হাওয়া'র অরিন্দম, হৈমন্তী এবং মহামায়া সম্বন্ধে খাটে না। অরিন্দমের জীবনীশক্তি অ-সাধারণ, তিনি খেতে ভালোবাসেন, উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলেন, তাঁর মধ্যে কোনোরকম কুটিল মারপ্যাঁচ নেই। তিনি অনেকটা স্থূল, কিন্তু হৃদয়বৃত্তির স্বাভাবিক বলিষ্ঠতায় আমাদের আকর্ষণ করেন। প্রথম-যৌবনের উদ্দাম প্রাণশক্তি প্রৌঢ়বয়সেও তিনি হারান

নি। তাঁর স্ত্রী হৈমন্তী একদা সম্পূর্ণভাবে তাঁর সহধর্মিণী ছিলেন, অর্থাৎ স্বামীর প্রাণশক্তির অংশীদার ছিলেন। কিন্তু যৌবন-সীমানায় এসে স্ত্রীলোকেরা মানসিক ও দৈহিক জীবনে যে-বিপর্যয়েব মুখোমুখি হন, তার ধাক্কা তিনি সামলাতে পারেন নি। বহুদিন প্রবাসে থেকে অরিন্দম কলকাতায় ফিবে এসে দেখলেন যে তাঁর সংসাবে বিপর্যয় শুরু হয়েছে। হৈমন্তী ও বড়ো মেয়ে এক সন্ন্যাসিনীর করতলগত, স্ত্রীব শুচিবাই ও ধার্মিকতা প্রায় মানসিক ব্যাধিব রূপ নিয়েছে। বড়ো মেয়ে একবার প্রেমে ধাক্কা খেয়ে অবদমনের বিকৃতিতে বিষাক্ত, ছেলে মদ্যপায়ী ও লম্পট, যে কালো হাওয়া অরিন্দমেব সংসারকে আচ্ছন্ন কবেছে, তারি বিকৃত শারীরিক প্রকাশ অরুণের কুৎসিত বোগে। বিকাবের হাত থেকে একমাত্র রক্ষা পেয়েছে অরিন্দমেব ছোটো মেয়ে বুলি। অরিন্দম সন্ন্যাসিনী মহামায়ার কবল থেকে সংসারকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করলেন. কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্ঘটনায় স্ত্রীব হাতে তাঁর মৃত্যু হলো।

বুদ্ধদেববাবু মহামায়ার চবিত্রাঙ্কনে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মহামায়ার কথোপকথন এত স্বাভাবিক হয়েছে যে সেটা বিস্ময়কব। হৈমন্তীর চবিত্রের বিবর্তনও সফলভাবে লেখক দেখিয়েছেন। বুদ্ধদেববাবু আগেকাব উপন্যাসগুলিতে অনেকসময় অপ্রয়োজনীয়ভাবে লিরিকল হতেন, কিন্তু 'কালো হাওয়া'তে অরিন্দম যখন তাঁর যৌবন-স্মৃতিব রোমন্থন করেন, তখন আমরাও তাঁর অতীতে-যাত্রার সঙ্গী হই। অদৃষ্টের বিরূপ-ছায়া কী-ভাবে শেষ পর্যন্ত অরিন্দমকে গ্রাস করে তার ইতিবৃত্তেও লেখক গঠন-ক্ষমতাব চমকপ্রদ পরিচয় দিয়েছেন। অরিন্দমেব হঠাৎ মৃত্যুতে প্রথমে হয়ত খটকা লাগে, কিন্তু পাঠক মনে করতে পারেন যে বিদেশ থেকে ফিরে এসে স্ত্রীব হাতে মৃত্যু সাহিত্যের ইতিহাসে বিবল নয়, আগামেম্‌ননের মৃত্যু এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'কালো হাওয়া'র শেষ দৃশ্যটি 'Point Counter Point'-এর বিয়াট্রিস্-বাব্‌লাপের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পবিহাসের ব্যাপারে বুদ্ধদেববাবু হাক্‌স্‌লি-পন্থী, এবং হাক্‌স্‌লির উন্নাসিক রসিকতা ব্যক্তিগতভাবে আমার পছন্দসই নয়। বিধবাদের গোপন আমিষস্পৃহা ব্যাপাবটা এমন-কিছু গুরুতর জিনিস নয়, আমিষস্পৃহার সঙ্গে শুদ্ধাচাবের. নিষ্ঠার বড়াই ফরাসি লেখক হলে হয়ত নির্বিকারভাবে একই সঙ্গে দেখাতেন, মন্তব্য করতেন না। এ-সবক্ষেত্রে মন্তব্য করাটা হয়ত অ-সাহিত্যিক।

৭

Polite Essays : Ezra Pound

এই প্রবন্ধে-সংগ্রহে যদি কেউ সংযত সমালোচনা আশা করেন, তাহলে প্রথমে কিছুদুর পর্যন্ত হতাশ হবেন। পাউণ্ড সাহেবের লেখার রীতি, অন্তত এই বই-এর প্রথম কয়েকটা প্রবন্ধে মোটেই মুখরোচক নয়, এবং তিনি যে জাতিতে ইয়াঙ্কি তার প্রমাণ তাঁর ভাষায় বিদ্যমান। যে-মনোভাবে 'পোলাইট এসেজ'-এর গোড়ার দিকের সাহিত্য-সমালোচনাগুলি জাত, তার পক্ষপাতী হওয়া শক্ত। লেখক অনেক উচ্চে, পাণ্ডিত্যের প্রায় শিখবে আসীন আছেন, মরলোকেব সাহিত্যিকদের উপর অসীম বিতৃষ্ণা কিংবা অসীম কৃপা তাঁর, কিন্তু তবু নাক সিঁটকানোর এবং প্রচুর পরিমাণে গালাগালি দেওয়ার প্রলোভন তিনি সামলে উঠতে পারেন নি; ফলে 'পোলাইট এসেজ'-এর উৎপত্তি। তিনি যে-সব সাবগর্ভ কথা বলেছেন, তাঁব মতামত, ইত্যাদির সঙ্গে পাঠক একমত হতে পাবেন, কিন্তু প্রকাশভঙ্গির আতিশয্য এবং বিবক্তিকব গোঁয়াতুর্মি ববদাস্ত করা প্রায় অসম্ভব। শুনেছি পাউণ্ড সাহেব ফ্যাসিস্ট এবং সে-জন্য যদি কাবো তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত বিরাগ থাকে তাহলে 'পোলাইট এসেজ' পাঠে সেটা কিছু বাড়বে বই কমবে না, অবশ্য শেষের দিকের লেখাগুলি সম্বন্ধে এ-কথা বলা চলে না।

প্রথম প্রবন্ধে পাউণ্ড পরলোকগত মান্‌বোব এবং মান্‌রোর পরিবেষ্টনীর আলোচনা কবেছেন। পিঠ-চাপড়ানোব ভাবটা বরাবব থাকলেও প্রাক্‌-সামবিক ইংরেজি কবিতার বিষয়ে জ্ঞাতব্য খবর এতে আছে। সে-সময়কাব সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন ছিল—ওজন বুঝে প্রতিশব্দ ব্যবহার, ভাষাব ব্যবহাবে যথাসাধ্য সংযমের চেষ্টা ইত্যাদি। ইংবেজি কবিতার আধুনিক পরিণতিব মূলে রয়েছে তখনকার আন্দোলন, এবং এই বিষয়ে পাউণ্ড ও এলিয়টের দান স্মরণীয়।

পরের কয়েকটি প্রবন্ধের একটিতে পাউণ্ড হাউসম্যানের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে প্রগাঢ় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন; এর সঙ্গে কয়েকটি পুরোন কবিদের, বিশেষ করে মিলটনের প্রতি লেখকের অপরিসীম বিরাগের পরিচয় আছে। আবেকটিতে এলিয়টের সাহিত্যদৃষ্টির প্রশংসা করে পাউণ্ড কয়েকপাতা লিখেছেন। 'প্রোজ ট্র্যাডিশ্যন ইন ভর্স' রচনাটিতে সংযমের এবং সুস্পষ্ট সমালোচনাব দৃঢ় ছাপ আছে, এবং এই প্রবন্ধে পাউণ্ডের সঙ্গে আধুনিক কোনো পাঠকের মতানৈক্য হবে না। Hueffer-এর আলোচনায় তিনি বলেছেন :

I find him significant and revolutionary because of his insistence upon clarity and precision, upon the prose tradition; in brief, upon efficient writing—even in verse!

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার নিয়ে আলোচনা এবং আন্দোলন চলছে। এই বিষয়ে পাউণ্ডের মতামত প্রণিধানযোগ্য। বর্তমান ইউরোপে এবং আমেরিকায় সর্বাঙ্গীণ বিশৃঙ্খলার আর বুদ্ধিহীনতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষানীতি এই বৃহত্তর সমস্যারই একটি অংশ। বছরের পর বছর কয়েকটি মাত্র প্রসঙ্গের চর্বিতচর্বণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়, এ-ধরনের একটা ধারণা প্রচলিত আছে। আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা এমন যে সমসাময়িক পৃথিবীর সঙ্গে বিশেষ-কোনো পরিচয় অধিকাংশ লোকেরই ঘটে না। ইতিহাসের যে ব্যবহারিক জ্ঞান সমাজকে দূরদর্শিতা শেখাতে পারে তার লেশমাত্র শিক্ষাপদ্ধতিতে নেই। উদাহরণস্বরূপ পাউণ্ড গত মহাযুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। যুদ্ধের প্রকৃত কারণ এবং সঠিক খবরাখবর কয়েকটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু কোনো উল্লেখযোগ্য বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান জনগণকে সে-সম্বন্ধে সচেতন করার প্রয়াস করে নি। কেন যে করে নি সেটা অবশ্য সহজেই বোঝা যায়।

মোটের উপর আমরা বলতে পারি যে, শিক্ষা ইত্যাদির আমূল সংস্কার ততদিন হতে পারে না যতদিন বর্তমান রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা অটুট থাকবে, কারণ আধুনিক ধনতান্ত্রিকতা এবং সামাজিক নিম্নগতি পরিচ্ছিন্ন নয়, অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সংস্কার-চেষ্টার ফল আংশিক এবং অস্থায়ী হতে বাধ্য। পোলেটিক্যাল আন্দোলন বাদ দিয়ে শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কারের প্রয়াস অরণ্যে রোদনের নামান্তর। এ-প্রসঙ্গে পাউণ্ডের মতামত কী জানি না। তাঁর অন্যান্য গদ্যপুস্তক পড়ার সুযোগ আমার হয় নি।

প্রথমে পাউণ্ডের প্রকাশভঙ্গির যে বিরক্তিকর বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করেছি 'হাউ টু রীড' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধ তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এটি পাঠ করার পর প্রত্যেক পাঠকই উপকৃত হবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কী করে সাহিত্য পড়ানো হয় তা এবং নিজের জীবনের কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করে লেখক সাহিত্য নিয়ে সাধারণভাবে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। বরাবরই তিনি এই কথাটার উপর জোর দিয়েছেন—

It is as important for the purpose of thought to keep language efficient, as it is in surgery to keep tetanus bacilli out of one's bandages;

তবে মাঝে-মাঝে তাঁর কথাবার্তা হেগেলের দর্শনের মতো নিচের দিকে মাথা করে দাঁড়িয়েছে; কখনো কখনো তিনি ঘোড়ার আগে গাড়ি স্থাপন করেছেন।

তাছাড়া অতি-সাহিত্যিক কোনো বিভাগে কোনো লেখাকে তিনি ফেলতে চান না, কারণ সাহিত্য নিরপেক্ষ, ইত্যাদি। You do not divide physics or chemistry according to social or religious categories. এই সূত্রে প্রতিবাদ হিশেবে আমরা জীনস্‌, এডিংটন প্রমুখ দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের কথা স্মরণ করতে পারি। তবে এ-ধরনের উক্তি 'হাউ টু রীডের' আসলকথা নয়। এর একটি পরিচ্ছেদে বিগতশতকের এবং তারো পূর্বের ইউরোপীয় সাহিত্যে গদ্যের পরিণতি এবং স্থান নিয়ে পাউণ্ড যে-আলোচনা করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। এর থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত কবে আমরা বর্তমান আলোচনার শেষ করতে পারি :

The language of prose is much less highly charged, that is perhaps the only availing distinction between prose and poetry. Prose permits greater factual presentation, explicitness, but a much greater amout of language is needed. During the last century or century and a half, prose has, perhaps for the first time, perhaps for the second or third time, arisen to challenge the pre-eminence.

Forward from Liberalism : Stephen Spender

আধুনিক কয়েকজন ইংরেজ লেখক সাহিত্যিক নন্দদুলাল নন। অর্থাৎ তাঁরা মনে করেন না যে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মন্থর মৃত্যু এমন-কিছু বড়ো দুর্ঘটনা নয়, যেহেতু এখন পর্যন্ত তাঁরা নিজেরা কয়েকটি উত্তম কবিতা, ছোটোগল্প কিংবা উপন্যাস রচনা করতে সক্ষম। দুর্ঘটনার আয়তনে বিচলিত হয়ে অ্যাঙ্গলো ক্যাথ-লিসিজম কিংবা শান্তিবাদের বালুতে মাথা গুঁজে ঝড়ের আগে উটপাখির মতো নিষ্ফল নিষ্কৃতি এঁরা খোঁজেন নি, সেজন্য ধন্যবাদ।

১৯৩৩-এর পর হিটলারের উত্থান সমস্ত ইউরোপে যুদ্ধ ও বর্বরতার বিভীষিকা এনেছে। শ্রেণীস্বার্থের সংঘাত লিবেরল ইউরোপে কতদূর বিস্তৃত এবং অন্তঃশীল তা সমসাময়িক ইতিহাস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। এর আগে অনেক সাহিত্যিকই সনাতন জীবনপ্রথার সমালোচনা করেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন, কিন্তু সেই আত্মসমাহিতভাব এখন সম্ভবপর নয়। সে-জন্য আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে একটি পথবিচ্ছেদ ঘটেছে। কয়েকজন লেখক খোলাখুলিভাবে বলেছেন যে শ্রেণীহীন সভ্যতায় কাজ নেই, চপহাউসের ইতরতায় আমাদের স্পৃহা কম, চার্চ-গঠনে মনোনিবেশ করাটাই সভ্যতার পরিচায়ক। ধর্মং শরণং গচ্ছামি। দু-একজন সম্ভবত প্রাণায়াম অভ্যাস করছেন। অন্যদিকে অনেককেই ফ্যাসিজমের

বর্বর অভিযান, সমসাময়িক সংস্কৃতি-সংকট; প্রাচুর্যের মধ্যে দারিদ্র্যের দুঃস্বপ্ন, ইত্যাদি পীড়িত করেছে, এবং নতুন সমাজগঠনের সম্ভাবনায় তাঁদের প্রবল আস্থা আছে। স্পেণ্ডর এদের মধ্যে একজন :

Eeverything which we do to fight for life, to extend knowledge and understading, create beauty, must be bound up with the political will to make impossible war, hatred and public misery which destroy these values.

ধনী-শ্রমিকের মধ্যবর্তী শ্রেণীর জন্য প্রধানত 'ফরওয়ার্ড ফ্রম লিবেরালিজম্' রচিত। বুদ্ধিজীবীরা এর মধ্যে পড়েন। মধ্যশ্রেণীর সাহায্য আজকের সংকটের সময় জাতীয় ইতিহাসকে পরিবর্তিত করতে পারে, অন্তত ফ্যাসিজমের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করতে পাবে, কারণ প্রতিক্রিয়াপন্থী মধ্যশ্রেণীই ফ্যাসিজমের প্রাণশক্তি। এই ধারণাব ভিত্তিতে ইউরোপে সম্প্রতি সম্মিলিত জনসজ্ঘের জন্য আন্দোলন চলেছে এবং ফ্রান্স ও স্পেনের সাম্প্রতিক ইতিহাস অনেকের মনেই নতুন উৎসাহ এনেছে। ইংলণ্ডে মধ্যশ্রেণীব সংগঠন অত্যন্ত দৃঢ়। এর মধ্যে অনেকেই আজকাল সভ্যতাব দুর্দিনে ভাবিত হয়ে পড়েছেন। এঁরা ফ্যাসিজমে আস্থাবান নন, স্বাধীনতাকে সবচেয়ে বড়ো জিনিশ বলে মনে করেন, কিন্তু ওদিকে কম্যুনিস্ট জুজুর ভয়পীড়িত। স্বাধীনতায় বিশ্বাস এই সূত্র তাঁদের এবং সাম্যবাদীদের একত্রে বাঁধবার সহায়তা করবে, স্পেণ্ডরের এই ধারণা। সেজন্য 'ফবওয়ার্ড ফ্রম লিবেরলিজম্' অনেকটা ব্যক্তিগত হলেও এর ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়, কারণ স্পেণ্ডর উপরোক্ত শ্রেণী হতেই আসছেন, এবং কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করার আগে খুব সম্ভব তাঁকে অনেক মানসিক বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করতে হয়েছে। লিবেরলের সাম্যবাদী হবার ইতিহাস পাঠক এই পুস্তকে পাবেন। ধনী-শ্রমিকের মধ্যবর্তী পর্যায়ের কয়েকজনের কাঠিন্য ভেদ করতে 'ফরওয়ার্ড ফ্রম লিবেরালিজম্' সাহায্য করবে বলে মনে হয়।

উদাব মতবাদ সম্বন্ধে ধারণা ভিন্নশ্রেণীর লোকের ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদ যে-শ্রেণীর পুষ্টিসাধন করেছে, তার কাছে উদারপন্থীদের আদর্শ যে উজ্জ্বল বলে ঠেকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেহেতু উদার গণ-তান্ত্রিকতা বর্দ্ধিষ্ণু বুর্জোয়ার সৃষ্টি। স্পেণ্ডরের মনে লিবেরল তত্ত্ব ও ব্যবহার নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে। লিবেরল তত্ত্বে, লিবেরল আদর্শে তিনি গৌরব বোধ করেন। কিন্তু উপরোক্ত আদর্শ রাজনৈতিক পার্টির কার্যপ্রণালীতে আরব্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে এর আভন্তরীণ সমস্ত খুঁত আর বিরোধ ধরা পড়ল। তখনি মার্কসের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ একে ক্ষতবিক্ষত করতে বাধ্য; তখনি এ-কথা মানতে হবে যে লিবেরল কার্যপদ্ধতি এবং আদর্শবাদ শ্রেণীস্বার্থের ভিত্তিতেই গঠিত, বিশুদ্ধ পরার্থপরতা নয়।

উদারপন্থী রাজনীতি তখন বুর্জোয়া মুখোশ বলে ঠেকে, মনে হয় লিবেরল 'ইউ-টোপিয়া'সকল সাম্রাজ্যবাদপ্রসূত, পীড়িতশ্রেণীর সাহায্যে ক্ষমতা পাবার আন্দোলন মাত্র ; ক্ষমতা হাতে আসার পর প্রচলিত সমাজব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের 'ইডিওলজি'ই উদার গণতান্ত্রিকতার আসল কথা।

এই আসল কথাটা স্পেণ্ডর মোটামুটিভাবে মানেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে লিবেরল আদর্শবাদ সভ্যতার চিরস্থায়ী সম্পত্তি, শ্রেণীস্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত হলেও এই আদর্শ কখনো মরবে না ; লিবেরল পার্টির সমাধি হয়েছে বললেই চলে, কিন্তু তার তত্ত্ব এখনো জীবন্ত : এখনো তো ইউরোপে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধতা বহু লিবেরল সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও ব্যক্তিবিশেষ জীবন বিপন্ন করে করছেন। কালক্রমে পুরনো আদর্শের রূপান্তর হয়েছে—অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন—এ-সত্যেরই উপলব্ধি যাঁরা করছেন তাঁদের সাম্যবাদে বিশ্বাস করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। স্পেণ্ডরের মতো অনেকেই লিবেরল বলেই সাম্যবাদী সঙ্ঘে যোগ দিয়েছেন। সাম্যবাদই লিবেরল আদর্শের উত্তরাধিকারী। নতুন তনুতে লিবেরল অতনুর পুনরুজ্জীবন হয়েছে।

কোনো শ্রমিকশ্রেণীর গোঁড়া লেখক উদারপন্থীদের ব্যবহারিক ইতিহাসের ভগ্ন-স্তূপ থেকে আদর্শবাদের উজ্জ্বল উদ্বৃত্ত টেনে বার করবার জন্য ব্যস্ত হতেন না বোধ হয়, লিবেরল তত্ত্ব ও ব্যবহারের বিরোধকে শ্রেণীগত বুজরুকি বলেই ধরে নিতেন। উনবিংশশতাব্দীর দীর্ঘ শ্রমিক-আন্দোলন, শাসকশ্রেণীর অত্যাচার, যুদ্ধের আগে লিবেরলদের ইউরোপব্যাপী কাপুরুষ-প্রতারণা তাঁর চোখের সামনে ভাসত। কিন্তু স্পেণ্ডর যে-শ্রেণী থেকে আসছেন তার অতীতের সঙ্গে উদারপন্থীদেব উত্থানপতন, গৌরবকলঙ্কের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই স্পেণ্ডরের লেখায় উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির বর্ণনায় 'যদি'ব সংখ্যাটা বেশি।

গত মহাযুদ্ধের সময় লিবেরল পার্টির লজ্জাকর ব্যবহার তার ভবিষ্যৎকে চির-কালের জন্য ব্যাহত কবেছে। কন্টিনেন্টে সোসাল ডিমক্রেসীর প্রাক্-সামরিক ও সমরোত্তর কার্যপদ্ধতি গৌববময় নয়। অক্ষম লিবেবল ডিমক্রেসী কন্টিনেন্টে এনেছে হতাশা আর বিবাগ, ইংলণ্ডে এনেছে ঔদাসীন্য। এই দুই মনোভাবই ফ্যাসিজমের ভিত্তি এবং পরিপোষক। হাত-পা ছেড়ে বসে-থাকাটা ইউরোপের সবচেয়ে বেশি সর্বনাশ করেছে, কারণ হতাশায় আর ঔদাসীন্যে দিনযাপনের সময় যা হাতের কাছে আসে তাকেই লোকে আঁকড়ে ধরে, এবং হাতের কাছে হাত-পা ছোঁড়া, চটপটে আস্ফালন নিয়ে এসেছে মুসোলিনী, হিটলার। সে-জন্য ফ্যাসিজমকে দমন করতে হলে লিবেরল আদর্শবাদকে জিইয়ে রাখা দরকার ; অবশ্য সে-আদর্শকে রূপান্তরিত করতে হবে, পুরোনো শক্তিকে আনতে হবে নতুন প্রণালীতে। আসন্ন যুদ্ধের কলকাঠি, ফ্যাসিজমের সরঞ্জাম আছে সেইসব কর্তাদের হাতে যাঁরা

পার্লামেণ্টে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরেব মতো বাক্যালাপ করেন। কিন্তু যুদ্ধ যারা করবে তাদের উপরেই শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি ইতিহাসে নতুন পাতা রচনা করতে পারে।

অনেকেরই ধারণা যে ইংলণ্ড ধ্রুপদী গণতান্ত্রিকতার দেশ, ওখানে ফ্যাসিজমের ভীতি, বিশেষ কেন, মোটেই নেই। কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্টের কার্যাবলি যাঁরা পরীক্ষা করে আসছেন তাঁরাই জানেন যে ওখানকার শাসক সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে হাওয়া কোন দিকে বইছে। অ্যাবিসিনিয়া এবং অধুনা স্পেনের ব্যাপারে ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্টের স্বরূপ জলের মতো স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিষকুম্ভ পয়োমুখ ফেবিও-ফ্যাসিস্টদের উদাত্ত কথাবার্তা ইংলণ্ডে আসন্ন বর্বরতার পথ পরিষ্কার করে রাখছে। একে দমন করতে পারে জনগণের সম্মিলিত শক্তি। সেই সূত্রে স্পেণ্ডর লেবর পার্টি, শান্তিবাদী সঙ্ঘ ইত্যাদির গঠন ও কার্যপদ্ধতি পরীক্ষা করেছেন।

লিবেরল কার্যপদ্ধতির উত্তরাধিকারী হচ্ছে ইংলণ্ডের লেবর পার্টি। সেই ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি, সেই পুরোন শ্রেণী-সতর্কতা লেবরে আবার রূপ পেয়েছে। এ-পার্টির আয়তন দেখে বিচার করতে গেলে ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে ঠেকে। তথাকথিত লেবর পার্টি যদি শুদ্ধমাত্র সমালোচনার পরিবর্তে সোশালিস্ট প্রোগ্রাম ভোটারদের সামনে উপস্থিত করত এবং ক্ষমতা পেলে প্রোগ্রাম অনুসারে দৃঢভাবে কাজ করে যেত, তাহলে ওখানে জনগণের কাজ এতদিনে অনেকটা অগ্রগামী হতো।

এক হিশেবে লেবর পার্টিতে এ-ধরনের কর্মঠতা আশা করা বৃথা। শ্রমিকশ্রেণীর উপরিভাগে যাঁরা কালক্রমে সচ্ছল হয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীতে ঢুকে পড়েছেন তাঁরা যে ভবিষ্যৎ-ভাবি-কেবা-বর্তমানে-মরে চিন্তা করে বুর্জোয়া সমাজপ্রথাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে থাকবেন আতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে। লেবব পার্টির সমস্ত শক্তি সাম্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেই নিঃশেষিত, গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যেতে লেবর নিস্পৃহ, কারণ গভর্ণমেণ্টের দেওয়া মুখরোচক খাদ্যেই পার্টির কর্তাদের জীবন বেশ আয়াসেই কাটছে। সম্প্রতি লেবর পার্টিতে একটি বামপন্থী দল ক্রমশ বাড়ছে, সেটাই একমাত্র আশার কথা।

শান্তিবাদীদের বিষয়ে স্পেণ্ডর যা বলেন তার সঙ্গে মতানৈক্য অনেকেরই হবে। বুর্জোয়া শান্তিবাদ স্বার্থ-সংরক্ষণের নামান্তর। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রমিক-বিদ্রোহকে এত-বেশি ভয় করেন যে নিরস্ত্র শান্তিবাদীদের ভঙ্গুর খুঁটিই শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরছেন। এঁদের বিচিত্র ও অচল বিধি বিশ্লেষণ করার পর স্পেণ্ডর বলেছেন যে, এঁদের আদর্শেব সঙ্গে সাম্যবাদী আদর্শের মূলত কোনো পার্থক্য নেই। কারণ শান্তিবাদীরা স্বাধীনতা এবং সভ্যতায় বিশ্বাসী; যে-পার্থক্যটা আছে সেটা পদ্ধতি-

ঘটিত। এ-কথা অনেকেই অবিশ্বাস করবেন। গত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা অনেক নিষ্ফল মতবাদকেই যমের দক্ষিণদুয়ারে পাঠিয়েছে। গতযুগের শ্রেষ্ঠ শান্তিবাদী রোমাঁ রোলাঁ। সম্প্রতি লেনিনের উক্তিতে সম্পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং এখনো পদ্ধতি-সংক্রান্ত সন্দেহ থাকাটা আশ্চর্যকর লাগে। তাছাড়া সাম্যবাদীরা শূন্যে স্বাধীনতা চান না, স্বাধীনতার অর্থ তাঁদের কাছে বিশিষ্ট : অর্থনৈতিক দাসত্বের ভিত্তিতে স্বাধীনতা কখনো গড়ে উঠতে পারে না—এ-কথাটা হাক্স্‌লি-প্রমুখ শান্তিবাদীদের মুখে শোনা যায় না, সমাজব্যবস্থার অধিকারভেদের প্রতি তাঁদের আক্রোশ নগণ্য, এবং হাক্স্‌লির অন্তত শ্রেণীহীন সমাজে কোনোই আস্থা নেই, অতএব হাক্স্‌লি-মার্কা 'গঠনশীল শান্তিবাদ' এবং সাম্যবাদী আদর্শের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। হাক্স্‌লির শান্তিবাদ পুরাতন অজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি, একটি বুদ্ধি-জীবী উটপাখির ব্যর্থ প্রচেষ্টা। অন্যান্য সঙ্ঘের সঙ্গে সাময়িক ঐক্যের প্রয়োজন স্বীকার করলেই যে মূল আদর্শের ঐক্য প্রমাণ করতে হবে তার কোনো অর্থ নেই, কম্যুনিস্ট পার্টি ইংলণ্ডে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় ; কিন্তু আয়তনই সব নয়, এ-সঙ্ঘের আদর্শই ইংলণ্ডের জীর্ণ সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করবে।

বুর্জোয়া সভ্যতায় অনেক-কিছু আছে যা চিরকালের সম্পত্তি, কিন্তু চিরকালের কথা ভেবে অনেকেই বিশেষ-কোনো সান্ত্বনা পান নি যখন দেখেছেন যে তাদের ভোগ করবার লোকসংখ্যা কত সংকীর্ণ। এমন পৃথিবী আধুনিক শ্রমিককে গড়ে তুলতে হবে যার সভ্যতার মূলসূত্র হবে সমষ্টিগত জীবন, কয়েকজন পরগাছা ব্যক্তি-বিশেষের বুদ্ধিবিলাস নয়। জরাগ্রস্ত ধনতন্ত্র সৃষ্টিশক্তির পরিপোষক নয়, সে-জন্য বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এককালীন প্রতিভাবান লেখকরা শেষ পর্যন্ত অর্বাচীনের মতো কথাবার্তা বলতে শুরু করেছেন, একটি ধ্বংসোন্মুখ ঐতিহাসিক শ্রেণীর শেষ প্রলাপ তাঁদের মুখে ধ্বনিত হচ্ছে। এখানে এ-কথা উল্লেখ করা উচিত যে মার্কস-পন্থীরা ব্যক্তিত্বকে অবিশ্বাস করেন না, উপরন্তু তাঁরা মনে করেন যে শ্রেণীহীন সমাজেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর। তাঁদের ব্যক্তিত্বের ধারণা আধুনিক অনেক বুদ্ধিজীবীর মুখরোচক না হতে পারে, কারণ বহুমূল স্বার্থপরতা ও সতর্কতা আধুনিক মানুষের প্রায় সহজাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন পৃথিবীতে বণিক-সভ্যতার উল্লেখযোগ্য দান স্থায়ী হবে, কারণ যে বাঁশের সংকীর্ণ সাঁকোর উপর দিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক সংস্কৃতির পুঁজি হাতে আমার-পরে-বন্যা জেনে সন্তর্পণে যাতায়াত করত তার পরিবর্তে ভবিষ্যতের শ্রেণীহীন অরাজনৈতিক সমাজে দৃঢ় ও সত্যিকার গণতান্ত্রিক সেতু নির্মিত হবে। 'ফরওয়ার্ড ফ্রম লিবেরলিজম্'-এর শেষ অধ্যায়ে স্পেণ্ডর 'সোভিয়েট কম্যুনিজম্' থেকে উদ্ধৃত করে ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী সমন্বয়ের উপরে গঠিত সমাজের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

Studies in a Dying Culture : Christopher Caudwell

নিরঙ্কুশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস রেনেশাঁস্-ইউরোপের দায়ভাগ। বর্তমানকালে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই এ-ধরনের স্বাতন্ত্র্যে আস্থা হারিয়েছেন, এবং মোটামুটি দুটো দিক থেকে এর বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছে। সমাজ, ব্যক্তি ও বিশ্বের সম্বন্ধে হিউম যা বলেছিলেন তা আজকাল বহুলভাবে প্রচারিত। অন্যদিকটা আধুনিক ইংরেজ লেখকদের মধ্যে মৃত কড্ওয়েলই সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করেছেন। দু-দিকের সমালোচনার ফলাফল অবশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। হিউমের মনোভঙ্গি ঐতিহাসিক নয়, তিনি হিউমানিজম্ সম্পূর্ণভাবে বরবাদ করে ক্ষান্ত হয়েছেন, কিন্তু কড্ওয়েল্-প্রমুখ লেখকেরা ইতিহাসের সাহায্যে সমাজ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করেছেন।

Man is born free, but everywhere he is in chains—আধুনিক ইউরোপের মূল বিশ্বাস রুশোর এই বিখ্যাত পঙ্ক্তিটি এবং এটাই রেনেশাস-বুর্জোয়ার প্রধান ছাড়পত্র। 'Illusion and Reality'-তে কড্ওয়েল দেখিয়ে-ছেন যে, ব্যাপারটি প্রথম থেকেই সত্যি নয়; উপরের পঙ্ক্তিকে সত্য বলে মানলে জঙ্গলে প্রত্যাগমন করা ছাড়া উপায় নেই। মানুষ শেষ পর্যন্ত সামাজিক জীব; এবং সমাজের সঙ্গে তার সহোদর সম্পর্ক। ঐতিহাসিক ধারার আবিষ্কার এবং প্রধান প্রয়োজন স্বীকার করে নেওয়াটা স্বাধীনতার সূত্রপাত, কারণ তাহলে সমাজগতিকে আয়ত্তে আনা যায়। Freedom is recognition of necessity। কিন্তু এ-সত্যটি বুর্জোয়া-ভাবধারায় পরিপুষ্ট মনীষীরা স্বীকার করে নিতে পারেন নি। অনেকে কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে পিছিয়ে এসেছেন। তাঁদের লেখায় গোলক-ধাঁধাঁর, আত্মপরিক্রমার কারণ ঐতিহাসিক উপলব্ধির অভাব, তাদের শেষ ব্যর্থতার কারণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে অন্ধবিশ্বাস। এ-বিশ্বাসপ্রসূত গোলকধাঁধাঁটা আধুনিক সভ্যতার গতিতে অবশ্যম্ভাবী, সে-জন্য কড্ওয়েল তাঁর বই-এ মির্স্কির মতো অনর্থক গালিগালাজ করেন নি, কারণ আবিষ্কারের এবং বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সত্য তিনি যাচাই করেছেন শ, ওয়েল্স্, লরেন্স, টি. ই. লরেন্স, ফ্রয়েড ইত্যাদির লেখার বিচারে, এবং এঁদের সম্বন্ধে কড্ওয়েলের সঙ্গে অনেকেই এক-মত হবেন। তিনি দেখিয়েছেন কী-প্রকারে সমস্যার সমাধানে অসমর্থ হয়ে শ অর্বাচীন উপহাসরসিকতায়, লরেন্স 'রক্তের অন্ধকারে' আশ্রয় নিলেন। টি. ই. লরেন্স সভ্যতার মুষ্টি থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টায় যেখানে আশ্রয় নিলেন সেখানেই অজ্ঞাতসারে বুর্জোয়া সভ্যতার সমস্ত ক্লেদাক্ত বীজ রোপণ করলেন।

এ-বই পড়ায় কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে। সনাতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস বরবাদ করলেই কি বুর্জোয়া সাহিত্যিকদের প্রধান বাধা অপসারিত হবে, তাঁরা আর বুর্জোয়া থাকবেন না? অডেন-প্রমুখ কয়েকজন ইংরেজ লেখক তো ইতিহাসের

অনিবার্যতা স্বীকার করেন, কিন্তু কোনো মহৎ সাহিত্য এখনো তাঁরা সৃষ্টি করতে পারেন নি। তাঁদের রচনায় ইচ্ছাপূরণের প্রয়াসটা পীড়াজনক। সে-জন্য মনে হয় এঁদের ইতিহাসে বিশ্বাসটা এখনো অস্থিমজ্জাগত হয় নি, নেহাৎ শৌখিন এবং মৌখিক আছে, এবং হওয়া হয়ত সম্ভবও নয়। রেনেশাঁস-বুর্জোয়ার দলিলে জ্ঞাতসারে দস্তখত করেন নি বলেই বোধহয় সাম্প্রতিক ইংরেজি কবিতার উপর এলিয়ট তাঁর দীক্ষার আগে পর্যন্ত উন্মোচনীশক্তির কাজ করেছেন। যদি সম্পূর্ণভাবে এটা উপলব্ধি করা যায় যে, 'ব্যক্তির কৈবল্যে বাহুল্য ব্যক্তিও' তাহলে নতুন ভিত্তিতে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন হবে। অন্তত কয়েকজন ইউরোপীয় লেখকের রচনায় এ-ধরনের ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু অডেন-প্রমুখাদির অবস্থাটা ত্রিশঙ্কুর মতো ; এঁরা আজ পর্যন্ত শুধু বলতে পারেন : We cannot choose our world, our time, our class.

বড়ো পটেই কড্ওয়েলের হাত খোলে। তাঁর অসাধারণ বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় 'Illusion and Reality'-তে স্পষ্ট। কিন্তু ছোটো প্রবন্ধের সীমায় তিনি অনেক সময় জোরালো হতে পারেন নি। যতক্ষণ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন ততক্ষণ তাঁর ক্ষমতা অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রতি প্রবন্ধেই শেষের দিকে তিনি ভারসাম্য আনার জন্য ভবিষ্যতের মানদণ্ডে বর্তমান সাহিত্যকে যাচাই করার চেষ্টা করেছেন ; সে-মানদণ্ডটা অনেকের কাছেই অনাবশ্যক ঠেকবে।

স্বগত : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

গত কয়েকবছরের মধ্যে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে যে-পরিবর্তন এসেছে 'পরিচয়' পত্রিকা প্রধানত তার মুখপত্র। ব্যক্তিগত ভালো-লাগা-না-লাগার খামখেয়ালি, চুটকি সমালোচনায় সাহিত্যের এ-বিভাগটির মর্যাদা নামমাত্র ছিল। সাহিত্যের সঙ্গে অন্যান্য যে-সব বিষয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না-থাকলে সাহিত্য শৌখিনতা মাত্র, সে-সব বিষয়ের ভিত্তিতে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি গড়ে তুলেছেন ; প্রবন্ধরচনায় অধিকাংশ সময় তিনি যে ধৈর্য, পাণ্ডিত্য ও কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন তাতে গড়ে তুলেছেন কথাটিই সমীচীন। 'স্বগত' মনোযোগ দিয়ে পড়লে কয়েকটি মূলসূত্র আবিষ্কার করা যায় ; কিন্তু তাদের বিস্তৃত সমালোচনা এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার গণ্ডিতে হওয়া কঠিন, এবং যে-পরিমাণ পাণ্ডিত্যের বিস্তৃতি থাকলে সেটা সম্ভব হতো সেটা বর্তমান সমালোচকের নেই।

সুধীন্দ্রনাথ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে বরাবর একটি পার্থক্য টেনেছেন ; তিনি দেখিয়েছেন যে আধুনিক অনর্থের মূল হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আতিশয্য, ব্যক্তিস্বরূপই সাহিত্যের সত্যকার আশ্রয়। ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিলে

নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়, ব্যক্তিস্বরূপের দুরূহ চর্চা করে নৈরাত্মরীতির পরম পুরস্কার হাতে আসে, এবং নৈরাত্মরীতির চর্চা ব্যক্তিস্বরূপকে পূর্ণরূপে বিকশিত করে। প্রবহমান ঐতিহ্যের সঙ্গে এর নাড়ির সম্পর্ক, এর মূল জাতির অভিজ্ঞতায়।

বাঙালি সাহিত্যিকেরা উনবিংশশতাব্দীর স্বেচ্ছাচারবিলাসী কবিদের আদর্শে বড়ো হয়েছেন; তাঁদের কাছে এ-ধরনের কথা সুচিন্তিত বাংলাভাষায় এই প্রথম। কাব্যকে আমরা কলের জলের মতো দেখতে অভ্যস্ত; হৃদয়ের কল একটু ঘোরালেই যা প্রবল তোড়ে বেরিয়ে আসে তার নামই আমাদের কাছে মহৎ কাব্য। যে শিক্ষা, সাধনা ও ধৈর্যের ফলে ভালো কবিতা রচিত হয় তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই বললেও চলে।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। সুধীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নৈরাত্মরীতির পক্ষপাতী। সুধীন্দ্রনাথ নিজে যে-ধরনের সমালোচনা লিখেছেন তা সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে, ভালো সাহিত্য ও ভালো সমালোচনার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আজ আমাদের কাছে সুপরিচিত। তিনি যতক্ষণ নিজের প্রবন্ধগুলি নৈরাত্মভাবে লিখেছেন ততক্ষণ তাঁর সফলতা অবিসংবাদিত। কিন্তু অনেক প্রবন্ধেই তিনি তার ভারসাম্য হারিয়েছেন, ব্যক্তিগত মতামত প্রচারের আবেগে দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির সাফাই গেয়েছেন, নেপথ্য থেকে কাল্পনিক প্রতিবাদী বন্ধুদের ডেকে এনে আমাদের সামনে হাজির করে বিদ্রূপ করেছেন। ফলে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আর্যসত্যে তাঁর অসীম বিশ্বাস সত্ত্বেও, আমাদের কাছে বিসদৃশভাবে ফুটে উঠেছে। ব্যক্তিগত মতামত থাকা অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু সেটা থাকা সত্ত্বেও, সাহিত্যসমালোচনা কতখানি নিরাত্ম ও অনবদ্য হতে পারে এলিয়টের প্রবন্ধগুলি তার প্রমাণ। সুধীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে অনেকসময় পাঠককে হতাশ করেন। তাঁর দার্শনিকতা, তাঁর বিদ্রূপ, এ-সবের মধ্যে থেকে একটি জিনিশ আমাদের চিন্তিত এবং পীড়িত করে তোলে, যেটার বর্ণনা করতে হলে আমাদের guilty conscience-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'পাপী মন' কথাটির ব্যবহার করতে হয়। তাঁর বিচলিত মন নৈরাত্মের বদলে নৈরাজ্যের সৃষ্টি অনেকস্থানে করেছে।

আসলে সুধীন্দ্রনাথ ম্রিয়মাণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিনিধি। কোনো ঐতিহাসিক শ্রেণী শেষ-অবস্থায় অনেক সত্যের আবিষ্কার করে, কিন্তু সত্যগুলি জোড়া লাগিয়ে যে-উপসংহারে সে-শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা আসেন তা ইতিহাসবিরোধী ভ্রান্তিবিলাসে শেষ হয়। নৈরাত্মরীতির প্রশংসায় তাঁরা পঞ্চমুখ, সাহিত্যে নৈরাজ্যের উপর খড়্গহস্ত; কিন্তু পৃথিবীব্যাপী যে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে সর্বনাশের মুখে ঠেলছে তার পরিবর্তনের চেষ্টার উপর এঁদের অসীম বিরাগ এবং অবিশ্বাস। বুদ্ধির প্রাসাদে বসে এঁরা পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, প্রলয় আসন্ন

জেনে অবিচলিত থাকা এঁদের কাছে মনুষ্যত্বের পরিচয় ; প্রলয়ের কল্পনা, বিপদের কথা এঁদের কাছে বুদ্ধিকৌশল দেখাবার সুযোগমাত্র।

সে-জন্য সুধীন্দ্রনাথ যখন বলেন যে রামে মারলেও আমরা মরব, রাবণে মারলেও মবব, সাম্য ও মৈত্রীর মন্ত্র সেধে মানুষ মুক্তি পায় না, নামে পিশাচের পর্যায়ে, আমাদের ইতিহাসে প্রগতি আর প্রলয়ের মধ্যে বিশেষ-কোনো প্রভেদ নেই, তখন খোলাখুলি রাজনৈতিক মতামতের মুখোমুখি হয়ে আমাদের বিশেষ-কোনো অস্বস্তি হয় না। কিন্তু যখন তিনি নৈরাত্মরীতির গুণগানের পর আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বলেন যে ইতিমধ্যে মণ্ডলাকার প্রগতির পবিক্রমা হয়ত তার শেষ হয়েছে, অগ্রগমনের স্থান নেই, এর পরেই হয়ত মৃত্যু ; এর পরেও আবার যদি কাব্যের মধ্যে একটা তীব্র জ্যোতি দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে সে-জ্যোতি পথচ্যুত উল্কার চিতাগ্নি, তখন আমাদের বিস্ময়, স্ট্রেচির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার মতো, অসীমে গিয়ে ঠেকে। ভবিষ্যৎভয় সুধীন্দ্রনাথের মজ্জাগত। ফেবিয়ানদের সম্বন্ধে মিরস্কি লিখেছিলেন যে 'fear of revolution is their fundamental policy'. সুধীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎভয় মনে রাখলে তাঁকে অষ্টাদশশতকের লিবেরলদেব শেষ বংশধর বলেই ধরতে হয়। তবে শুদ্ধমাত্র বিপ্লবের ভয়কে তিনি তাঁব সুদূর-প্রসারী দার্শনিক দৃষ্টির সাহায্যে বিস্তৃততর ভবিষ্যৎভয়ে রূপান্তরিত কবে আমাদের আরো কঠিন সমস্যায় ফেলেছেন।

সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য কালক্রমে কয়েকটি বিষয়ে মত পরিবর্তন করেছেন, তাদের দু-একটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। 'মণ্ডলাকাব প্রগতি'র ধারণায় তাঁর বিশ্বাসের প্রমাণ 'স্বগত'র অনেকস্থানেই আছে। এটি সুধীন্দ্রনাথ যাঁদের প্রগতিক বন্ধু বলে বিদ্রূপ করেছেন তাঁদের কাছে মূলগত বিশ্বাসের পর্যায়ে পড়ে। অথচ সুধীন্দ্রনাথ গত প্রগতি-লেখক-সঙ্ঘেব সম্মেলনে বলেছেন : 'I must reassert that Progress is not a rectilinear ascent towards the receding apex of the Infinite, but a *spiral* movement.' এ-দুটি পরস্পরবিরোধী মত। মতপরিবর্তন স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয়। কিন্তু একটি মূলগত বিশ্বাস থেকে অন্য বিরোধী বিশ্বাসে এত সহজে যাওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। কারণ এ-ধরনের মূল বিশ্বাস বদলালে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনেকদূর বিস্তৃত হতে বাধ্য, জীবনদর্শনেরও পরিবর্তন তখন ঘটে। সে-ধরনের কোনো পবিবর্তন সুধীন্দ্রনাথে পাওয়া যায় কি ? 'স্বগত'র পরবর্তী মতামত উদ্ধৃত করতে হলো, কারণ সুধীন্দ্রনাথ যে-ধরনে লেখেন তাতে তাঁকে সমগ্রভাবে দেখাই বাঞ্ছনীয়।

প্রথমেই লিখেছি যে 'স্বগত'র উপযুক্ত সমালোচনা এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বর্তমান সমালোচকের সামর্থ্যে কুলোবে না। 'স্বগত'র যে জিনিশটি প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সেটা হলো সুধীন্দ্রনাথের অতুলনীয় ভাষা। তিনি যেখানে

ভাষাব্যবহারে সফল সেখানে ঝংকারে, গাম্ভীর্যে, সংযমে এবং পৌরুষে তাঁর তুলনা মেলা ভার। তাঁর ভাষায় প্রতিশব্দগুলি সর্বদাই নিখুঁত। বাংলা গদ্যের মোড় অদূর-ভবিষ্যতে তিনি ঘোরাতে সাহায্য করবেন এ-বিশ্বাস এবং আশা আমাদের আছে। বাংলা গদ্যের গতি যখন শিথিল এবং অতি-সহজ হয়ে পৌরুষ এবং কঠিনচিন্তার প্রকাশশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল তখন সুধীন্দ্রনাথের আবির্ভাব শুভলক্ষণ। তবে কয়েকটি জায়গায় তিনি নিজের শক্তির অপব্যবহার করেছেন; অনাবশ্যক অনুপ্রাস, ভারি অলংকার, অথবা উপমা ইত্যাদির চাপে তিনি ম্যানা-রিজমের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন, তাঁর বৈশিষ্ট্য মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে।

'স্বগত'র মূল্য এবং উৎকর্ষ অবিসংবাদিত হবে। সাহিত্যসমালোচনাকে সুধীন্দ্রনাথ অনেকদিন পর তার উপযুক্ত, নিজস্ব স্তরে এনে যে-আদর্শ খাড়া করেছেন তা প্রত্যেক বাঙালি লেখকের প্রণিধানযোগ্য। বহুদিনের আলস্যে আমাদের মেজাজ জোলো, আমাদের মনের চামড়া শিথিল হয়ে পড়েছিল; লুপ্ত স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে 'স্বগত' সাহায্য করবে, সেজন্য সুধীন্দ্রনাথ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

৮

Rabindranath through Western Eyes : Dr. Aronson

ইউরোপের বিদগ্ধসমাজে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও সংবর্ধনা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ-সমাজের পরিচয়ের স্থত্রপাত ১৯১৩। যুদ্ধবিরতির পরে যখন রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমে যান, তখন তাঁর সহজ মানবধর্ম, ব্যক্তির কৈবল্যে বিশ্বাস এবং জীবনকে গ্রহণক্ষমতা অসংখ্য লোকের কাছে তাঁকে প্রিয় করে। রক্তপাতের পর ইউরোপের অনেক ক্লান্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত মন তাঁর আদর্শে শান্তি খোঁজে। রবীন্দ্রনাথ-সংবর্ধনার পিছনে আন্তরিকতা ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু আন্তরিকতা শেষ পর্যন্ত কাজের কথা নয়, আন্তরিকতার পিছনে নিরপেক্ষ সমালোচকের মানসিক ভারসাম্য না-থাকলে সেটা টেঁকসই হয় না। আবার অনেক কূটনীতিজ্ঞ রাজনৈতিক ভারতীয় রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের কর্মসিদ্ধি ও প্রচারপর্বের জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। ড. এ্যারনসন বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে পশ্চিমি-প্রতিক্রিয়া অবধারণ করলে পূর্ব ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও সংঘাত আমরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারব। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে সাধারণ লোক এবং অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তির কাছে 'বিশুদ্ধ' পূর্ব-সভ্যতার প্রতীক রূপে গণ্য হন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ও-দেশের সাধারণ লোকের ধারণা কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিচিত্র ছিল। যে-দেশের পথেঘাটে বাঘ, সিংহ ও সাপ নির্বিকারে ঘুরে বেড়ায় বলে বিশ্বাস, সে-দেশের মানস সম্বন্ধে কাল্পনিক ধারনা ও-দেশে স্বাভাবিক। তারো পরে যদি লোকে ভুলে যায় যে সভ্যতা গণ্ডি মানে না, ইংরেজ রাজত্বের ফলে বিশেষ করে ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিমের যোগাযোগ অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ, তাহলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি স্থবিচার আরো কঠিন হয়।

ড. অ্যারনসন তাঁর বইতে যে-সব তথ্যের সংকলন করেছেন এবং যে-দক্ষতা ও অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে তাদের বিশ্লেষণ ও বিচার করেছেন তার সম্যক পরিচয় এ-সমালোচনার সংকীর্ণ পরিসরে দেওয়া সম্ভবপর নয়। লেখক হিশেবে ডঃ অ্যারন-সনের প্রধান গুণ এই যে, তিনি তাঁর আলোচনা-প্রসঙ্গে আধুনিক জীবনের অনেক বিশ্বজনীন সমস্যার ইঙ্গিত করেছেন, যাদের সমাধানের উপরে ভবিষ্যৎ শান্তি ও সভ্যতা নির্ভর করে।

ড. অ্যারনসন তাঁর গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিচারের প্রয়াস মোটামুটি করেন নি। পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও ব্যক্তিত্ব বিচারের যে-উদ্যম হয়েছিল তার

হেতু ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতত্ত্ববিদের, তার গুণে তিনি সমরোত্তর ইউরোপীয় মনের একটি বিচিত্র ছবি আমাদের সামনে এনেছেন। যাঁরা পূর্ব-পশ্চিমের মিলনে বিশ্বাসী তাঁরা এ-বইতে মনের খোরাক পাবেন : কত আজগুবি সংকীর্ণতা ইউরোপের অনেকের মনে বদ্ধমূল তার পরিচয় পাবেন। সাহিত্য যে পলিটিক্স-নিরপেক্ষ নয়, তা ড. অ্যারনসন পাণ্ডিত্যের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু সমরোত্তর ইউরোপের রাজনীতির গোলকধাঁধার বর্ণনা করে তিনি শেষ পর্যন্ত বলেছেন যে পশ্চিমের যে-সব মনীষীরা বিশুদ্ধ কাব্যের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে যাচাই করেছেন তাঁরাই শেষ পর্যন্ত সত্যকার রবীন্দ্রনাথের মুখোমুখি হয়েছেন, যেমন ইয়েট্স, পাউণ্ড ইত্যাদি। আর যাঁরা রবীন্দ্রনাথের লেখায় ক্রিশ্চান কিংবা বৈদিকযুগের প্রতিনিধি খুঁজেছেন তাঁদের প্রয়াস পণ্ডশ্রম হয়েছে।

এ-বইয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ে লেখক জর্মানিতে রবীন্দ্রনাথের বিপুল সংবর্ধনা ও প্রতিপত্তির কারণের আলোচনা করেছেন। যুদ্ধের পর পরাজিত জর্মানিতে বুদ্ধি-বিরোধী যে-ভাবুকতা গড়ে উঠেছিল, তা সমসাময়িক অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তির কাছে অস্বাভাবিক এবং বিপদসূচক ঠেকেছিল। রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার পিছনে সাহিত্যপ্রীতি কতটা ছিল তা ড. অ্যারনসন সন্দেহ করেছেন। তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে যে-মনোভাব জর্মানিতে রবীন্দ্রনাথকে ঋষির পর্যায়ে তুলেছিল সেই মনোভাবের প্রতিক্রিয়াই শেষ পর্যন্ত নাৎসি পার্টির পুষ্টিসাধন করে। এবং তাঁর এ-সিদ্ধান্তের পিছনে যে ঐতিহাসিক সত্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিচারের অনেক অন্তরায় ছিল। এ-প্রসঙ্গে অ্যারনসন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-মনের উল্লেখ করেছেন। আমাদের দেশে ইংরেজিভাষা বহুদিন ধরে শিক্ষার বাহন বলে অনেক ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের রসাস্বাদনে সক্ষম হন, তাঁদের কাছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-মনের বিরোধিতা খুব বড়ো বাধা বলে ঠেকে না। কিন্তু যেহেতু ভারতবর্ষ ইংরেজের কলোনি, সেহেতু ইউরোপীয়দের কাছে উপরোক্ত বিরোধিতার বিঘ্ন সহজেই ঘটে। চীনে কবিতার ইংরেজি অনুবাদ যখন প্রথম বেরোয় তখন তার সমাদর সত্বর হয়েছিল, এবং সে-সমাদর এখনো কমে নি। অথচ ১৯২৫-এর পর ইউরোপে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপত্তি কমে এসেছে। ড. অ্যারণসন বলেন, প্রতিপত্তির পতনের মূলে রয়েছে ১৯৩০-এর পরে ইউরোপে 'positive faith'-এর অভাব। ১৯১৮-র তুলনায় কি ১৯৩০-এ positive faith ইউরোপে কমে এসেছিল? ইংলণ্ডের সাহিত্যে বরং positive faith-এর সন্ধান ১৯৩০-এর পরে স্পষ্ট। একদিকে ক্যাথলিক ধর্ম ও সঙ্ঘে বিশ্বাসী এলিয়ট, অন্যদিকে চীন ও স্পেনে ভ্রাম্যমান বামপন্থী কবি অডেন, দুজনেই কি আস্থাবান মনের প্রতীক নন? যে-সময় এডিংটন, জীন্স-প্রমুখ নব-বৈজ্ঞানিকদের জনপ্রিয়তা

বর্ধিষ্ণু এবং হাক্স্লির নায়ক জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে যৌগিক ধ্যানে প্রায় মুহ্যমান সে-সময় রবীন্দ্রনাথের প্রতিপত্তি ইউরোপে তো আরো বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল, কারণ ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে ও-দেশে নানারকম ধারণা এখনো আছে। কেন পেল না, সে-প্রশ্নের আলোচনা হয়ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে।

ড. অ্যারনসন ফ্রান্সে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার সমাদর এবং বাঙ্গা-ভ্রমণের অধ্যায় বাদ দিয়েছেন, তাতে বইটির অঙ্গহানি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েকটি আধুনিক ও পুরাতন কবির তুলনামূলক সমালোচনার আলোচনা তিনি একটি অধ্যায়ে করেছেন, সে-অধ্যায়টিও উল্লেখযোগ্য। স্থানাভাবে তার আলোচনা করা গেল না।

৯

মস্কোর চিঠি : শুভময় ঘোষ

আমরা প্রবীণরা তখন মস্কোয় রুশভাষাশিক্ষা নিয়ে বিশেষ বিচলিত ; বিদেশি ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়ে সপ্তাহে দুবার ক্লাস করি, সেখানে যা শিখি বাড়িতে ফিরতে ফিরতে ভুলে যাই, নতুন করে আবার পড়ি। ইংরেজি থেকে রুশ বই বাংলায় অনুবাদ করা কাজের কথা নয়। বেশিরভাগ রস তাতে মধ্যপথে উবে যায়। তাছাড়া ভাষা না-জানলে অন্যদেশকে জানা অসম্ভব এবং নিজের দেশের পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞের ভাব করে লিখে-যাওয়া অস্বস্তিকর। ধারণা ছিল রুশ ভাষা রপ্ত না-করে ওখানকার মানী গুণী লোকের সঙ্গে দেখা করা উচিত নয়—দোভাষী আর কত সাহায্য করতে পারে?

আচমকা একদিন দেশ পত্রিকায় দেখলাম শুভময় গালিনা উলানোভার সঙ্গে দেখা করে এসেছেন, কথাবার্তা চালিয়েছেন দোভাষীর মাধ্যমে। শুভময়ের কাছে ব্যালে-সংক্রান্ত যে-সব বই ছিল তাতে উলানোভা সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লেখা যেত। কিন্তু শুধু পড়ে বা ব্যালে দেখে উলানোভাকে চেনা যায় না, তাঁকে দেখা চাই একেবারে কাছ থেকে, ঘরোয়া পরিবেশে, তাঁর গলার স্বর শোনা চাই—এই ছিল শুভময়ের দৃষ্টিভঙ্গি, সে-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা তিনি কখনো করেন নি, সে-দৃষ্টিভঙ্গি 'মস্কোর চিঠি'র বেশিরভাগ লেখায় সহজ সরল-ভাবে স্পষ্ট। এলেম আমি নতুন দেশে—এই সহজ বিস্ময় আর সে-দেশকে জানার অক্লান্ত আগ্রহ শুভময়ের লেখায় ফুটে উঠেছে। এই আগ্রহ থাকলে ভাষার দেয়াল সহজে ভেঙে যায়।

নিজের জানার আগ্রহ শুভময় পাঠকদের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। অনেকে ধরে নেন, পাঠকরা তাদের মতো ব্যস্ত লোক। নিশ্চয়ই আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে নিজেরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন, অতএব উপর-উপর কিছু বিজ্ঞ মন্তব্য বা ইঙ্গিত করলেই যথেষ্ট। শুভময় পাঠককে নিমন্ত্রণ করে শুধু চাটনি পরিবেশন করে ক্ষান্ত হন নি—ভুরিভোজ না হোক, অন্তত ক্ষিধে মেটাবার খোরাক রেখেছেন।

'মস্কোর চিঠি'র আরো-একটা বিশেষগুণ যে লেখাগুলো কোনো মতবাদদুষ্ট নয়। শুভময় খোলা মন নিয়ে রাশিয়ায় যান। সে-সময়টা ছিল বিশেষ পরিবর্তনের যুগ। সাহিত্যে, শিল্পে, যন্ত্রশিল্পে, সামাজিক জীবনে আলোড়নের যুগ, যাকে অনেকে ক্রুশ্চেফের যুগ বলে থাকেন। রাশিয়ার দরজা তখন আস্তে আস্তে

খুলতে শুরু করেছে, কর্তাভজাদের কাল অতিক্রান্ত হতে চলেছে, মহাকাশ-যাত্রা শুরু হলো, আলু মাংস ফল রুটি বাজারে বেশি করে আসছে, মেয়েরা লিপস্টিক রুজ মাখলে লোকে নাক সিঁটকোয় না, বিদেশি বিশেষ করে অশ্বেত-বিদেশিদেব কাছে আনাগোনা, মেলামেশা মিলিৎসিয়ার অস্বস্তি ঘটায় না ; রাগী ছোকরা ইয়েভতুশেঙ্কো তখন কলম শানাচ্ছেন, তাঁর খ্যাতি বা কুখ্যাতি আসন্ন। এই সময় খোলা মন ও খোলা চোখে শুভময় রুশজীবনের নানাদিক দেখছেন এবং ঝরঝবে ভাষায় বর্ণনা কবছেন। যা খারাপ লেগেছে লিখতে দ্বিধা বোধ কবেন নি। রাজনীতি নিয়ে শুভময় বিশেষ মাথা ঘামান নি, সাহিত্যে শিল্পে রাজনীতিব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব সম্বন্ধে 'মস্কোর চিঠি'র লেখক সর্বদা সজাগ। অথচ বর্তমানের কোনো বিষয় লিখতে গিয়ে তিনি হঠাৎ অতীতেব এমন-কোনো উক্তি স্মবণ করেন যাতে সমস্ত বিষয়টি হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেমন 'ঘণ্টা বাজে ক্রেমলিনের' নাটক প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি এই সময়েই লেনিন এইচ. জি. ওয়েলসকে বলেছিলেন—'পৃথিবীর যুদ্ধ থামবে গ্রহ-গ্রহান্তবে যাত্রা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।'

কথাটা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক নয়। যা হোক, শুভময় সর্বদা ব্যালে বা সাহিত্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন না, তার প্রমাণ 'মুখেব ভাষা' নামক সুন্দর লেখাটি।

লেখাগুলো পড়তে পড়তে সেপ্টেম্বরের সেই সকালটি মনে পড়ে যেদিন শুভময়ের দেহান্তব হলো। সে-সব দিনের কথা মনে পড়ে যখন তিনি মস্কোর শীতে বা ক্ষণবসন্তে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আশা করি তাঁর 'মস্কোর ডায়েবি' অবিলম্বে প্রকাশিত হবে।

ADOLESCENT POEMS

AN EVENING AIR

I go out in the grey evening .
In the air the odour of flowers and the sounds of lamentation.

I go out into the hard loneliness of the barren field
in the grey evening
In the air the odour of flowers and the sounds of lamentation.

In the gathering darkness a long, swift train suddenly
Passes me like black lightning.
Hard and ponderous and loud are the wheels.
As ponderous as the darkness, and as beautiful.

I look on, enchanted, and listen to the sounds of lamentation
In the soft, fragrant air.
The long rails, grey-dark, smooth as a serpent, shiver, and
A soft, low thing cries out in the distance,
But the sounds are hard and heavy,
In the air the odour of flowers and the sounds of lamentation.

THE MARCH OF TIME

'Do you ever hear the March of Time ?'

At nightfall, wailing sounds come from the grey sea, and on
The horizon the steel-grey sky thickens. Then in the
Sleepless darkness I hear the tired footsteps of a buffalo
On a street of hard steel, under the blazing mid-day sun.

SPRING

Spring thunders over a mountain I cannot see.

Today, at the year's end, I stand on the border of the
yellow desert,
And with tired eyes look forward to *green flames* of corn
on a distant field.

THE LAST DITCH

Let us count our coins in this last ditch,
Let us catch something in the flood-waters
With the torn nets of our time.

Fields are flooded by rain water ;
Yet the bright, green trees struggle to the top and breathe.
Afternoon-light descends, bright gold to the eye,
And each day deathless beauty deepens in the clouds.

THE LAND OF MOHUAS

Sometimes the indolent sun paints on evening waters columns of light, bright as molten gold. And the grey foam on the dark waters takes on fire. In that luminous stillness the writhing breath of smoke hovers round our houses like a winter nightmare.

Far, far away from here is the land of *Mohuas*. There all the time the stately *Devadarus* shed their mysteries on the roads. The breath of the distant sea stirs the quiet loneliness of the nights. Let the *Mohua* flowers fall on my tired limbs, let their smell cover me.

Here in the intolerable, impenetrable darkness, at times I hear the deep loud sounds of the coalmines. Green and dew-wet is the morning when I see the disgrace of dust on tired bodies of men. What dim nightmare haunts their sleepless eyes ?

NEW YEAR RESOLUTION

Winter. Snow covers the distant mountain. Thick fog in the town, the grand soiree is over and I return homewards. Here and there at street-corners beggars light small fires with straw-heaps, and bake their evening bread. Where are the cottages ? A vast emptiness overhead, the northern wind sings fatal dirges.

And afterwards, what a terrible summer ! Masses of roses bloom and wither, genteel to the sight indeed. Happiness is scarce, but the days get long, and agonizing like an incurable sore. Gone are the times of feast ; around penniless, paralytic beggars hover the flies of memory.

The go-betweens die out. The starved unemployed, the worker and the beggar multiply as the days pass by. Files of red-faced soldiers march towards the wide gates of hell. What is this journey for, from one day to another, from one death to another ? What is the end of it ? A harrowing pestilence, a deathless hell ?

The sultry sky speaks after a long silence : Brave inheritors of ancestral selfishness, listen ! With what last straw will you build your homes now that an elemental flood sweeps across your world ? Tell me, who will light the spark of wisdom in this all-conquering darkness ?

Never to lose the sanctity of the individual self, is still the sustaining pride of the intellectuals. They do not dare disturb the universe. Worried spectators, perhaps they realise that business is low, dark is the bazzar, a sable silence reigns in the streets, the saints have all taken to flight and night-birds caper in the empty ways.

I return home, light a candle and ponder. Other darkness gather in this darkness. At this turning point of time where should I anchor my boat ? Blue eyes and firm breasts and the darkness of the thighs – but no, I have lost faith in the paradise of the senses, I know that poison begets poison, that the uncontrollable unworried bodily urge, because it leads to a new birth, repeats the cycle of birth and desire and death. What after all, are the body's raptures worth, if we do not strive for, and create, a new world ?

I have tried many ports in the storm and now I realise that where the people are there the sun of a new consciousness is born, another tide sets in the muddy waters of time, the many cross and recross the flood, while deep in the waters sinks the corpse of the one, the individual.

JANUARY 1937

Past days haunt the present.
Remember
The barren years left in the darkness behind,
Remember the innumerable famines
That answered the yearnings of time,
Sick with hunger keen as the hissing sounds
of a snake. In all this distraction of traffic
And tobacco-perfumes and
The enchantment of soft breasts
Do not forget the grey fields,
The howling deserts and the hard skeletons
Behind and in front of you.

NO ESCAPE

Harsh light fills the afternoon world.
Scared crows are winging their way homewards,
Autumn is imminent,
And death stalks.

A solitary banyan stands
Like an ancestral ghost.
Carve my name on the rocks,
Write my name on the waters.
My frantic heart seeks solitude—
The immensities of Tibetan solitude.

Dusk falls.
The bloodless face of the day is masked in dimness.
The hills darkly brood
As a thin mist spreads over the Santhal village,
And the crows duped by the false dawn
Caw and caw till all sound
Is merged in Time.

REVIEW AND ARTICLES

BENGALI POEMS : DHUSAR PANDULIPI

In our day the famous statement that the poetry of earth is never dead has become a paradox. Almost everywhere the earth is slowly dying, rotting, going to ruins. We have, for instance, in India not the growth but the ruin of the soil, and the sence of this ruin has almost entered our blood. Ruin and decay, the inherent melancholy of the soil, can be worked up into magni ficent poetry : To the poet, the poetry of earth seems undying, *Dhusar Pandulipi* repeats the paradox. This volume, beautifully bound and produced, places Jibanananda Das in the first rank of contemporary Bengali poets. His poems show an original power of expression and a keen insight into nature. All of them breathe pessimism, and a remote sadness. Jibanananda's poems appeal to the eye, his visual powers are extraordinary. He speaks in concrete images ; the rhythm is slow, rich and strange. He has been greatly influenced by the romantic poetry of the last century, the aesthetic melancholy of the eighteen-nineties, and in our day, by the earlier Yeats. To a considerable extent he is free from Tagore's influences, and his treatment of nature is unique in Bengali poetry. Some of the longer poems in *Dhusar Pandulipi* suffer from too much romanticism and diffuseness. But poems like 'Campe', 'Pakhira', 'Abasarer Gan', 'Sakun', are haunting and will have a permanent place in our literature.

Jibanananda Das looks at the world, to repeat our university-jargon, from a magic casement. The ceaseless struggle raging in the world does not touch him, but he can write memorable lines about the forlorn fairy-lands. His outlook on life, the 'Philosophy' embodied in his poetry will captivate people to whom poetry is a breath from the divine lips of beauty, a nightingale between an unseen heaven of bliss and our world of

dust. But there is something more than this in an enduring work of art, it also has a social content. And men who are sceptical about the flattering, poetic view of poetry will perhaps be irritated by the escape-formulla worked out in the last poem of *Dhusar Pandulipi*, the dream-cult and the rest of it. Today we are all bound upon a wheel of fire, and there is a stronger temper in the air. We cannot possibly step aside, and retreat to an ivory tower.

IN DEFENCE OF THE 'DECADENTS'

Certain critics point out with a sneer that 'Progress' is a Victorian word. Perhaps they are right: the Victorian belief in progress was based upon security and a rising level of production. Forebodings and uneasy apprehensions shadowed the late-Victorian period, because it was an age of finance unlike the early Victorian age of production. The relation between production and distribution is far less apparent in our age of finance, hence the sense of frustration marking the closing years of the last century. To the sceptical critics of progress it may be pointed out that though the present century has widened the gap between productive forces and social relations and to a certain extent justifies their enlightened scepticism, the latest powers of world prodution still permit a rational belief in progress. We find that the production power of man has still immense possibilities. So we are still for progress. It is not desirable in our day to reaffirm the medieval conception of human life, to declare that man's fate is inevitably tragic and all notions of progress an illusion. To assert this under the painful pressure of circumstances is a subterfuge, a means to shrink responsibility.

It is rather easy to talk about our belief in progress with reference to past history. But the moment we come to consider the present, to define the meaning of the progressive movement in literature, we seem to be in a melting pot, and confused voices of lamentation, denunciation and warning strike the ear. The modern Bengali poet is between two fires. If he tries to be honest with regard to the vices of his own class and voices his sense of decay, he falls under, and is found guilty of the charges of obscenity and obscurity. The eternal principles of art, he is told, are beauty and truth, truth and beauty, to deny which is

bad taste, a perversion. On the other hand he is told from the progressive quarter, which emphasizes his defeatism and obscurity, that he is a decadent and damned petty-bourgeois. The damning is thus complete. He then thinks of perhaps a dozen or so of his admirers and continues to use a medium of expression whose beauties commend themselves only to the dozen or so, with confusing results both for the moralist and the progressive critic. A gentleman, sceptical of the progressive demands on poetry, when politely told that he was a decadent bourgeois, retorted : "you can call me a swine if you like, but I am what I am."

It is certainly time to clear up a host of misunderstandings. A really progressive critic will be a great force today. But a certain notion is gaining ground, fanned by some of the progressives and by the newspapers which have their own sentimental ideas about literature, that to be progressive means to write about mazdoors and kisans in a broad, sentimental vein, to depict all the glories of a possible proletarian revolution and to do all these in a way which would be understood by the man in the street. Away with defeatism and all bourgeois subtleties of expression ! Nothing is more important than direct propaganda. It may be that the results will be slightly disappointing for some time, but all will be well in the future society.

The progressive who proceeds in this manner is not an objective critic. He is a sentimental humanist. We must not forget in our new-born enthusiasm for the cause that literature has a tradition of its own and that there are many invisible gaps between the economic basis and the cultural superstructure. If we consider the changes effected in Bengali poetry in the last fifteen years we must admit that it has definitelv 'progressed'. The best of it has almost got clear of that sickening vice bequeathed by the Tagorean tradition—sentimentalism. It has improved and made considerable changes in technique. From a loose and ineffective language to a highly polished and flexible one, from a mere turning loose of emotion to a consciousness of the disruptive forces threatening society,—these are consider-

able achievements. To sacrifice all these in order to widen the appeal and rouse the people by direct propaganda will be a dangerous sacrifice It will mean a swing backward in literary tradition and will revive the sentimental age in a changed garb. Such demands on poetry, backed by the newspapers and the progressives, will have dangerous consequences for the rising generation, which has every chance of being taken in by these easy methods of cheap and quick popularity. The critic who asks for such a literary change in the name of progress, we repeat, is at best a sentimental humanist.

What can be achieved if, in the immediate present, the Bengali poet tries to widen his appeal ? Mass-appeal is indeed a tremendous thing. It can at least help to fill up the empty pockets of the unfortunate writers. But how do the masses come in ? The vast majority of them is illiterate. The reading section consists entirely of the middle-classes. To appeal to them is to pander to the tastes of a demoralised class, to turn poetry into simple wish-fulfilment. Consider the plight of the Indian film-industry and the Radio, both of which are middle-class and popular. If the midde-class had any vitality left it would have at least created something significant during and after the Civil Disobedience Movement. But nothing of that kind happened, because at this late hour in history the colonial bourgeoisie has no life at all. With huge and vital sections of our population illiterate and dim in the background, we cannot really hope to effect a revolution with our writings. That would be putting the cart before the horse. We can at present only soliloquise, we cannot address the real audience.

To be really progressive in our time and in our country, where only a fraction is literate, is to preserve the integrity of what is good in our past tradition, to be true to oneself and at the same time to realise that poetry is a medium through which the individual tries to adjust his relations to society, to be conscious of the complex forces which are changing our world. To be able to preserve one's personal integrity as a poet will help the progressive cause in the long run. People consider Hopkins

and Eliot to be among the real pioneers of modern English poetry. And it will not be superfluous to remind that Eliot is often condemned for his obscurity, and is the one poet who is convinced to his bones of the decay of all civilisation. In these times of dereliction and dismay, of wars, unemployment and revolutions, the decayed side of things attracts us most. The boredom and the horror, rather than glory of life, is our immediate reality. Perhaps that is because we have our roots deep in the demoralised petty-bourgeoisie and lack the vitality of a rising class. It is best to admit this and write about the class you know well than to exult in the future glories of a classless society. Consciousness of decay is also power. We believe that mankind will undergo a far-reaching transformation in a classless society, that only in a changed social order, politically free, and based on emancipation and equality of the peasant and the worker, will it again be possible to establish the vital links between literature and the people which have snapped, but at present we find ourselves unable to translate that belief into good poetry. We cannot do that unless we act. In the meantime we draw a distinction between the poetry of revolutionary struggle and the poetry of revolution as a literary fashion.

Consciousness of decay is certainly a power. But a critical situation arises when we find that at a certain stage this also is not enough even from the point of view of poetic integrity. We will reach that stage very soon, and we must make a choice if we are to continue as living writers. This involves an entire reconstruction of our ways of living. An active part in the mass-movement will certainly help that poet who has been able to preserve his integrity. He will be able best to combine literary tradition with social content and will act as a releasing force. He will then perhaps cease to soliloquise and will begin to be representative. Such a reconstruction of living is not an easy job for the present generation of Bengali poets, most of them settled in life and approaching the critical age of thirty. It would have been easier with the Congress out of office, and an active body in the anti-imperialist front. But now the problem

is infinitely more complex in an atmosphere thick with sheepish pacifist slogans of truth and non-violence and all the accumulated rubbish of an out-of-date, constitutional nationalism. But no task is too difficult when it is a vital affair. If the modern Bengali writer fails to make this difficult choice, we can take leave of him and ask him not to mourn any longer for the decay of society but rather to mourn for himself.

ALIEN CORN

Bengali poetry today wears a deceptive look of health. A closer glance, however, dispels the first impression and the malnurition and loneliness of the Muse become apparent.

The isolation of the poet is not peculiar to Bengal alone, but here it has been deepened by a certain alienation from the idiom of his own language and life. The seeds were sown early last century, when Macaulay, supported by some great Bengalis of the time made English the medium of insturction.

The first impact with the West no doubt acted as a releasing influence : From Madhusudan to Rabindranath the progress of the Muse was triumphant. But a time came when the poet, cut off from the roots of his tradition by his infatuation with English, found himself in the predicament of the absentee landlord who ruins his purse and soul in the glittering city. Little did the eminent Bengali who urged his contemporaries to "speak and write English, to think English, and even to dream in English", visualize what a homeless creature the darling of his imagination would be, subservience to an alien tongue has created problems which it will take decades to solve.

The "futilitarians" began to feed the urgeney of a homecoming, of a rediscorery of tradition, in the thirties. It is a pity that one poet who had the capacity to combine logic with passion, tradition with modernity, and was the first to give Bengali verse an intellectual texture, soon came to a dead end. Another, who began writing a little later, moved through and survived several coteries, joking at their foibles, keeping his wits intact and his verses chiselled. Though obscure and highbrow, he was one of the few to attempt a working alliance with tradition, failing a merger.

The years before and during the World War II helped him to stake off some of his mannerisms and a shift towards clarity and simplicity of expression was noticeable. Like many those days, he came face to face with politics, so long out of bounds to poets, but now considered a way to communion with the people.

Both Clausewitz and Marx agree that everything is politics; but the absorption of Communist ideology into poetry is a difficult process. The period, after the first exhilaration beteween 1937 and 1942, was not helpful. On the one hand, abroad there was the heroic resistance to the German and Japanese hordes ; and on the other, at home, the brief, blind upsurge of 1942, the passive suffering of the famine, the frenzy of rioting, and partition. Middle-class poets who had accepted Communism as mere dogma, slurred over the complexities of the situation and the contradiction of their class : many deceived themselves into believing that they had been declassed, and atempted to wield their pens like swords for the cause of the proletariat. They went into a wilderness, their voices loud, their emotions choked by doctrinaire jargon. Others did not rattle their pens like sabres, but they too blinked facts and lulled themselves into a vague humanism, the implicit motto of which seemed to be that since Stalin is in Russia, everything will be all right with the world in the long run.

The highbrow poet who had veered towards the Red Star followed the second course. His faith became in time a cover for rambling emotions and loose syntax. He has gradually retreated into a Universe in the blue twilight of which mountains aspire to the sky, rivers meander into the sea, the poet moves towards his Love, and Man towards a classless society. He has come out of hell, he says : by a trick of intuition he sees light even at murky midnight. Those who have been denied his magic powers will envy him his shortcut to socialism without tears, which by the way, has a distinct Gandhian flavour.

The centre of the literary scene is now occupied by the peace-partisans. The doves which inspire their imagination would be

heartening indeed but for the insipid verse they have so far inspired, except for one or two noteworthy exception. They do not look like the doves we know. For this, of course, the peace-birds are not to blame but the poets, who seem more familiar with parrots.

Another disturbing symptom is the sectarianism of the young militants. They have their own pets whom they boost to the total exclusion of others not beleoging to their group. The militants cultivate myopia so far as literary tradition is concerned, and since theirs is the loudest voice and the widest audience, a time may come when most of our heritage will be treated with contempt and thrown into the "dustbin of history" as Tagore was in 1949.

In despair one sometimes turns to men in the corner who still swear by "pure poetry" and shudder at politics. The Muse seems to have deserted them to. Their obsession with fragments of adolescent experience, with a look from a woman or a lock of her hair, is pathetic, and their aversion to politics is almost pathological.

The overall picture, then, is bleak, but it would be wrong to assume that no memorable poems have been written in the last few years. There have been several, mostly by the Left-wingers. These poems, however, have been like tentative roosters at false dawn, or like flashes on a sultry day without promise of rain. There are no signs yet of a rebirth.

And the future is likely to be harsher still. With rising prices, crowded rooms, adulteration of food and moral values, shortage of everything except speeches, the next generation is doomed to general inertia of body and mind, and unless there is the miracle of a breakthrough, the songsters will have a hard time of it.

Among immediate issues are wheat and Hindi. Will the grambling housewives be able to balance their rice-diet with wheat, and Hindi help Bengali poets to shed their superior airs and cultivate the mushaira-habit and thus get to know their audience better ? Or will Hindi—the future key to a good job in the secrataríat—lure them to neglect their own language ?

THE STILL CENTRE

The first time I met Bishnu Dey was in 1936. The visit left mixed impressions. He looked a sick man, with his nose and eyes, so remarkable when he is normal, having almost a Mephistophelian glamour. He was then the victim of some chronic stomach trouble and undergoing ayurvedic treatment.

The manner of his speaking was caustic. He is not a talkative person. That made the few barbed things he said about men and their follies—some of which had seemed virtues to me—even more pointed. Here was a poet whose Urvashi, Artemis, Ophelia and Cressida broke through with restrainted lyrical beauty in his verses, talking with the deatched cynicism of an outsider. I felt rather uncomfortable—the more so because I was used to moving among men to whom spontaniety and emotion, at least in theory, were most essential ingredients of a creative writer.

The first impression is something, if not all. The very fact that it has been retained so long shows that it was not all deceptive. But as far as first impressions go, the character of the recipient is also important. It may be that a not too mature young man had met a writer of a turn of mind he was not used to. But others who have met Bishnu Dey have also remaked on one thing—his detachment from and also his impish involvement in the lives and foibles of the people around him. Perhaps Bishnu Dey had much greater capabilities for satire than he utilised in the thirties and which he left on the road-side during his journey via his own Marxism of humanism to the Still Centre.

The first visit was followed by many others and the warmth of the poet came out. It was in his room later that we saw the

manuscript of Sudhin Datta's *Krandasi*. Bishnu Dey read out some of the more remarkable poems and the impression this writer still retains. Was it in this room that we also heard *Chorabali* ? Bishnu Dey avoids the high-strung, high-pitched manner of recitation which is still very much in vogue. (just listen to the L.P. "Poetry Bengal".) He would try to read poetry almost like prose. That again showed the man.

In fact in those days he and some of his friends presented a different picture of the function of poets. They were not men so drunk with the mystery of life, nature and women that poetry gushed out. Poetry required discipline as well as inspiration. It was part of a many-faceted tradition and demanded knowledge of philosophy, music and painting, both Indian and Western — acquaintance with Abdul Karim Khan, Jamini Roy, Bach and Beethoven — and later Marx and Lenin as well as Freud. Rabidranath and Shelly were not enough. Writers in English were not enough, one had to know something about the French symbolists, Rilke and some of the Russians. One had to go deep into Sanskrit literature. In fact the delicate handmade gramophone (EMG) with the rather big, funny-looking horn was part of the discipline and inspiration of poets. But how many Indians can undertake the wearisome task of combining passion with reason ?

My conception of a poet till then was connected with the *Kallol-Kalikalam* group, some of whom I had seen and admired from a distance in my childhood adolescence : the poet ought to have a distracted look ; he ought to have his punjabi (kurta) slit somewhere : it would be better if he had TB ; he should also visit whorehouses to enrich his experiences. From this world to that of the *Parichaya* group was indeed a very big leap. And we should not forget that it was in *Paicrhaya* that some of the earliest discussions on Marxism appeared. Other winds were stirring. In later days perhaps young poets substituted faith in politics for reason though there should not be any contradiction between the two.

It would be impudent of me to write about the poetry of

Bishnu Dey as a whole. He must be a very big poet, but the trouble is I have been out of touch with poetry for the last 24 years. Alas ! it no longer rings a bell in me. When I am forced to look up some of my own stuff, weariness and boredom overtake me. But even before I gave up the pursuit of poetry, one thing about Bishnu Dey intrigued me. How come he arrived so soon at the Still Centre ? The almost eternal verities, the beauty of man and nature, the beauty of even our arduous, heroic and dirty political struggle, come out in his poems. We know that we shall overcome in the long run, but how does he manage to look so serene even in the short run where everything is so ruffled and messy ? One wishes at times that Bishnu Dey returned to his old flair for satire on men, women and manners—and politics. An old, tortured, yet serene man once wrote about a being who was a soul in bliss while another was bound upon a wheel of fire which his own tears scalded like molten lead. How can Bishnu Dey, like a soul in bliss, sing with so much poise about the people while they are bound upon a wheel of fire ?

টুকরো কবিতাগান : অন্যভাষা থেকে

১

ইজ্‌মাইলভো গ্রাম থেকে
প্রভুর শখের বাগান থেকে,
ঝলমলে-চোখ বাজপাখিটা পালাল একদিন,
কিছুক্ষণ পরেই ঘোড়ায় চেপে এল এক তরুণ শিকারি,
হাতছানি দিয়ে ঝলমলে-চোখ পাখিটাকে ডেকে বলল :
'আয়, আমার ডানহাতে আয়,
কেননা তুই না এলে ক্রিশ্চান জার
আমাকে দেবে ফাঁসি।'

ঝলমলে-চোখ পাখিটা জবাব দিল :
'সোনার খাঁচায় কী করে আমাকে রাখতে হয় জানতে না তুমি,
জানতে না কী করে ডানহাতে রাখতে হয়।
এখন আমি যাচ্ছি নীল সমুদ্রে,
সেখানে নিজের জন্য মারব রাজহাঁস একটা,
পেট পুরে খাব রাজহাঁসের মিষ্টি মাংস।'

[লুকাশ্‌কার গান। লেভ তলস্তয়ের 'কসাক' থেকে]

২

আ, দি, দি, দি, দি, দি, লি,
কোথায় তাকে দেখলে ?
বাজারের দোকানে,
পিন বেচছিল সে।

[এরশ্‌কার গান। লেভ তলস্তয়ের 'কসাক' থেকে]

৩

সোমবারে পড়লাম গভীর প্রেমে,
মঙ্গলবার সারাদিন কাটল হা-হুতাশে,

বুধবারে তাকে জানালাম পীরিতির কথা,
বৃহস্পতি কাটল উত্তরের প্রত্যাশায়,
শুক্রবার এল সেটা, বেশ দেরিতে,
আর-কোনো আশা রইল না আমার।
নিজের জান নেব, শনিবার ঠিক করলাম,
কিন্তু মোক্ষের খাতিরে
মত বদলালাম রবিবার সকালে।

[এরশ্‌কার গান। লেভ তলস্তয়ের 'কসাক' থেকে]

৪

তোমাকে করব চুম্বন আর আলিঙ্গন,
লাল ফিতেয় সাজাব তোমাকে
ডাকব তোমাকে মাথার মণি বলে।
এখন বলো তো মণি,
সত্যিই কি আমাকে ভালোবাসো ?

[এরশ্‌কার গান। লেভ তলস্তয়ের 'কসাক' থেকে]

৫

বনের ওপার থেকে, অন্ধকার অরণ্য থেকে,
সবুজ আর ছায়াচ্ছন্ন বাগান থেকে এল,
এল দুটি ফুর্তিবাজ ছোকরা,
নির্ভীক, চট্‌পটে দুটো ছোকরা,
বিয়ে করে নি কেউই তারা।
তারা হাঁটছে তো হাঁটছে, তারপর থামল দুজনেই।
দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ঝগড়া হলো শুরু।
তখন এল একটি কুমারী, এসে বলল,
'শীগগিরই তোমাদের একজন পাবে আমাকে,'
ফর্সা-মুখ যে ছোকরার, মেয়েটি তারি হলো
সোনালি চুলওয়ালা ফর্সা-মুখ ছোকরার হলো সে।
মেয়েটির ডানহাত নিল সে নিজের হাতে,
চারিদিকে ঘোরাল তাকে, যাতে দোস্তরা দেখতে পায়,
আর বলল, 'তোমরা কেউ কখনো দেখেছ,
আমার ছোট্ট কনের মতো টুকটুকে মেয়ে ?'

[একটি মেয়ের গান। লেভ তলস্তয়ের 'কসাক' থেকে]

৬

বাগান পেরিয়ে, বাগান পেরিয়ে
হাঁটতে হাঁটতে এল এক ছোকরা,
এল রাস্তা ধরে, শহরের মধ্য দিয়ে,
প্রথমে যাবার সময় ডানহাত নাড়াল সে.
আবার যখন গেল,
নাড়াল সিল্কের ফিতে-বাঁধা টুপিটা।
কিন্তু তৃতীয়বার সেই যে এল আর যাবার নাম নেই,
রইল দাঁড়িয়ে।
গেল না সে, নিজেকে আরো ছিমছাম করল।
'তোমায় নিন্দে করার জন্য
এখানে আসতে চেয়েছি :
কেন তুমি, মণি বেড়াতে
গেলে না বাগানে ?
এবার আমাকে বলো তো মণি,
তুমি কি আমাকে ঘৃণা কর ?
পরে যখন এই কথাটি মনে পড়বে
আফশোসের সীমা আর থাকবে না তখন।
আমি পাঠাব ঘটক তোমার বাড়িতে,
বিয়ে যখন হবে আমাদের,
আমার জন্য কাঁদতে হবে তোমাকে তখন।'
কী বলব জানলেও
সাহস হলো না ওকে না বলতে,
না, প্রত্যাখ্যান করার সাহস হলো না।
বাগানে গেলাম বেড়াতে,
গেলাম ওর সঙ্গে দেখা করতে,
সেখানে মিললাম ওর সঙ্গে।
নত হয়ে অভিবাদন জানাচ্ছি,
রুমালটা পড়ল মাটিতে।
ও তুলল সেটা,
'তোমার ফর্শা হাতে নাও এটা,
আমার হাত থেকে নাও এটা মণি,
বলো ভালোবাসো আমাকে,

তোমাকে কী দেব মণি মোটেই জানি না,
সেই ভয় আমার।
মনে হয় তোমাকে দেব একটা শাল,
তার বদলে নেব পাঁচটা চুমু।'

[মেয়েদেব গান। লেভ তলস্তযেব 'কসাক' থেকে]

৭

—বিদ্রোহী সে চায় ঝড়দুর্যোগ
যেন শান্তি পাবে ঝড়ে!

[লেবমন্তভেব কবিতাব অংশ—লেভ তলস্তয়ের 'সুখেব সংসাব' থেকে]

৮

গাইল কোকিল সাবাবাগান,
পাপের, সর্বনাশেব গান—
সে গানে কেবল পোড়ায মন
সারারাত ঘুম না জানে নয়ন

[ইভান বুনিনের সুখদল' থেকে]

৯

উইলো আমি পুঁতেছিলাম জলের কিনারে
কুলুকুলু গভীর নদীর পারে,—
. . ..
নেই কো আমার
মনের মানুষ
ভালোবেসেছি যাকে···

[ইভান বুনিনের 'সুখদল' থেকে]

১০

ভালোবেসে তোমায় স্বপ্ন দেখেছি তাদের
স্বপ্নিল যারা ভালোবেসেছিল হেথা—
ঘুরেছি বাগানে তারার আলোকে, যেথা,
শতাব্দী আগে আলোকিত মুখ যাদের···

[ইভান বুনিনেব 'শেষ দেখা' থেকে]

১১
আঁধিতে উঠল আঁধিয়ার
হাট করে খোলে কপাট—
হাট করে খোলে কপাট,
তুষারকণায় ঢেকে গেল পথঘাট
[ইভান বুনিনের 'আপেলের সৌরভ' থেকে]

১২
ঘোড়াব খুবেব শব্দ। ধূ ধূ চারিদিক
স্‌ভেৎলানার চোখে শুধু শূন্য স্তেপ…
[ভাসিলি জুকোভ্‌স্কির 'স্‌ভেৎলানা' গাথার অংশ। ইভান বনিনের 'লিকা' থেকে]

১৩
আমার হৃদয়কে নিয়ে যাও দূরে,
যেখানে পাহাড় ও বনের উপরে
চাঁদের মতো বসে আছে বিষণ্ণতা !
[আফানাসি আফানাসিয়েভিচ ফেত্‌-এর কবিতার অংশ। ইভান বুনিনের 'লিকা' থেকে]

১৪
পথ চোখে পড়ে না আর হায় !
আবার বরফে ঢেকেছে পথ,
আবার বরফের স্তূপে চলেছে ধীরে
রুপালি পিচ্ছিল সাপ…
[ফেত্‌-এর কবিতার অংশ। ইভান বুনিনের 'লিকা' থেকে]

১৫
শ্লেজের ঢাকুনির নিচে
হিমকঠিন রাত্রির ঘোলাটে দৃষ্টি…
পাহাড় ও বনের ওপারে, ধোঁয়াটে মেঘের মাঝখানে
চাঁদের বঙ্কিমরেখার ঝিকিমিকি…
[ইয়াকভ পেত্রোভিচ পলোন্‌স্কির কবিতার অংশ। ইভান বুনিনের 'লিকা' থেকে]

১৬

মেঘের ফাঁকে উঠল সূর্য, দীপ্ত নবীন,
বালুতে আঁকলে ঝকঝকে আঁকাবাঁকা রেখা

[ফেত্-এর কবিতার অংশ। ইভান বুনিনের 'লিকা' থেকে]

১৭

সুদূর গভীর বনে মধ্যরাত্রি নামল,
তুষারঝড়ের হুংকার,
ঘরে আগুনের ধারে আমরা মুখোমুখি বসে
আগুনে ডাল পোড়ার শব্দ...

[ফেত্-এর কবিতার অংশ। ইভান বুনিনের 'লিকা' থেকে]

১৮

যাতনায় পাক খেয়ে হাহাকারে
কাঁদে পাখি সন্তানের তরে,
স্তেপের উপরে হাওয়ার উত্তরীয়
দীপ্ত সূর্য মধ্যাকাশে ·

[শেভ্চেনকোর কবিতার অংশ। ইভান বুনিনের 'লিকা' থেকে]

১৯

পাহাড়ের গায়ে ফসল কাটছে চাষিরা

নিচে, পাহাড়ের নিচে,
ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে
বীর কসাকেরা।

.. ..

কী চাই তোমার
হে বিচিত্র বীর কসাক,
কনে, না তামাকের পাইপ

বৌয়ের ঝামেলা
সইবে না।
তবে তামাক আর পাইপ

দূরযাত্রায় কসাকের
কাজে লাগবে !

[ইভান বুনিনের 'লিকা' থেকে]

২০

ভীত, নিঃসঙ্গতাব এই গহনে
আমাদের গরিবখানায়
বুক ভবে নিই মুক্ত মাঠের নিঃশ্বাস,
স্বাদ পাই শান্তিভরা আনন্দের…

[ইভান বুনিনেব 'লিকা' থেকে]

২১

চারদিকে ফোটে বুনো গোলাপের ঝাঁক,
বীথিতে লাইম বৃক্ষের ঘন ছায়া…

[নিকোলাই ওগাবিওভের কবিতার অংশ। ইভান বুনিনের 'ছায়াবীথি' থেকে]

২২

অনেক, অনেক উঁচুতে পাহাড়েব গায়ে নুয়েছে
ধানকাটুরেরা, পাকা ধান কাটছে,
আর নিচে, অনেক নিচে, সবুজ পাহাড়ের গায়ে
ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে কসাকেরা
ঘোডায় চডে যাচ্ছে কসাকেরা ।
… .. … …
সবায়ের আগে দরশেঙ্কো নিজে, ওদের নিয়ে যাচ্ছে,
নিজের কসাক সৈন্যদের নিয়ে যাচ্ছে,
নির্ভীক, স্বচ্ছন্দভাবে নিয়ে যাচ্ছে ।

[ভ্লাদিমির করলেঙ্কোর 'অন্ধ সুরকার' থেকে]

২৩

বন্ধুর পাহাড়চূড়ায়
শোনো ঈগলের তীক্ষ্ণ চিৎকার,

দেখো, ওরা উড়ছে, ডানা মেলে আসছে
ছোঁ মেরে নামছে শিকারের সন্ধানে

[ভ্লাদিমির করলেঙ্কোর 'অন্ধ স্থরকার' থেকে]

২৪

স্মরণে রেখো অন্তিম মুহূর্তের কথা,
শেষবিচাবের দিন মনে বেখো,
ভুলো না একদিন জীবন শেষ হবেই,
নরকের আগুনের কথা স্মরণে বেখো।

[ভ্লাদিমিব করলেঙ্কোব 'অন্ধ স্থবকার' থেকে]

২৫

কাজ নেই বাবুপনায়
লেগে যাও লোকসেবায় :
পকেটে কিছু এলে
লোকের মুখে হাসি খেলে।

[মাক্সিম গোর্কির 'বুড়ো' থেকে]

২৬

বন্ধু, দুষো না আমায় বাচালতাব জন্য,
তার পিছনে দুঃখ লুকোই,
লুকোই তোমাব জন্যে।

[ভ্লাসের কবিতা। মাক্সিম গোর্কির 'মরস্থমি লোক' থেকে]

২৭

আল্পসের তুঙ্গশিখর আচ্ছাদিত তুষাবেব অনন্ত আবরণে, চারিদিকে হিম স্তব্ধতার রাজত্ব, গরীয়ান মহাশূন্য থেকে ভেসে-আসা প্রজ্ঞাব স্তব্ধতা।

পর্বতশিখরের ঊর্ধ্বে আকাশের শেষহীন মরুভূমি, বরফের ঊর্ধ্বে অগণন নক্ষত্রের বিষণ্ণ দ্যুতি।

পাহাড়ের পাদদেশে, পৃথিবীর সংকীর্ণ সমতলভূমিতে চঞ্চল অস্থির জীবনের বিস্তার দিনের পর দিন, আর সমতলভূমির শ্রান্ত মালিক যে মানুষ সে দুঃখের চাপে মুহ্যমান।

পৃথিবীর গহ্বর থেকে উৎসৃত হাসিকান্নার শব্দ, ক্রোধের উন্মত্ত চিৎকার, প্রেমের গুঞ্জন—জীবনের কঠোর, বহুতান সংগীত! কিন্তু পাহাড়ের শিখরে স্তব্ধতা, নক্ষত্রেরা নির্বিকার, মানুষের আর্তনাদে কর্ণপাত তারা করে না।

আল্‌পসের তুঙ্গশিখর আচ্ছাদিত তুষারের অনন্ত আবরণে, চারিদিকে হিম স্তব্ধতার রাজত্ব, গরীয়ান মহাশূন্য থেকে ভেসে-আসা প্রজ্ঞার স্তব্ধতা।

কিন্তু যেন পৃথিবীর যন্ত্রণা আর ক্লান্ত মানুষের অশান্তির কাহিনী বলতে, চুপিচুপি জানাতে হিমবাহের পাদদেশে, অনন্ত স্তব্ধতার দেশে ফুটল বিষণ্ণ পাহাড়ি ফুল এডেলভিস।

আকাশের সীমাহীন মরুভূমিতে গর্বিত সূর্য মৌনলোকে ভাসে, নির্বাক চাঁদ করুণ আলো পাঠায়, চেয়ে থাকে উৎকণ্ঠিত তারার দল ··

আর দিনের পর দিন শূন্য থেকে নামে নিঃশব্দতার হিম আবরণ, ধীরে ধীরে ঢেকে দেয় নিঃসঙ্গ ফুলটিকে, এডেলভিসকে—

[কালেরিয়ার গদ্যকবিতা 'এডেলভিস'। মাক্সিম গোর্কির 'মরসুমি লোক' থেকে]

২৮

হায়রে হায়, পোলাও আর মাংস
বড়োলোকের খাদ্য,
দুঃখী ভ্লাস দেবেই তাদের ছেড়ে
এই তো প্রতিপাদ্য।

[ভ্লাসের কবিতা। মাক্সিম গোর্কির 'মরসুমি লোক' থেকে]

২৯

ছোটোখাটো জিনিশে অরুচি,
মহান মানুষ কিনা,
বিরাট জিনিশে করি তাক
বামন হয়ে চাঁদে হাত।

[ভ্লাসের কবিতা। মাক্সিম গোর্কির 'মরসুমি লোক' থেকে]

৩০

জলন্ত জলে ডোবে
ক্লান্ত দিন···

নীল আকাশ অন্ধকার
ছায়া সব ক্ষীণ…
[ইউলিয়া ফিলিপভনার গান। মাক্সিম গোর্কির 'মরসুমি লোক' থেকে]

৩১
মা মণি, মা মণি লক্ষ্মীটি,
দেখলে আমায় কাঁদতে.
কেউ তো নেই, মা মণি,
আমার তো এই খাটুনি…
[ভারভারা মিখাইলভনার বলা ধোপানিদের গান। মাক্সিম গোর্কির 'মরসুমি লোক' থেকে]

৩২
পাণ্ডুর পূত বরফকুচি
উড়ে উড়ে পড়ছে
হিম কুঞ্জ থেকে হেমন্তের হাওয়ায় উৎক্ষিপ্ত
ঝরা ছোটো ফুলের মতো।

আলতোভাবে তারা জমছে
রুগ্‌ণ পৃথিবীর গায়ে চাদর যেন,
নবজাতের মতো নিষ্পাপ শুভ্রতায় ঢাকছে
পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত।

ঝোপঝাড় আর গাছ নিষ্প্রাণ,
দিনরাত্রির সাড়া নেই কোনো,
শীতে জমাট মহাশূন্য থেকে
নিঃশব্দে পড়ছে পাণ্ডুর বরফকুচি।
[কালেরিয়ার কবিতা। মাক্সিম গোর্কির 'মরসুমি লোক' থেকে]

৩৩
ছিচকাঁদুনে ক্ষুদে যত লোক
ভরে উঠে ঝড়ঝাপ্‌টায়

জীবনকে এড়াবার ধান্দায়
ঘোরে ছুনিয়ায়।

বিরস কাপুরুষ, মিথ্যাচারী লোক,
বুক ভরা শুধু ছিচকাঁদুনিতে,
তারা ভাবে স্বখ পাবে মাগনায়,
চায় তারা আরাম, তৃপ্তি, বিশ্রাম।

গালভরা ফাঁকা নানা বুলি,
চুরিকরা অসার চিন্তা,
ছিচকাঁদুনে ক্ষুদে যত লোক
জীবনের কিনারায় আস্তে আস্তে গুঁড়ি মারছে তারা।
[ভ্লাসের কবিতা। মাক্সিম গোর্কির 'মরস্থমি লোক' থেকে]

৩৪
শুকনো ঘাস আর গোবর আর ভাঙা ডাল কুড়িয়ে,
জড়ো করো গুছিয়ে,
পাথরে পাথর ঠোকো, দুটি প্রাণের অধীশ্বরী হে নারী!
জ্বালাও চকমকি, জ্বলে উঠবে আগুন।
পাশে বসে আগুনের, হাত রাখো উত্তাপে।
লেলিহান অগ্নিশিখার ও-দিকে বসে আছে তোমার স্বামী।
নক্ষত্রগামী ধোঁয়ার মধ্য থেকে
পুরুষের চোখ চেয়ে আছে তোমার জঠরের অন্ধকারে,
তোমার অন্তরের গভীরে।
চোখ তার তারার চেয়ে দীপ্ত, উষ্ণ আগুনের চেয়ে,
চা'র জ্বলন্ত চোখের চেয়ে দুঃসাহসী।
জেনে রেখো, সূর্য পরিণত হবে অঙ্গারে,
আকাশ থেকে খসে পড়বে তারা,
পৃথিবীর উপর আর জ্বলবে না অশুভ তালৎসেৎল,—
কিন্তু তুমি, নারী, মৃত্যুহীন আগুনের পাশে বোসো,
হাত মেলে দাও অগ্নিশিখার কাছে,
কান পেতে শোনো তাদের কণ্ঠস্বর যারা এখনো জন্মায় নি,
তোমার জঠরের অন্ধকারে শোনো তাদের কণ্ঠস্বর।
[আএলিতার গান। আলেক্সেই তলস্তয়ের 'আএলিতা' থেকে]

৩৫

ঝকঝকে ছাদের নিচে
লোহার থামের তলায়
পাথরবাটি থেকে
ওঠে খাভ্‌রার ধুম।
কী আনন্দ, কী আনন্দ আমাদের!
হাতে দাও আমাদের খাভ্‌রার বাটি!
আই-ইয়াই! আমরা আর ফিরব না
খনিতে, পাথরঘাটায়,
ফিরব না আর
অন্ধকার মুমূর্ষু গলিঘুঁজিতে,
ফিরব না যন্ত্রে, যন্ত্রে ফিরব না!
আমরা চাই বাঁচতে, আই-ইয়াই! চাই বাঁচতে!
হাতে দাও আমাদের খাভ্‌রাব বাটি!
[বিদ্রোহীদের গান। আলেক্সেই তলস্তয়ের 'আএলিতা' থেকে]

৩৬

বিষণ্ণ রাত্রির শেষে
তার অন্ধকার ডানায় চেপে আসে দিন
গোলাপি হাসি মুখে, বেজায় ফুর্তিতে।
দোস্ত, এই তো হলো জীবন...

নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ রাত্রি না-থাকলে
ভোরের আনন্দ আশীর্বাদ জানত না মানুষ.
দোস্ত, এই তো হলো জীবন···
... ...
কে জানে দুঃখের মধ্যে
জীবন কেন হাসে?
আর যন্ত্রণা পায়
আনন্দের মধ্যে?
... ...
আগুন-ফুল যিনি বানান
তিনি গোপন বিষে সেটা ভরান,

সুন্দর হবে বলে, ভেবে দেখো,
সমস্ত সুন্দর জিনিশে কিছু-না-কিছু বিষ আছে।
বেপরোয়া হাসিতে অশ্রুজলের স্বাদ,
হাসি-কান্নার মিশেল না-হলে
জীবনে থাকবে না কোনো সৌন্দর্য···

[মুন্সি বুরহানের গান। দেরেনিক দেমিরচানের 'চার্গাই' থেকে]

৩৭

মরুভূমিতে জীবন আসে উটের দৌলতে।
কিন্তু উট আর জীবন কি এক নয়?
তা না-হলে মানুষের গড়া শহর ও গ্রাম
অবলুপ্ত হতো বালির জোয়ারে।

[মুন্সি বুরহানের গান। দেরেনিক দেমিরচানের 'চার্গাই' থেকে]

৩৮

···নিঃসঙ্গ 'ওকের পাশে যাওয়া
অ্যাসগাছটির কপালে নেই।
বেচারিকে বুঝি চিরকাল
দুলতে হবে একা একা···

[ভারিয়ার গাওয়া প্রাচীন গান। বরিস পলেভয়ের 'মানুষের মতো মানুষ' থেকে]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ

অনেকদিন পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ বেরুল ; সে-জন্য কবির কাছে বাঙ্গালি পাঠকেরা কৃতজ্ঞ হবেন। তিনি লেখেন কম এবং বিভিন্ন পত্রিকার পাতার মাঝে-মাঝে আকস্মিকভাবে তাঁর কবিতা চোখে পড়ে। 'প্রথমা'র অনুরাগীরা অনেকদিন ধরে এই বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলির সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। 'প্রথমা'র অনুরাগী বলতে অবশ্য বাঙ্গালি পাঠকদের একটা বিশেষ গোষ্ঠী বোঝায় না, যেটা হয়ত আধুনিক কবির কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে সহজেই বোঝাতে পারে। কারণ, আধুনিক কবিতার অনুরাগীদের সংখ্যা যদিও নগণ্য, তবুও তাঁদের কাব্যানুমোদন প্রায়ই গোষ্ঠীগত—এবং এক গোষ্ঠীর কাছে আরেক গোষ্ঠীর কবিতা অনেক সময় শুধু বিজাতীয় নয়, বর্বর। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র বোধহয় এ-মনোভাবের একমাত্র ব্যতিক্রম। তিনি 'আধুনিক' অথচ তাঁর ভক্ত সংখ্যা কোনো-এক বিশেষশ্রেণীর পাঠকদের মধ্যে আবদ্ধ নয়। তাঁর কবিতা সর্বজনপ্রিয়। এমনকী ভাবের বা কালের দিক থেকে যাঁদের 'আধুনিক' আখ্যা দেওয়া হয় না, তাঁরাও শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতি বিদ্বেষী তো ননই, অনেকেই পক্ষপাতী। ফলে আধুনিকদের মধ্যে বরাবর তিনি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে এসেছেন ; অন্যান্য আধুনিক-দের মতো তিনি বহু পাঠক ও সমালোচকের বিরাগ বা কটুব্যঙ্গভাজন হন নি।

ভাবের দিক থেকে এর কারণ বোধহয় পীড়িতদের সম্বন্ধে তাঁর স্বভাবজ সহানুভূতি এবং আঙ্গিকের দিক থেকে তাঁর নিজস্ব কমনীয় ও ভাবালু ছন্দ—যা পুরাতনকে অস্বীকারও করে না, মানেও না পুরোপুরি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা' সম্বন্ধে এ-মন্তব্য খুবই স্পষ্ট। 'প্রথমা' মোটের উপরে রবীন্দ্রঐতিহ্য সরল অথচ নিজস্বভাবে বহন করে। রবীন্দ্রনাথে যে-মানবধর্মে বিশ্বাস পাওয়া যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র 'প্রথমা'য় তার যোগসূত্র মেনে চলেছেন যেন।

> অগ্নিআখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম
> চেন কি তাদের ভাই !
> দুই তুরঙ্গ জীবন মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম,
> দুয়েরি বল্গা নাই !
> পৃথিবী বিশাল তারা জানিয়াছে, আকাশের সীমা নাই
> ঘরের দেয়াল তাই ফেটে চৌচির ;

প্রভঞ্জনের বিজলি মনের দোলা লেগে নাচে ভাই,
তাদের হৃদয়-সমুদ্র অস্থির।

(প্রথমা)

পীড়িতদের সম্বন্ধে তাঁর সরল সহানুভূতি আরো স্পষ্ট হয়েছে—

আমি কবি কত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের
মুটে মজুরের
আমি কবি কত ইতরের।

(প্রথমা)

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে-মানবধর্মে বিশ্বাস ছিল বণিক-সভ্যতার সূত্রপাতের ছায়া তাতে চোখে পড়ে, কারণ এ-মানবধর্ম অভিজাতিক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনির্ভর—ফ্রান্সিস বেকনের মতো। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর পারিপার্শ্বিকে ক্ষয়ের সূচনা দেখেছেন তাই প্রশান্ত আভিজাতিক ভাব তাঁর মানবধর্মে খোঁজা নিষ্ফল। তাছাড়া 'প্রথমা' প্রকাশিত হয় ১৯৩২-এ— অসহযোগ ও আইন-অমান্য-আন্দোলন যখন চরমে পৌঁছেছে, এবং ক্রমশ জন-আন্দোলনে রূপ নেবার চেষ্টা করছে। তাই প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেকেও পীড়িতদের মধ্যে একজন বলে জানালেন; এবং 'প্রথমা'য় নজরুল-এর ঢং আসবারও কারণ বোধ হয় এই।

মহাসাগরেরর নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভিড়।
মাল বয়ে বয়ে ঘাল হলো যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই
সব জাহাজের সেই আশ্রয়নীড়।

(প্রথমা)

*　　*　　*

এ পর্যন্ত 'প্রথমার আলোচনাই হলো। তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বই প্রকাশিত হলো আজ আটবছর পরে। এবং ইতিমধ্যের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস মনে না-রাখলে 'প্রথমা' ও 'সম্রাট'-এর ব্যবধান খুবই অদ্ভুত মনে হবে—প্রসঙ্গ ও ভঙ্গি দুদিক থেকেই। কারণ বলিষ্ঠ ও ব্যক্ত মানবধর্মে যে-বিশ্বাস 'প্রথমা'য় পাওয়া গিয়েছিল এবং ছন্দের যে নজরুলি ঢং ছিল সেখানে, 'সম্রাট'-এর পৃষ্ঠায় তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র আছে। 'সম্রাট'-এর কবি পলাতক মনোবৃত্তিসম্পন্ন

ব্যক্তিতন্ত্রবিশ্বাসী এবং ছন্দের দিকে অনেকসময় তিনি পথ খুঁজলেন কথার নিপুণ কারুকার্যে, অনেকসময়েই প্রচলিত পথ দিয়ে চলতে চাইলেন না।

'প্রথমা' প্রকাশিত হয় ১৯৩২-এ : বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তারিখ এটা। গান্ধিজীর আইন-অমান্য-আন্দোলন তখন প্রায় চূড়ান্তে পৌঁছেছে এবং তার গণ-আন্দোলনে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে। ঠিক সেই সময়ে গান্ধিজীর সহসা-নির্দেশে সমস্ত আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল, অন্তত তার পিছন থেকে জনশক্তি সরিয়ে নেওয়া হলো। কিন্তু দেশের যুবকবৃন্দ সম্পূর্ণ সরে আসতে সম্মত হলো না এবং যে-সন্ত্রাসবাদের বীজ ছিল দেশে, হঠাৎ তা যেন আবার চারদিকে ফেটে পড়ল। সন্ত্রাসবাদের রাজনৈতিক মূল্য নিয়ে যতই মতবিরোধ থাক না, এটা যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তি সে-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। মোটের উপর জনগণের দৃষ্টিকে সরিয়ে রাজনীতিতে এল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাতেও এই দৃষ্টিপরিবর্তনের লক্ষণ চোখে পড়ে। অবশ্য তিনি হয়ত সন্ত্রাসবাদকে স্বীকার করেন না, বা করলেও তার রাজনৈতিক মূল্যে অনুপ্রাণিত হতে পারেন নি। তাই তার দৃষ্টিপরিবর্তন রূপ নিল 'প্রথমা'য় মানব-ধর্মের বিকাশ থেকে 'সম্রাট'-এর পলাতক মনোভাবে এবং ছন্দেরও বহু পরিবর্তন ঘটল যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ। এবং মানবধর্মের যে-প্রতিধ্বনি রয়ে গেল তা অনেকটাই শিথিল। অত-বড়ো একটা আন্দোলন হঠাৎ থেমে যাওয়ায় যে-কবির ভাব ও আবেগ সেই আন্দোলনপ্রসূত তাঁর প্রথম প্রেরণা ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়া বিস্ময়ের নয়—'প্রথমা'র সাবলীল শক্তি 'সম্রাট'-এর অধিকাংশ কবিতাতেই অনুপস্থিত!

> তারপর মন্বন্তর শেষে
> জ্যোতিষ্মান অবতার
> দেখা দেবে কি নতুন বেশে,
> —তারি ছবি,
> ভাবে বসে অভিশপ্ত মানুষের কবি।
>
> (সম্রাট।)

অবশ্য প্রত্যেক কবিরই কাব্যশক্তিতে সাময়িকভাবে ভাঁটা আসে। তাতে শঙ্কিত হবার বিশেষ কারণ নেই, কিন্তু 'সম্রাট' পড়ার পর উপরোক্ত সাময়িক কারণ ছাড়াও কয়েকটা কথা পাঠকের মনে আসে। এ-কবছরের মধ্যে বাঙালি সমাজ-মনের অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। সন্ত্রাসবাদ শেষ হয়ে গেল; তার রাজ-নৈতিক মূল্যে বাঙালি বিশ্বাস হারাল। যে সহজ মানবধর্মী বিশ্বাস প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহায় ছিল তা আজ যথেষ্ট বলে বিবেচিত নয়। মানবধর্মে বিশ্বাস আজ বিশিষ্ট

রূপ নিয়েছে। সামাজিক বৈষম্য, অনাচার, অত্যাচার ও নানাবিধ বিড়ম্বনায় মধ্যবিত্ত কবিদের মনে বিদ্রূপ এবং বিদ্রোহ জমেছে, কাব্যে ও জীবনে মুক্তি ও প্রগতির পন্থা তাঁদের কাছে অন্যরকম।

অথচ প্রেমেন্দ্রবাবু কবিতায় বাধাপ্রাপ্ত বিরাট জন-আন্দোলনের ও তৎপ্রসূত ব্যষ্টিভাবাপন্ন সন্ত্রাসবাদের ভাবধারা কাটিয়ে আসতে পারলেন না। তাঁর কবিতায় তাই দেখা দিল চূড়ান্ত পলাতকভাব। তাঁর পারিপার্শ্বিক মূল্যহীন, তিনি তা বোঝেন—সেখানে আশা নেই, উপায় নেই। তাই কখনো তাঁর তৃপ্তি নিছক নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে আনতে· টুকরো এলোমেলো বস্তুর যে কল্পিত আনন্দ তাতেই তিনি চাইলেন সান্ত্বনা। এবং এই সংকীর্ণ পরিস্থিতি যখন শ্বাসরোধ করার উপক্রম করে তখনি তিনি আশা ও আনন্দ খোঁজেন কল্পনার বিস্তীর্ণ পক্ষবিস্তারে। উক্ত দুই মনোভাবের প্রথমটির উদাহরণ নেওয়া যায়—

কিন্তু কেনই বা মনে রাখব ?
আকাশে থাকুক জটিল দেশকাল-জড়ানো জ্যামিতি,
স্বষ্টিময় অনন্ত অঙ্কের কাটাকুটি ,
আমার থাক
সমস্ত অঙ্কের এ-পিঠে
মিথ্যা মরীচিকার এই ব্যঙ্গ
নেশার রঙে টলমল
এই মুহূর্ত-বুদ্বুদ
(সম্রাট : তামাশা)

কিংবা,

জানালা রুধিয়া দাও,
জাহাজ ডাকিয়া যাক
সুদূর বন্দরে।
দিগন্ত পিপাসা যদি
কিছুতে না মেটে, তবে,
এসো খুঁজি দুজনার চোখে
(সম্রাট : জাহাজের ডাক)

কিংবা,

ছাদে যেও নাক, সেখানে আকাশ অনেক বড়ো
সীমানাহীন।

তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,—স্বপন সব
হবে বিলীন।
তার চেয়ে এসো বসি দুজনাতে, জানলা পাশে,
ও-ধারের ছোটো গলিটিরে দেখি,—গ্যাসের আলো
পড়েছে কেমন ফুটপাথটির ধারের ঘাসে,
শুনি নগরের মৃদুগুঞ্জন, লাগিবে ভালো।
(সম্রাট : ছাদে যেওনাক।)

এবং দ্বিতীয় মনোভাবেব উদাহরণ :

স্বপ্ন দেখি সে-পথের,
অস্তাচল উত্তীর্ণ হয়ে আগামীকালের পানে :—
স্বপ্ন যেখানে নির্ভীক.
বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়,
পৃথিবীতে উদ্দাম দুরন্ত শান্তি।
(সম্রাট : পথ)

কিংবা,

হে-ইডি, হাইডি, হাই!
অরণ্য ডাকে ওই, যাই!
সিংহেব দাঁতে ধার, সিংহের নখে ধাব,
চোখে তার মৃত্যুর বোশ্‌নাই।
হে-ইডি, হাইডি, যাই!
বনপথে বিভীষিকা, বিঘ্ন,
আমাদেরো বল্লম তীক্ষ্ণ!
কাপুরুষ সিংহ ত মারতেই জানে শুধু
আমরা যে মরতেও চাই!
হেইডি হাইডি হাই!
(সম্রাট : নীলকণ্ঠ।)

এ-কথা ঠিক যে আধুনিক সমাজবোধসম্পন্ন পাঠকের কাছে প্রেমেন্দ্রবাবুর মনোভাবের সমর্থন পাওয়া কঠিন। তাঁদের কাছে 'সম্রাট'-এর হতাশা কিম্বা আশা কেমন যেন ভাসা-ভাসা, শূন্যজীবী বলে ঠেকবে। মনে হবে কোনো বিশিষ্ট কেন্দ্রে তাঁর ব্যর্থতাবোধ দানা বাঁধে নি। আইন-অমান্যের মধ্যে যে জন-আন্দোলন-এর আভাস ছিল তা অবশ্য আর নেই, এবং যে-কবি তখন সে-আন্দোলনে আশা

পেয়েছিলেন তাঁর পক্ষে হতাশা অবশ্যই স্বাভাবিক। কিন্তু আজকের সমাজে প্রকৃত জন-আন্দোলন দেখা দিচ্ছে--অনেক বলিষ্ঠ ও তীব্র তার রূপ। ফলে হতাশা এবং আনুষঙ্গিক ব্যষ্টিকেন্দ্রে বা পলাতকভাবে সান্ত্বনা কাবর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী তো নয়ই।

অবশ্য উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এ-কথা বলতে চাইনে যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের এ-ধরনের কবিতাগুলির সার্থকতা কম। বস্তুত 'তামাশা', 'নীলকণ্ঠ' ইত্যাদি কবিতা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। যদিও 'সঞ্চারীরস'-এর সৃষ্টিতে এগুলির পরিসমাপ্তি, এবং যদিও ভবিষ্যতের কর্মঠ যুবক হয়ত কল্পনাকে বাদ দেবার চেষ্টা করবে, তবুও এ-রস প্রেমেন্দ্রবাবুর হাতে এত ঘন উপাদেয় হয়ে উঠেছে যে আধুনিক পাঠকমাত্রই তা থেকে প্রচুর আনন্দ পাবেন। তাছাড়া একদিক থেকে তো সব রসই সঞ্চারী রস, কারণ সব রসই সমসাময়িক সমাজপ্রসূত।

প্রেমেন্দ্রবাবুর কল্পনার স্বচ্ছন্দ গতি আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। খোরাসান, বাদকৃসার্নের হারানো পথ থেকে আফ্রিকার 'অরণ্য-চোঁয়ানো ঝাপ্‌সা আলো' আমাদের সামনে যেন মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। এবং এ-সব কবিতাতে স্থানীয় রং দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত।

'সম্রাট'-এর শেষাংশে লরেন্সের কয়েকটি অনুবাদ আছে। লরেন্সের গদ্য-কবিতায় সংহতি ছিল না। সে-জন্য বাংলা অনুবাদে আরো কেন্দ্রচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক। ও-বিপদ বর্তমান সত্ত্বেও প্রেমেন্দ্রবাবু দুয়েকটি কবিতার অনুবাদে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

সমর সেন
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অতি-আধুনিক বাংলা কবিতা

সরোজকুমার দত্ত

১৯৩৮ সালের শেষভাগে কলিকাতায় নিখিল ভারত প্রগতি সম্মেলনের যে অধিবেশন হয় তাহাতে শ্রী বুদ্ধদেব বসু ও শ্রী সমর সেন আপন আপন সাহিত্যরচনার বৈপ্লাবকতা ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়া দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুত বুদ্ধদেব বসু-র প্রবন্ধ সম্পর্কে আমরা প্রথমবর্ষের 'অগ্রণী' দ্বিতীয় সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি, উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন শ্রীযুত সমর সেনের রচনার সমালোচনা করিতে বসিয়া তাঁহাব প্রবন্ধের বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ, প্রথমত ঐ-প্রবন্ধটি (In Defence of the Decadents) নাকি বিশেষ প্রতিপত্তিশালী উদীয়মান এক লেখক-সম্প্রদায়ের সাহিত্যিক অভিমত সুসম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতেছে, অর্থাৎ উহা কোনো সুসম্বদ্ধ দলবিশেষের সরকারি ইস্তাহারের সামিল এবং দ্বিতীয়ত উহা আলোচ্য কাব্যপুস্তিকার গ্রন্থকাবের আত্মসমর্থন—In Defence of the Decadents। সমালোচকের সময়াভাব ও 'অগ্রণী'র স্থানাভাব-বশত প্রবন্ধটি হইতে বিস্তৃত আক্ষরিক উদ্ধৃতি সম্ভব নহে। সংক্ষেপে উহার মুখ্য বিষয়গুলি এই : (১) ধনতন্ত্রী সমাজে যে-প্রগতি স্তব্ধ হইয়াছে বিপ্লবোত্তর সাম্যবাদী সমাজে সেই প্রগতি অব্যাহত চলিবে, অতএব প্রবন্ধকার আশাবাদী ও প্রগতিতে বিশ্বাসী : (২) ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রী সমাজ 'decadent' অতএব এ-সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা অসম্ভব এবং decadent সাহিত্যই একমাত্র আন্তরিক সাহিত্য। এই আন্তরিকতার জন্য decadent হইয়াও তাঁহাদের সাহিত্যে বৈপ্লবিক শক্তিমত্তা বর্তমান। নজির ইংরেজ কবি T. S. Eliot এর কাব্য; (৩) ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে-কোনোরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি : (৪) কিষাণ-মজদুর লালঝাণ্ডা-ব্যারিকেড সংঘর্ষ লইয়া নাকি তাঁহাদের উত্তেজক সাহিত্যরচনাব নির্দেশ অথবা ফরমাইস দেওয়া হইতেছে এবং ঐ-সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহাদের না থাকায় রোমান্টিক হইবার ভয়ে ঐ-নির্দেশ বা ফরমাইস তাহারা পালন করিতে পারিতেছেন না।

কবির (১) অভিমত সম্পর্কে কবির সহিত আমাদের কোনো বিরোধ নাই, আমরাও আশাবাদী ও সাম্যবাদী সমাজ ও প্রগতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু (২) অভিমতে কর্মভীরু বুদ্ধিজীবীর চিন্তার অন্তঃসারশূন্যতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রী সমাজ (আমাদের সমাজ কি সম্পূর্ণরূপে ধনতন্ত্রী ?) যে decadent, সে-

বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সে-সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দরের (as they are) সাধনা অসম্ভব, স্বীকার করি। কিন্তু বিগতপ্রাণ সত্যশিবসুন্দরের পুনরুজ্জীবনের (Revival-এর নহে) সাধনাও কি অসম্ভব? এ-সাধনা চক্ষু মুদিয়া, শিরদাঁড়া খাড়া করিয়া পণ্ডিচেরি-মার্কা সাধনা নহে, কিংবা মাঘোৎসবের সাংবৎসরিক শান্তিপাঠ ও মানবকল্যাণ-কামনাও নহে। এ-সাধনার অর্থ—সংগ্রাম, struggle। সমাজ যেখানে decadent, সামাজিক কোনো আন্দোলনকে সেখানে বিপ্লবীরূপ পরিগ্রহ করিতে হইলে আপনার অঙ্গ হইতে decadence-এর শেষ দাগ পর্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে হইবে, সেইজন্য decadent-সমাজ হইতে উদ্ভূত সামাজিক বিপ্লবী আন্দোলন communism-এ হতাশা, অবসাদ, আত্মবিলাপ, সাফল্যস্বপ্নভীরু পরাজিতের ক্লীব-কান্নার স্থান নাই। চিন্তা, কর্ম ও উৎপাদনের উদ্দাম বিশৃঙ্খলার মধ্যে classical শৃঙ্খলাই এই আন্দোলনের উপজীব্য ও justification, decadence-এর অবলুপ্তি প্রচেষ্টাই communism-এর সার্থকতা। বর্তমান decadent যুগের যদি কোনো আন্দোলনে যুগধর্মের অজুহাতে decadence প্রবেশ করে এবং যুগধর্মেরই দোহাই পাড়িয়া কায়েমি হইয়া বসে, রাষ্ট্রিক হোক, সাহিত্যিক হোক, সে-আন্দোলনকে decadent অতএব reactionary বলিবার নিষ্ঠুর কর্তব্যজ্ঞান যেন আমাদের থাকে। কোনো সাহিত্য যদি ক্ষয়িষ্ণু গলিত সমাজের উপদংশ ক্ষতগুলিকে যথাসম্ভব যথাযথভাবে প্রতিফলিত করে, এবং তথাপি উদ্দেশ্যবিহীন হয় কিংবা কোনো ভাবাদর্শের সহিত সংশ্লিষ্ট না হয় তবে উহা যান্ত্রিক ও জড়ের জঞ্জাল হইতে বাধ্য এবং সাহিত্যিকের পক্ষে উহা এক নিকৃষ্টশ্রেণীর লালসা নিবৃত্তির উপায়ও বটে। উপায় ও ভাবাদর্শই সাহিত্যের অন্তর, ইহাদেরই যুগল নকষে সাহিত্যের আন্তরিকতার পরীক্ষা হয়। Decadent সমাজের সাহিত্যে decadence আন্তরিকতার লক্ষণ নহে, ইহা কর্মবিমুখতা ও গোপন বিপ্লব-বিরোধিতার নামান্তর মাত্র। ইহা subjective initiative-এর অস্বীকার এবং আত্মনিষ্ক্রিয়তা সমর্থনকল্পে ঐতিহাসিক অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস। ইহা Marxism নহে। বর্তমান জগতে Marxism ভিন্ন অন্য-কোনো ভাবাদর্শ যে বৈপ্লবিক নহে এ-কথা আমি বলিতে চাহি না : আমি বলিতে চাহি যে, যাহা Marxism নহে তাহাকে Marxism বলার মধ্যে বিপ্লব বা প্রগতির নামগন্ধও নাই। নিজের কাব্যের বৈপ্লবিকতা সপ্রমাণের জন্য শ্রীযুক্ত সেন ইংরেজ কবি T. S. Eliot-এর নাম করিয়াছেন কিন্তু এ-কথাটি সুকৌশলে চাপিয়া গিয়াছেন যে T. S. Eliot নিজেকে কোনোদিন Marxist বলেন নাই, বরঞ্চ তাঁহার সাম্যবাদবিরোধিতা যে Roman Catholic Church ও মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রে বিশ্বাসে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহা তিনি স্পষ্টরূপেই স্বীকার করিয়াছেন। এ-উক্তি তাঁহার সাহিত্যের সহিত সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস। ব্রিটিশ decadence-এর সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা T. S. Eliot নিষ্কলুষ decadence-এর সুদীর্ঘ পদাবলি রচনা

করিয়া গেলেন অথচ তিনি Roman Catholic Monarchy-তে বিশ্বাসী। বলা বাহুল্য, সাম্যবাদের শত্রু, চিরজীবন ধরিয়া তিনি decadence নিঙড়াইয়া গেলেন, একফোঁটা বিপ্লব পাওয়া গেল না। শ্রীযুত সেন হয়ত বলিবেন যে তাঁহার সাহিত্যের objective মূল্য সম্পর্কে তিনি সচেতন নহেন, প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যিকের সাহিত্য বিপ্লবী সাহিত্যের ভিৎ তৈয়ারি করিয়াছে। কিন্তু তিনি গলিত ক্ষত দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া পাতার পর পাতায় তার বর্ণনা-বিলাস করিলেন, গলিত ক্ষত আর কাহারো দেখিতে না হয় তজ্জন্য যাঁহার কাব্যে কোনো উৎকণ্ঠা বা প্রচেষ্টা দেখা গেল না, বিপ্লবী উৎকণ্ঠা বা বিপ্লবী প্রচেষ্টাহীন এই বিশুদ্ধ cynicism-এর উপর ভবিষ্যৎ বিপ্লবী সাহিত্যের ভিৎ যাঁহারা গড়িতে চাহেন তাঁহারা হয় নির্বোধ, না হয় প্রবঞ্চক। সাম্যবাদীগণ ইলিয়টি সাহিত্যকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেন, Marxist সেন তাহাকে বিপ্লবী বলেন, কারণ 'People say'।

ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে-কোনোরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি নহে, living, passionate ও sensitive মনে এই অন্তঃসারশূন্যতার প্রতিক্রিয়াই প্রতিফলিত হয় বিপ্লবী সাহিত্যে, আন্তরিকতার খড়্গাঘাতে নিষ্ক্রিয় মস্তিস্কবিলাস সেখানে মুহূর্তে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। তাই একদা যখন রোমাঁ রোলাঁ গান্ধি-রামকৃষ্ণে বিশ্বাসী ছিলেন তখনো তাঁহার সাহিত্য বিপ্লবী সাহিত্য ছিল, প্রাক্-বলশেভিক গোর্কির সাহিত্যের বৈপ্লবিকতাকে বলশেভিকরা অস্বীকার করিতে পারেন নাই, অহিংস টলস্টয়ের সাহিত্য সম্পর্কে লেনিনের প্রশংসোচ্ছ্বাস তো বহুবিদিত। ভাবাদর্শের দিক হইতে দেখিলে D. H. Lawrence-এর সাহিত্যে প্রতিক্রিয়ার চূড়ান্ত কিন্তু ভাবাদর্শ তো এখানে মুখ্য নহে। তাহার ভাববলিষ্ঠ জীবন্ত মন পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে যে রক্তসিক্ত পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, তাহার বিপ্লবীরূপকে অস্বীকার করিব কোন দুঃসাহসে? অপরপক্ষে অলডাস হাক্স্লির গান্ধিবাদে বিশ্বাস কি আন্তরিক? যিনি জীবনে ভালোমন্দ কিছুতেই কোনোদিন বিশ্বাস করিলেন না, তাঁহার এই হঠাৎ-বিশ্বাসের পশ্চাতে কি বিরাট ফাঁকি নাই? মন যেখানে জাগ্রত ও জীবন্ত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও প্রবহমান পারিপার্শ্বিকতার আঘাতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও ভাবাদর্শ সেখানে আন্তরিকতায় উদ্‌বেল এবং ক্রমবিবর্তনের বেদনাময় পথে সত্য-উপলব্ধির অভিমুখে গতিমান। এই সত্য-উপলব্ধির পথে পরিবর্তনশীল ভাবাদর্শের প্রতিটি মুহূর্ত বৈপ্লবিক বেদনায়, উৎকণ্ঠায়, আর্তক্রন্দনে নিবিড়। Decadence-এর প্রতিটি বন্ধনরজ্জু ছেদনের সঙ্গে সঙ্গে তাই তাহার আর্ট হইতে যন্ত্রণার আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠে। শেষরজ্জু ছিন্ন হইবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাহার শান্তি নাই। এই অশান্তি, উদ্বেগ ও আর্তনাদ, মহাভুজঙ্গের নির্মোক-পরিহারের এই প্রতিটি মুহূর্ত বৈপ্লবিক—Revolutionary evolution towards a revolutionary ideology। ইহা নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্ক-

জীবীর বিলাপ-বিলাস নহে। ইহা decadent সমাজের progressive বুদ্ধিজীবীর প্রাক্-বিপ্লবী জীবনের বৈপ্লবিক পাথেয়। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে রোলাঁ, বারবুস ও মালরোর শ্রেণীবিচ্যুতির পশ্চাতে এই প্রচণ্ড বেদনার ঐতিহ্য বর্তমান।

শ্রীযুত সেন ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের অধিবাসী অথচ বিপ্লবী। অতএব, স্বভাবতই আমরা তাঁহার কাব্যে ভাবাদর্শের বেদনাময় পরিণতির একটি পথরেখা আবিষ্কার করিব। কিন্তু কোথায় সে-পরিণতি? ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ক্ষয়িষ্ণু কবি শ্রীযুত সমর সেনের সাম্যবাদী ভাবাদর্শ উর্বশীর মতো 'যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা, পূর্ণ প্রস্ফুটিতা'। কবি ক্ষয়িষ্ণু বলিয়া কাব্যও ক্ষয়িষ্ণু হইবে, কিন্তু ভাবাদর্শ হইল সমস্ত ক্ষয়, অপচয়ের ঊর্ধ্বে সুগঠিত, সুসম্পূর্ণ, সুসম্বদ্ধ সাম্যবাদ। কোকেনের প্যাকেটে ঔষধের লেবেল মারিয়া দিবার মধ্যে যেটুকু বাহাদুরি আছে তাহা শ্রীযুত সেনেরই প্রাপ্য। একটি উদাহরণ দিই:

> তবু জানি,—
> জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
> আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে
> ততদিন
> ততদিন নারীধর্ষণের ইতিহাস

'তবু জানি'—কিন্তু তিনি জানিলেন কী উপায়ে? জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে, চূর্ণ হবে, ভস্ম হবে, এ-জ্ঞান তাঁহার কোথা হইতে আসিল? বিপ্লবী-আন্দোলনের ভিত্তিমূল শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো তাঁহার নাই। অভিজ্ঞতার পরিধি তো একদিকে অশিব, অসত্য, অসুন্দর মধ্যবিত্তজীবন ও অন্যদিকে—

> আবার নিঃশব্দ হিংস্র প্রান্তরে,
> রক্ত-পতাকা আকাশে ওড়ে:

এই পর্যন্ত। তিনি তো Marxist—তিনি তো গান্ধির মতো inner voice কিংবা সুভাষ বসু-র মতো intuition-এ বিশ্বাস করেন না। এ-ভাবাদর্শ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ও বেদনার সংঘাতে? বর্তমান decadent মধ্যবিত্ত সমাজে বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবীর ভিড়ের মধ্যে Text Book Marxism-এর যে সহজ সিদ্ধির পথ শ্রীযুত সেন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বৈষয়িক ধূর্ততার প্রশংসা না-করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। 'রোমান্টিসিজম'-ভীরু কবির ভাবাদর্শ যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিচ্যুত হইয়া রোমান্টিক হইয়া উঠিয়াছে, কবির কি সে খেয়াল নাই।

কিষাণ-মজদুর, লালঝাণ্ডা-ব্যারিকেড সংঘর্ষ লইয়া উত্তেজক কাব্যরচনার হুকুম

কেহ কোনোদিন শ্রীযুত সেনকে দিয়েছেন কিনা জানি না, বোধহয় এ-অভিযোগ শ্রীযুত সেনের স্বকপোলকল্পিত। কিন্তু কেহ যদি বিপ্লবী-কবিযশাকাঙ্ক্ষী কাহাকেও সমাজের অগ্রগামী বিপ্লবীশ্রেণীর জীবন বৈপ্লবিকভঙ্গিতে দেখাইবার অনুরোধ করেন, তবে কি তাঁহার অনুরোধ অযৌক্তিক হইবে ? শ্রীযুত সেন বলিবেন, তিনি বিপ্লবী কবি বটে তবে বিপ্লবীশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই, অর্থাৎ কেবল-মাত্র রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করিতে হইলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সাহিত্যে কিংবা কাব্যে নহে। Revolutionary trainning এড়াইয়া বিপ্লবী সাজিবার ইহা এক অদ্ভুত কৌশল। শ্রীযুত সেনের এ-ফাঁকিকেও না হয় আমরা ক্ষমা করিলাম, কিন্তু যে মধ্যবিত্ত জীবনের সহিত তাঁহার জন্মগত ও ঐতিহ্য-গত প্রাত্যহিক পরিচয় তাহার গলিত, স্থবির ও নপুংসক রূপটিই তাঁহার চোখে পড়িল, অথচ ইস্পাত-কঠিন যে-অংশ ব্যক্তিগত ভাবাদর্শে কিংবা নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিক-কতার আঘাতে বিপ্লবপ্রবাহের সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছে ও দিতেছে তাহার কঠোর সুন্দর রূপ, তাহার শ্রেণীবিচ্যুতির বেদনা-ইতিহাস, তাহার বুদ্ধিবিদগ্ধ আশাবাদের কোনো আভাস শ্রীযুত সেনের কাব্যে মেলে না। শ্রীযুত সেন যে কাব্য-আন্দোলনের উত্তর-সাধনা করিতেছেন তাহা অতীতে মধ্যবিত্তপরিচালিত বিপ্লবী আন্দোলনকে উপেক্ষা করিয়াছে—অসহযোগ, আইন-অমান্য ও সন্ত্রাসবাদের সহিত কোনো সম্পর্কই রাখে নাই, তাই আজ সাম্যবাদী আন্দোলনের সহিত তাহার এই ঐতিহ্যহীন একত্ববোধের পশ্চাতে যে বিরাট প্রবঞ্চনা রহিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

সমালোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, এইবার শ্রীযুত সেনের কাব্যের আঙ্গিক সম্পর্কে কিছু বলিয়া উপসংহার করিব। শ্রীযুত সেনের কবিতা সাধারণের বোধগম্য নহে—কেবলমাত্র 'chosen few'-এর উপভোগ্য। আমি যথেচ্ছ দুইটি স্থান উদ্ধার করিতেছি :

আকাশচরের শব্দ আকাশ ভরায়।
নীবিবন্ধে কূটগ্রন্থি,
শিবিরে আর নিবিড় মায়া নেই
তুষার পাহাড়ের শান্তি যদিচ শিশিরে ঝরে।

কিংবা,

পেস্তাচেরা চোখ মেলে শেষহীন পড়া
অন্ধকূপে স্তব্ধ ইঁদুরের মতো,
ততদিন গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে
বণিকের মানদণ্ডের পিঙ্গল প্রহার।

এ-কবিতা 'Intellectual clique'-এর জন্য লেখা, আমার আপনার জন্য নহে। পাঠক-সম্প্রদায়ের প্রতি এই সানুনাসিক অবহেলা, আপনার কাব্যকে সর্বসাধারণের উপভোগ হইতে বাঁচাইয়া দুর্বোধ্য করিবার এই গলদঘর্ম প্রয়াস, ইহা আর যাহাই হইক, বিপ্লবী মনোভাবের পরিচায়ক নহে। মসীকৌলীন্যের অভিমানে শ্রীযুত সেন আজ আর্টের প্রচাররূপ ও communicativeness-কে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করিতেছেন। রচনার আবেদনের পরিধি সংকার্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইয়া ক্রমে-আত্মতৃপ্তিতে পরিণত হইতে বসিয়াছে। এই শম্বুকবৃত্তিকে কি বিপ্লব-প্রচেষ্টা বলিব? ইহা বিপ্লবের নামে individual anarchy-র চরম অবস্থা মাত্র। সমুদ্রপারে subjective individualism-এর যে ঐতিহাসিক আন্দোলন একদা বিপ্লবরূপে উদ্ভূত হইয়া অবশেষে কালের কঙ্কালপথে বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে, সাম্যবাদের ছদ্মরূপে ইহা তাহারি অনুকরণহীন অনুকরণ মাত্র।

কাব্যের বিষয়বস্তু, কাব্যের উৎসমুখ, কাব্যের দায়িত্বের প্রশ্নকে ছাপাইয়া আজ কাব্যের আঙ্গিকের প্রশ্ন বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যৌবনের তাগিদে বল্কল পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, খুশিমতো বল্কল পরিবর্তন করিলে সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও পরিবর্তন হইবে ইহা মনে করা বাতুলতা। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে ও আভ্যন্তরীণ তাগিদেই আঙ্গিকের পরিবর্তন হইবে, ইহার জন্য সচেতন প্রচেষ্টা হয় নির্বোধ কালক্ষয় নতুবা সংগ্রাম এড়াইবার প্রচেষ্টা। Technique fetishism-এ ইহার অনিবার্য পরিণতি। ঘোড়া আসিলে চাবুকের জন্য ভাবিতে হইবে না। স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে আমাদের বক্তব্য যথাযথভাবে বলিবার সুযোগ মিলিল না, বারান্তরে এ-সম্বন্ধে আরো লিখিবার ইচ্ছা রহিল। ইতিমধ্যে শুধু এই কথাটি পাঠককে স্মরণ রাখিতে বলি যে, ইন্টেলেক্চুয়ালি কুসংসর্গ হইতে সাম্যবাদের সাবধান হইবার দিন আসিয়াছে।

রচনাপরিচয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

[এই অংশে বর্তমান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি রচনার উৎসনির্দেশ করার ও প্রাসঙ্গিক নানা তথ্য জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে রচনাটির পত্রিকায় বা গ্রন্থে প্রকাশিত রূপ দেখার সুযোগ না-হওয়ায় অন্য-কোনো সূত্রের উপর নির্ভর করতে হয়েছে, সেখানে দ্বিতীয় সূত্রটি উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, বাকি সব রচনাই প্রাথমিক উৎস থেকে আহৃত। গ্রন্থ-সমালোচনাগুলিতে উদ্ধৃত রচনার পঙ্‌ক্তি যেখানে সম্ভব হয়েছে মূল রচনার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন সমর সেন যে-বইগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেগুলি প্রথম সংস্করণ, অনেক লেখায়, যেমন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা অডেনের, পরবর্তী সংস্করণে কিছুটা বদল হয়েছে, তা সমর সেনের উদ্ধৃত পাঠের সঙ্গে নাও মিলতে পারে—স. দ.]

১

ছড়ানো কবিতা

তুমি ও আমি—সম্ভবত এ-কবিতাটি সমর সেনের প্রথম মুদ্রিত কবিতা, ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকায়। কবিতাটি সমর সেন তাঁর কোনো কাব্যগ্রন্থেই অন্তর্ভুক্ত করেন নি, বা উল্লেখও করেন নি কখনো; বরং সমর সেনের নিজের কথায় বা সমকালীন অন্যান্যদের বক্তব্যে 'পূর্বাশা' পত্রিকাতেই তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, এমন ধারণাই প্রচলিত হয়ে গেছে। কিন্তু এ-কবিতাটি 'পূর্বাশা'-র জন্মের আগেই মুদ্রিত। কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয় অনুষ্টুপ পত্রিকার পুলক চন্দ সম্পাদিত 'সমর সেন বিশেষ সংখ্যা'য়; সেখান থেকেই এটি নেওয়া হয়েছে।

এ-কবিতায় সমর সেন প্রচলিত কাব্যভাষা ও ছন্দ অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন, যাতে তাঁর নিজস্বতার কোনো ছাপ নেই। এ-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর কথা মনে পড়তে পারে—"সেদিন তার মৌলিক কয়েকটি বাংলা রচনা সে দেখিয়েছিল আমাকে; আমি তার ছন্দের হাত টলোমলো দেখে তাকে গদ্যকবিতা লেখার পরামর্শ দিলাম (আমার যৌবন। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। এপ্রিল ১৯৭৬।) এ-ঘটনা অবশ্য আরো পরের, ১৯৩৪-এর।

চক্রান্ত—'বৈশাখী' নামে একটি বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল কবিতা-ভবন থেকে, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ। 'বাংলার গ্রীষ্ম বার্ষিকী' বলে অভিহিত করা হয়েছিল এই পত্রিকাকে, এর সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রথম সংখ্যায় বেরিয়েছিল সমর সেনের এই কবিতাটি, কিন্তু তাঁর কোনো কাব্যগ্রন্থেই এটি অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

দুর্দিন—১৯৪২-এ রচিত এই কবিতাটি পাওয়া গেছে অনুষ্টুপ পত্রিকার পূর্বোল্লিখিত বিশেষ সংখ্যায়। ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা সমর সেনের বাইশ সংখ্যক চিঠিতে এ-কবিতাটি আছে। চিঠিপত্রের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নিবেদনে সম্পাদক জানিয়েছেন কবিতাটি 'দুর্দিন' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল প্রতিরোধ, শারদীয় ১৩৪৯-এ।

এই কবিতাটিকে স্বতন্ত্র কবিতা হিশেবে গণ্য করা হবে কি-না, এ নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন তোলা যায়। 'তিন পুরুষ' কাব্যগ্রন্থের 'একটি পুরনো কবিতা'-কে এরি পরিবর্তিত রূপ বলেই মানতে হয়। কিন্তু কয়েকটি ব্যাপার এ-প্রসঙ্গে বিবেচনা করা জরুরি। ১৯৪২-এ লেখা কবিতাটি অব্যবহিত পরে প্রকাশিত 'খোলা চিঠি'-তে অন্তর্ভুক্ত হয় নি। মনে হয় এ-কবিতাটি সম্পর্কে কবি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন প্রথম থেকেই, সঙ্গের চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন "...এটা প্রতিরোধে পাঠিয়েছি, জানি না ছাপা হবে কিনা। কবিতাটি কেমন হয়েছে জানি না, হয়ত বদরুচির পরিচয় দেওয়া হয়েছে।" এই সংশয় নানাকারণেই হতে পারে; কবিতাটিতে যে সবব ঘোষণা আছে তেমন ঘোষণা যে কবিতা হয় না বলেই মনে করতেন সমর সেন, তা বোঝা যায় এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত 'এক-সূত্রে' বইটির সমালোচনা পড়লেই। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হওয়ার নতুন ভাবনাও কি তাঁকে ধাঁধায় ফেলেছিল! সঙ্গের চিঠিতে তিনি অবশ্য স্পষ্ট করেই তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন। ফলে কবিতা হিশেবে যেমনই হোক, সমর সেনের মানসিকতাকে বোঝার জন্য এ-লেখাটি প্রয়োজনীয়। অনেক পরে 'একটি পুরনো কবিতা' নামে 'তিনপুরুষ'-এ যে-কবিতাটি ছাপা হয়, তাও আবার বর্জিত হয় 'সমর সেনের কবিতা'-র সব সংস্করণেই। কিন্তু 'একটি পুরনো কবিতা' আর 'দুর্দিন'-এর মিল যতটা, অমিল তার থেকে বেশি। 'দুর্দিন' কবিতায় তিনটি স্তবক, তেরোটি পঙ্‌ক্তি। 'একটি পুরনো কবিতা'-য় দুটি স্তবক, প্রথম স্তবক অর্থাৎ ছটি পঙ্‌ক্তি সেখানে বাদ পড়েছে। কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি বদলে যায়, 'হিটলার টোজোর এ গুপ্ত জাতভাই' বাতিল করে সেখানে আগের একটি পঙ্‌ক্তিই পুনরাবৃত্ত হয়—ফলে সেটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কবিতা হয়ে দাঁড়ায়, তা হয়ে ওঠে অনেকটাই নির্বিশেষ; অন্যদিকে

'দুর্দিন' কবিতায় ছিল বিশেষ সময়ের ও রাজনীতির ছাপ। 'দুর্দিন'-কে তাই স্বতন্ত্র কবিতা হিশেবে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

লোকের হাটে—১৯৪৪-এ প্রকাশিত হয় 'তিনপুরুষ', তারপর আর সমর সেনের কোনো স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। 'সমর সেনের কবিতা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ তে, পরে এর অনেকগুলি সংস্করণ হয়—এই গ্রন্থটি মূলত তাঁর কাব্যগ্রন্থ ও বিক্ষিপ্ত কবিতা থেকে নির্বাচিত লেখার একটি সংকলন। এ-কবিতাটি সেখানেই প্রকাশিত হয়, অন্য-কোনো কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

৯ই আগস্ট ১৯৪৫—এ-কবিতাটিও পাওয়া যাবে শুধু সমর সেনের কবিতাতেই।

জয় হিন্দ—এই কবিতাটিও অন্য-কোনো কাব্যগ্রন্থে নেই, শুধু 'সমর সেনের কবিতা'-য় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জন্মদিনে—এই কবিতাটিকেই দীর্ঘদিন সমর সেনের শেষ কবিতা বলে গণ্য করা হয়েছে, কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তিও যেন সে-রকমই ইঙ্গিত করতে চায়; যদিও এ-ধারণা পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এই কবিতাটিও পাওয়া যাবে শুধু 'সমর সেনের কবিতা'-তেই। 'লোকের হাটে', '৯ই আগস্ট ১৯৪৫', 'জয় হিন্দ' ও 'জন্মদিন'—এই চারটি কবিতাই 'সমর সেনের কবিতা'-য় '১৯৪৪-১৯৪৬' পর্বের অন্তর্গত। এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে সমালোচকের এইকটি কথা—"সমর সেনের রচনা-ক্ষান্তি আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয় বিশেষত এই কারণে যে তাঁর চূড়ান্ত কাব্যে আমি কোনো দুর্বলতা, শৈথিল্য, ক্ষয়ক্লান্তি দেখতে পাই না।…দ্বিচরণ শ্লোকবদ্ধ রুদ্ধপ্রবাহ পয়ারের ঠাসবুনট, আকাস্মিক অন্ত্যমিল ও অন্তর্মিল, বাক্‌বিধির পরিবর্তন, পদ্যছন্দের নির্ভীক সংমিশ্রণ, ভাবসংশ্লেষ, বিরোধী উক্তির ও উল্লেখের সমাবেশে জটিল আবেগের প্রকাশ, উপমা-রূপক থেকে প্রতীকের গভীরতর দ্যোতনা-সঞ্চার, সর্বোপরি অন্তরতম বেদনার্ত জীবনপ্রত্যয় ও মানবতা—এ-সব মিলে সমর সেনের শেষ-কাব্যে সম্ভাবনা আমি প্রচুর দেখতে পাই এবং সে-জন্যই তাঁর ক্ষান্তিতে বিচলিত বোধ করি।" (অমলেন্দু বসু—সমর সেনের কবিতা / চতুরঙ্গ, শ্রাবণ ১৩৭৪)।

উড়ো খৈ—এই কবিতাগুলির কয়েকটি (৩, ৪ ও ৫) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল শারদীয় দেশ ১৩৬৩ (১৯৫৬)-তে পাঁচমিশেলি নামে, বাকিগুলিও ১৯৫৬-তেই লেখা, প্রকাশিত হয়েছিল শারদীয় দেশ, ১৯৬১-তে। কোনো-কোনো কবিতা নানা শিরোনামে (যেমন পিকনিক) বাংলা কবিতার নানা

সংকলনেও স্থান পায়। অনেককাল পরে শারদীয় এক্ষণ ১৩৮৭ (১৯৮০)-তে 'উড়ো খই' শিরোনামে চারটি কবিতা প্রকাশিত হয়। পরে এই শিরোনামেই এই চারটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয় অব্যবহিত পরে প্রকাশিত 'বাবু বৃত্তান্ত'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে (প্রথম দে'জ সংস্করণ, ১৯৮১), পরিশিষ্ট অংশে। এক্ষণ-এ প্রকাশের সময় এই চারটি কবিতা সম্পর্কে লেখক জানিয়েছিলেন "বছর পঁচিশ আগে একটি বান্ধবীর সঙ্গে বাজি ধরে লেখা কবিতাগুলি কোনো সংকলনে প্রকাশিত হয় নি।" 'বাবু বৃত্তান্ত'-এ লেখকের নিবেদন অংশেও এ-কথা জানানো হয়।

দ্বিতীয় কবিতাটি কবি পরে সামান্য পরিবর্তন করেছিলেন। সেই পরিবর্তন এখানে নির্দেশ করা হলো :

পঙ্ক্তি	প্রথম পাঠ	পরিবর্তিত পাঠ
৪	ইশারা কীসের···	কীসের ইশারা···
১০	···প্রহরখানেক বাকি	···একপ্রহর বাকি

স্মৃতি ৩—এ-কবিতাটিও 'বাবু বৃত্তান্ত'-এর পূর্বোল্লিখিত সংস্করণের পরিশিষ্টে ছাপা হয়েছিল। 'লেখকের নিবেদন'-এ কবি জানিয়েছিলেন "···কবিতাটি মৃণালিনী এমার্সনের অনুরোধে বা আদেশে ১৯৬১ তে লেখা বেথুন কলেজের পত্রিকার জন্য।"

একটি কবিতা—এ-কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল চতুরঙ্গ পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৭২ (১৯৬৫) সংখ্যায়। এটিই সমর সেনের শেষ মুদ্রিত কবিতা।

২

অন্যভাষার কবিতা

চারটি কবিতা : কার্ল মার্কস—এই অনুবাদগুলি প্রথম প্রকাশিত হয় এক্ষণ পত্রিকার কার্ল মার্কস বিশেষ সংখ্যায় (৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, ১৩৭৫ / ১৯৬৮) —'কার্ল মার্কসের কবিতা' শিরোনামে। বাংলা অনুবাদের আগে মূল জার্মান রচনাও দেওয়া ছিল। অনুবাদগুলির শেষে জানানো হয়েছিল "উপরোক্ত কবিতাগুলি পাওয়া গেছে Karl Marx : His Life and Work, John Spargo (New York, 1909) গ্রন্থটির মধ্যে (দ্র. পৃ ৪২-৪৪)। ইংরাজি অনুবাদের সহায়তায় এগুলি অনূদিত হয়েছে।"

John Spargo-র বইতে অন্তর্ভুক্ত এ-কবিতাগুলির অনুবাদক Meta L. Stern। কিন্তু এই অনুবাদগুলি একটু গোলমেলে, যার ফলে কিছু ভুল বাংলা অনুবাদেও সঞ্চারিত হয়েছে। প্রথমত কবিতাগুলি যে-ভাবে সাজানো হয়েছে,

তা আদৌ মার্কসের মূল কবিতা অনুসারী নয়। এ-ছাড়া সম্ভবত John Spargo-র বই-এর ইংরেজি অনুবাদ কোনো-কোনো জায়গায় এত সরে গেছে মূল থেকে যে, বাংলা অনুবাদও অনেকবেশি দূরবর্তী হয়ে গেছে। মার্কসের কবিতার সম্পূর্ণ ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া যাবে প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো প্রকাশিত 'কার্ল মার্কস, ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস কালেক্টড ওয়ার্কস', প্রথম খণ্ডে। এখানে সেই গ্রন্থ অনুসারেই উৎস-নির্দেশ করা হলো।

সমব সেন অনূদিত প্রথম কবিতাটির প্রথম স্তবক Transformation কবিতার পঞ্চদশতম স্তবকের ও দ্বিতীয় স্তবকটি ঐ-কবিতারই ঊনবিংশতিতম স্তবকের রূপান্তর।

দ্বিতীয় কবিতাটি My world শীর্ষক কবিতার একাদশতম স্তবকের রূপান্তর।

তৃতীয় কবিতার প্রথম স্তবক অনূদিত হয়েছে Feelings কবিতার প্রথম স্তবক থেকে, দ্বিতীয় স্তবকটি ঐ-কবিতার পঞ্চম স্তবকের অনুবাদ।

চতুর্থ কবিতাব স্তবকদুটি Feelings কবিতারই ত্রয়োদশতম ও চতুর্দশতম স্তবকের অনুবাদ।

Transformation রচিত হয়েছিল ১৮৩৬-এর নভেম্বর থেকে ১৮৩৭-এর ফেব্রুয়ারির মধ্যে। My World-এর রচনাকাল ১৮৩৬-এর অক্টোবর-ডিসেম্বর। Feelingsও লেখা হয়েছিল ঐ-সময়েই। এই সময়কালে রচিত মার্কসেব কবিতাগুলি তিনটি খাতায় লিপিবদ্ধ ছিল, সবগুলিই জেনিকে উৎসর্গ করা। প্রথম দুটি খাতার নাম Book of Love, Part I ও Part II, তৃতীয়টির নাম Book of Songs. Transformation, My World ও Feelings কবিতাতিনটি Book of Love, Part II-র অন্তর্গত।

একটি কবিতা : ইভান বুনিন—এই অনুবাদটি পাওয়া গেছে ১৯৭৫ সালে প্রগতি প্রকাশন, মস্কো কর্তৃক প্রকাশিত বাংলায় অনূদিত ইভান বুনিন-এর গল্প-সংকলন 'ছায়াবীথি' র ভূমিকায়।

ইভান বুনিন (১৮৭০-১৯৫৩) বিপ্লবের পর ১৯২০-তে তাঁর স্বদেশ ছেড়ে চলে যান ফ্রান্সে, যদিও রুশদেশকে ভুলতে পারেন নি তিনি কখনো। এ-কবিতায় ধরা পড়েছে স্বদেশের জন্য তাঁর যন্ত্রণাই, স্বেচ্ছানির্বাসিত বুনিন এটি লিখেছিলেন ১৯২২ সালে।

একটি কবিতা : সের্গেই এসেনিন—এই অনুবাদটি প্রথম মুদ্রিত হয় মাঘ ১৩৬৯-এ নতুন সাহিত্য ভবন থেকে প্রকাশিত, শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত' সংকলনে, রুশ কবিতার গুচ্ছ 'কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী'তে।

শিরোনামহীন এই কবিতাটি এসেনিন (১৮৯৫-১৯২৩) লিখেছিলেন ১৯১০ সালে। 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত'তে উৎস-নির্দেশে কবিতাটির প্রথম পঙ্‌ক্তির অংশ উল্লিখিত আছে; রোমান প্রতিবর্ণীকরণে যা হয় Vot uz vecher.

জেনির গান : বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট—এই অনুবাদটি প্রথম প্রকাশিত হয় ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় থেকে জানুয়ারি ১৯৭২-এ প্রকাশিত সমীর দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বের্টোল্ট ব্রেখ্‌টের কবিতা' সংকলনে, সেই বই থেকেই সংগৃহীত হয়েছে এই কবিতা। পরে সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত 'বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট: কবিতা সংগ্রহ'-তেও এটি অন্তর্ভুক্ত হয়।

এ-কবিতাটির রচনাকাল ১৯২৯।

দুটি কবিতা : নর্মান বেথুন—এই দুটি কবিতা সংগৃহীত হয়েছে টেড অ্যালান ও সিডনি গর্ডন রচিত নর্মান বেথুনের জীবনী 'দি স্কালপেল, দি সোর্ড'-এর বঙ্গানুবাদ 'মহাচীনের পথিক' থেকে। ১৩৮৬ সনে সুবর্ণরেখা থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি কল্যাণ চৌধুরীর অনুবাদ, গ্রন্থভুক্ত কবিতাংশগুলি অনুবাদ করেছিলেন সমর সেন।

যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হওয়ার পর নর্মান বেথুনকে গ্রাভেনহার্স্টের ক্লাইডর স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি হতে হয়েছিল। এখানে থাকার সময় বেথুন তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন কটেজের দেয়ালে ছবি এঁকে। ছবিগুলির নানা নামকরণও করেছিলেন তিনি। একটি বিরাট ছবি এঁকেছিলেন তিনি দেয়াল জুড়ে, নাম—একজন যক্ষ্মারুগির কথা : একটি একাঙ্ক নাটক ও নটি যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য। শেষদৃশ্যে দেখা গেছে মৃত্যুদূত দুহাত দিয়ে একটি হতভাগ্য যুবককে কোলে তুলে নিচ্ছে, তার চোখ থেকে ঝরছে দয়া, করুণা, কমনীয়তা; দূরে কবরস্থান, সারি সারি ফলক। এই দৃশ্যের নিচে লেখা ছিল প্রথম কবিতাটি।

দ্বিতীয় কবিতাটি ১৯৩৬ সালে লেখা। স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য মনস্থির করে চাকরি ছেড়ে দেন বেথুন, উইল করে নিজের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করে যান। তখনি এই কবিতাটি লিখেছিলেন তিনি। এর তিনসপ্তাহ পরে তিনি স্পেনের উদ্দেশে রওনা হন।

একটি চীনা গান—এই অনুবাদটিও পাওয়া গেছে 'মহাচীনের পথিক' বইতে। নর্মান বেথুনের ভ্রাম্যমান ইউনিট পশ্চিম হোপেই-র হুং সি-তিয়েনে পৌঁছবার পর সেখানে স্টাফ কনফারেন্সে এক তরুণী কমরেড সভাপতিত্ব করেছিলেন। রাত্রিবেলায় সবার অনুরোধে তিনি এই গানটি গেয়েছিলেন।

থেয়েলমান ব্যাটেলিয়ানের গান—পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানেই নর্মান বেথুন এ-গানটি গেয়ে-

ছিলেন। এটি স্পেনের রণাঙ্গনে যুদ্ধরত আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের থেয়েলমান ব্যাটেলিয়ানের গান।

জয় হবে আমাদের : চেরবান্দা রাজু—অন্ধ্রের কবি ও বিপ্লবী কম্যুনিস্ট চেরবান্দা রাজুর কিছু গান ও কবিতার বাংলা অনুবাদের একটি সংকলন প্রকাশ করেন বিপ্লবী লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের প্রস্তুতি সম্মেলনের আহ্বায়ক পরিষদ পরিচালিত সংহতি প্রকাশনী। আশ্বিন ১৩২৮ তে প্রকাশিত এই সংকলনটির নাম 'ঢেউয়ে ঢেউয়ে তলোয়ার'—সংকলনের শুরুতেই ছিল সমর সেন অনূদিত এই কবিতাটি।

অন্যদেশের গল্প

বল-নাচের পর : লেভ তলস্তয়—অনুবাদকের কাজ নিয়ে মস্কোয় যাওয়ার পর সমর সেন তলস্তয়ের অনেকগুলি গল্প অনুবাদ করেছিলেন, 'বল-নাচের পর' তারি অন্যতম। অনুবাদটি প্রথম ছাপা হয়েছিল বিদেশি ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো থেকে প্রকাশিত 'লেভ তলস্তয় বড়ো ও ছোট গল্প' সংকলনে। পরে আরো নানা সংকলনে এটি পুর্নমুদ্রিত হয়।

গল্পটি তলস্তয় লিখেছিলেন ১৯০৩ সালে, ইয়াসনায়া পলিয়ানায়।

সর্দিগর্মি : ইভান বুনিন—প্রগতি প্রকাশন, মস্কো থেকে নটি গল্প নিয়ে ১৯২৫-এ প্রকাশিত হয় ইভান বুনিনের গল্পের বাংলা অনুবাদের সংকলন 'ছায়াবীথি'-র প্রথম সংস্করণ। সবকটি গল্পই অনুবাদ করেছিলেন সমর সেন—সেখানেই আছে এই গল্পটি।

এই গল্পটি বুনিন লিখেছিলেন দেশ ছেড়ে আসার পর, ১৯২৫-এ, মারিটাইম আল্প্স-এ।

অদৃষ্টের পরিহাস : আকাকি বেলিয়াশভিলি—গোপাল হালদার ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যয়ের সম্পাদনায় 'পরিচয়' পত্রিকার ৩৪ বর্ষ ৮ সংখ্যাটি (ফাল্গুন ১৩২৮। মার্চ ১৯২৫) প্রকাশিত হয় 'আন্তর্জাতিক গল্প সংখ্যা' রূপে। ঐ সংখ্যাতেই মুদ্রিত হয়েছিল এই গল্পটি।

আকাকি বেলিয়াশভিলি (জন্ম ১৯০৩) জর্জিয়ার লেখক। সতেরোবছর বয়সে শুরু করেন রেখাচিত্র ও ছোটোগল্প লিখতে। উপন্যাসও লিখেছেন তিনি, তার মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য আঠারোশতকের প্রখ্যাত জর্জীয় কবি ভিসসাওরিল গাবাশভিলির জীবনকাহিনী অবলম্বনে লেখা 'বেসিকি'। বেলিয়াশভিলির লেখায় ধরা পড়েছে প্রাক্-বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর জর্জিয়ার রূপ।

৩

কবিতাভাবনা

বাংলা কবিতা—এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায়, বৈশাখ ১৩৪৫-এ।

অতি-আধুনিক বাংলা কবিতা—এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় অগ্রণী, দ্বিতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায় (মে ১৯৪০)। এ-লেখাটি সরোজ দত্তর এই শিরোনামেই অগ্রণী, দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (এপ্রিল ১৯৪০) প্রকাশিত রচনার জবাব। সরোজ দত্ত-র লেখাটি (বর্তমান সংকলনের পরিশিষ্ট ৩ দ্রষ্টব্য) সমর সেন-এর ‘গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা’র (প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৪০। মাঘ ১৩৪৬) সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখা হলেও In Defence of the ‘Decadants’ প্রবন্ধটিও সেখানে সমালোচিত হয়।

সমর সেনের লেখাটির সঙ্গেই প্রকাশিত হয়েছিল সরোজ দত্ত-র প্রত্যুত্তর—আরেকটি প্রবন্ধ, দীর্ঘতর সে-লেখারও শিরোনাম ছিল একই, প্রবন্ধের শেষে লেখকের নাম ছিল সঃ দঃ।

সমর সেনের এই লেখাটি এখানে ছাপা হলো ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত ‘মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক’ (তৃতীয় খণ্ড) থেকে। প্রবন্ধের মধ্যে উদ্ধৃতির সঙ্গে ‘অগ্রণী’-র পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া ছিল, এখানে তা বাদ দেওয়া হয়েছে।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা—কৃত্তিবাস পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩৬০। ১৯৫৩) প্রকাশিত হয়েছিল এই প্রবন্ধটি।

লেখাটিতে দু-জায়গায় তিরিশের শতক ছাপা হয়েছিল, এটি স্পষ্টতই ভুল, এখানে সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে।

নানা লেখা

মস্কোর জীবন—শারদীয় বেতার জগৎ, ১৯৫৭ (৩৪ বর্ষ ২০শ সংখ্যা)-তে প্রকাশিত হয়েছিল এই নিবন্ধ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৫৭-র ফেব্রুয়ারিতে “সপরিবারে মস্কো যাই চাকরি নিয়ে। সংস্থার নাম ছিল ‘বিদেশি ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়’—এখন ‘প্রগতি প্রকাশালয়’।’...তিনবছর একটানা ওখানে থেকে দেশে এলাম ছুটিতে।...১৯৫৭তে দুই মেয়েকে নিয়ে আবার ফিরে যাই মস্কোয়, ভেবেছিলাম কয়েকবছর থেকে যাব।...ভেবেচিন্তে ছ-মাস পরে পাততাড়ি

গুটোলাম, অগস্ট মাসে, মাঝরাতে বিমানবন্দরে অনেক বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গ ছেড়ে।" (বাবু বৃত্তান্ত)।

উড়ো খৈ—এই শিরোনামে পরপর কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। এটি এই পর্যায়ের ষষ্ঠ লেখা, বেরিয়েছিল ৩০শে নভেম্বর, ১৯৫৭-এ। পরে এ-লেখাগুলি সংকলিত হয় 'বাবু বৃত্তান্ত' গ্রন্থে।

রচনাটির একজায়গায় বলা হয়েছে "একটি বাংলা পত্রিকায় সে-দিন সরোজ দত্তের কলমের তীব্র ধার আবার অনুভব করলাম।" এখানে ধনঞ্জয় দাশ ও সতীন্দ্রনাথ মৈত্র সম্পাদিত নতুন পরিবেশ পত্রিকার নবম সংকলন (নবপর্যায় শারদীয় ১৩৩৮)-এর কথা বলা হয়েছে। এই পত্রিকাতেই আরো-অনেক লেখার সঙ্গে সমর সেন ও সরোজ দত্তর পুরোনো লেখাগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল, যা পরে 'মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক'-তে সংকলিত হয়।

সত্তরদশকের চালচিত্র—এ-লেখাটি প্রথমে ইংরেজিতে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে পরিবর্তিত আকারে অনুষ্টুপ, সত্তরদশক বিশেষ সংখ্যা প্রথম খণ্ডে (শারদীয় ১৩৩৮)-র প্রকাশিত হয়।

বিষ্ণু দে : সমসাময়িকের দৃষ্টিতে—এ-লেখাটি প্রথমে প্রকাশিত হয় ইংরেজিতে, স্টেটসম্যান পত্রিকায়। পরে অনুষ্টুপ, ১৭ বর্ষ বসন্ত সংখ্যা ১৩৮৯/১৯৮৩-তে প্রকাশিত হয়।

প্রসঙ্গ কলকাতা—মণীন্দ্র রায় সম্পাদিত চতুর্দিক পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা (মার্চ ১৯৫৭) তে বেরিয়েছিল এই লেখাটি। এ-প্রসঙ্গে সম্পাদক জানিয়েছিলেন "লেখাটি ইংরেজিতে প্রায় দশবছর আগে ছাপা হয়েছিল। কিন্তু লেখকের এখনকার মতও মোটামুটি এই রকমই, তাই ছাপতে দিতে রাজি হয়েছেন। সময়ের এই ফারাকের ফলে নিবন্ধে ব্যবহার করা অঙ্কের হিশাবে একটু হেরফের নিশ্চয়ই ঘটেছে। আর গত সাতবছর বামফ্রন্ট সরকার শাসন-ক্ষমতায় থাকায় কলকাতা নিয়ে নানাদিকে কর্মতৎপরতা দেখা যাচ্ছে, তাও ঠিক। কিন্তু লেখকের মূল বক্তব্য অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্যের আর্থিক সম্পর্কের ভারসাম্যহীনতা, এখনো যে-কে সেই রয়ে গেছে।'

প্রবন্ধে একজায়গায় বিষ্ণু দে-র উল্লেখ আছে, মূল ইংরেজি প্রবন্ধটি রচনার সময় বিষ্ণু দে জীবিত ছিলেন।

গ্রন্থ-সমালোচনা

গ্রন্থ-সমালোচনাগুলি মূলত প্রকাশিত হয়েছিল পরিচয় ও কবিতা পত্রিকায়। "পরিচয়-এ কবিতা লিখি দু-তিনবার, পুস্তক-সমালোচনা কবি অনেক বেশি" (বাবু বৃত্তান্ত)। এখানে বর্তমান সংকলনের ক্রম-অনুসারে সমালোচনাগুলির প্রথম প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখ করা হলো। প্রথমে আলোচিত বই ও লেখকের নাম, তারপর প্রকাশকের নাম ও অন্য তথ্য মূল রচনায় যে-ভাবে বিন্যস্ত ছিল সে-ভাবেই সাজানো হলো, তারপর যে-পত্রিকায় লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার নাম ও প্রকাশকাল জানানো হলো।

১

ক্রন্দসী—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত (ভারতী ভবন)।
পরিচয়, ৭ম বর্ষ ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪।

উত্তরফাল্গুনী—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। পরিচয় প্রেস।
কবিতা, ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৮।

পূর্বলেখ—বিষ্ণু দে প্রণীত। কবিতা ভবন।
অরণি, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৯; ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪২।

বসুন্ধরা—চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। কবিতা-ভবন, দাম বারো আনা।
কবিতা, ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৯।

২

একসূত্রে—ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত। দাম একটাকা।
কবিতা, ৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৯।

Boatman Boy—By Sachi Raut Roy, translated by Harindranath Chattopadhyay. Book Forum, Calcutta.
কবিতা, ৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৯।

৩

খসড়া—অমিয় চক্রবর্তী প্রণীত। ভারতী ভবন। দাম দেড় টাকা।
চতুরঙ্গ, পৌষ ১৩৪৫।

স্বপ্ন কামনা—কিরণশংকর সেনগুপ্ত।

ত্রিশঙ্কু মদন—মণীন্দ্র রায়।

পটভূমি—অনুপম গুপ্ত।
কবিতা, ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৫।
(লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল নতুন কবিতা শিরোনামে)।

৪

Look, Stranger !—By W. H. Auden (Faber & Faber).
Ascent of F 6—By Christopher Isherwood & W. H. Auden (Faber & Faber).
More Poems By A. E. Heusman (Jonathan Cape).
পরিচয়, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৩।
The Collected Poems of Hart Crane (Boriswood).
The Still Centre By Stephen Spender (Faber & Faber).
পরিচয়, ৯ম বর্ষ, ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৬।
The Complete Works of Isaac Rosenberg—Edited by D. W. Harding and Gordon Bottomley (Chatto and Windus).
পরিচয়, ৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৪।
Last Poems and Plays—W. B. Yeats (Macmillan).
পরিচয়, ৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৭।

৫

On the Frontier By W. H. Auden and Christopher Isherwood (Faber).
The Trial of A Judge, A Tragic Statement By Stephen Spender (Faber).
পরিচয়, ৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৫।
Family Re-union By T. S. Eliot (Faber & Faber).
পরিচয়, ৯ম বর্ষ, ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৬।
The Well of the People By Bharati Sarabhai (Visva-Bharati).
কবিতা, ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫০।

৬

A Date with A Dutches By Arthur Calder-Marshall (Jonathan Cape).

পরিচয়, ৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৪৪ ।

Joseph in Egypt—Thomas Mann (Martin Secker).

পরিচয়, ৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৫ ।

কালো হাওয়া—বুদ্ধদেব বসু । ডি. এম. লাইব্রেরি । মূল্য তিনটাকা ।

চতুরঙ্গ, চৈত্র ১৩৪৯ ।

৭

Polite Essays By Ezra Pound (Faber & Faber).

পরিচয়, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ ।

Forward from Liberalism By Stephen Spender (Gollanz).

পরিচয়, ৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৪ ।

Studies in A Dying Culture By Christopher Caudwell (Bodley Head).

পরিচয়, ৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৬ ।

স্বগত—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত । ভারতী ভবন । দাম ২৷৷০ ।

কবিতা, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৬ ।

(নতুন বই শিরোনামে বেরিয়েছিল এই লেখাটি) ।

৮

Rabindranath through Western Eyes By Dr. Aronson (Kitabistan).

কবিতা, ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫০ ।

৯

মস্কোর চিঠি—শুভময় ঘোষ ।

আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবার, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৫৭ (পুস্তক-পরিচয়) ।

'মস্কোর চিঠি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫০ সালে—এতে ছিল মোট আঠারোটি রচনা, অক্টোবর ১৯৫৭ থেকে ডিসেম্বর ১৯৬২ পর্যন্ত এই লেখাগুলির বেশিরভাগই বেরিয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়, দু-তিনটি ছাপা হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকা আর বিশ্বভারতী পত্রিকায় ।

সমর সেনের এই আলোচনাতে যে গ্রন্থ-সমালোচনার থেকেও বড়ো হয়ে উঠেছে একটি ব্যক্তিগত অনুভব, তার কারণ তাঁর নিজের ভাষাতেই "...মস্কো যাই চাকরি নিয়ে ।...বেশ দূরে বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় থাকতেন ননী ভৌমিক,

ফল্গু কর ও শুভময় ঘোষ (ভুলু, শান্তিদেব ঘোষের ছোটো ভাই, ১৯৩৭-তে দেশে ফিরে মাসখানেকের মধ্যে মারা যান। ভুলুর মতো তরুণ কম দেখেছি —তাঁর অকালমৃত্যু আমাদের পারিবারিক ট্রাজেডির মতো।" —বাবু বৃত্তান্ত।

8

Adolescent Poems

এই অনুবাদগুলির প্রথম ছটি প্রকাশিত হয়েছিল দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত Modern Bengali Poems (The Signet Press, Calcutta. First Edition—December 1945) এ, সঙ্গে ছিল 'গ্রহণ' কাব্যের 'একটি বুদ্ধিজীবী' কবিতার মার্টিন কার্কম্যান-কৃত অনুবাদ। সমর সেনের কবিতার এই অনুবাদগুচ্ছের নাম ছিল 'Adolescent Poems', দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যা-য়ের কথায় জানা যায় এ-নামকরণ সমর সেনেরই। বাকি দুটি অনুবাদ ঐ-গুচ্ছে ছিল না, এখানে তাদের একই পর্বনামের অধীনে রাখা হলো, সময় ও বিষয়গত ঐক্যের কথা ভেবেই।

An Evening Air—'কয়েকটি কবিতা'-র 'একটি রাত্রের সুর' কবিতার অনুবাদ। কবিতাটি 'সমর সেনের কবিতা'র '১৯৩৪-১৯৩৭' পর্বের অন্তর্গত। মূল কবিতাব চব্বিশটি পঙ্‌ক্তি এখানে গুটিয়ে আনা হয়েছে চোদ্দটি দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিতে।

The March of Time—'কয়েকটি কবিতা'-র 'ঝড়' কবিতার একটি অংশ 'একটি প্রেমের কবিতা'-র অনুবাদ। এ-কবিতাটি 'সমর সেনের কবিতা'-য় '১৯৩৪-১৯৩৭'-পর্বে স্বতন্ত্র শিরোনাম-বর্জিত হয়ে 'ঝড়' কবিতার দ্বিতীয়-অংশরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মূল কবিতার সাতটি পঙ্‌ক্তি এখানে অনূদিত হয়েছে পাঁচটি পঙ্‌ক্তিতে।

Spring—'গ্রহণ' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষশেষ' গুচ্ছের অন্তর্গত 'বসন্ত' কবিতার অনুবাদ। কবিতাটি 'সমর সেনের কবিতা'-র প্রথম চারটি সংস্করণে '১৯৩৭-১৯৪০' পর্বে অন্তর্ভুক্ত হলেও পরবর্তী সংস্করণদুটিতে বর্জিত হয়েছে। মূল কবিতার পাঁচটি পঙ্‌ক্তি এখানে তিনটি দীর্ঘায়িত পঙ্‌ক্তিতে রূপান্তরিত।

The Last Ditch—'গ্রহণ' কাব্যগ্রন্থের 'গ্রহণ'-গুচ্ছের অন্তর্গত 'কানাকড়ি' কবিতার অনুবাদ। কবিতাটি 'সমর সেনের কবিতা'-র প্রথম চারটি সংস্করণে '১৯৩৭-১৯৪০' পর্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বর্জিত হয়। মূল কবিতার পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা ও স্তবক-বিন্যাস এখানে বজায় রাখা হয়েছে।

The Land of Mohuas—এ-কবিতাটি 'কয়েকটি কবিতা'-র 'মহুয়ার দেশ'

কবিতার অনুবাদ। 'সমর সেনের কবিতা'-তে এটি '১৯৩৪-১৯৩৭' পর্বের অন্তর্গত। এই কবিতার সমর সেন-কৃত ইংরেজি অনুবাদেরই দুটি ভিন্ন-পাঠ পাওয়া যাচ্ছে, ভিন্নতা শুধু অনুবাদের ভঙ্গিতে বা শব্দচয়নে নয়, পঙ্‌ক্তি-সজ্জাতেও। বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'Modern Bengal Poems'-এ মুদ্রিত পাঠ। দ্বিতীয় পাঠটি পাওয়া গেছে অনুষ্টুপ পত্রিকার 'সমব সেন বিশেষ সংখ্যা'য়। 'Modern Bengali Poems'-এ কবিতাটি টানা গদ্যে অনূদিত, মূল কবিতার দুটি অংশেব বিভাগও সেখানে অনুপস্থিত—অনুষ্টুপ পত্রিকার পাঠে মূল কবিতাব পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা ও দুটি অংশ বজায় রাখা হয়েছে, যদিও স্বাভাবিক ভাবেই অনুবাদ পঙ্‌ক্তি ধবে করা হয় নি। কিন্তু অনুষ্টুপ পত্রিকায় এই ভিন্ন পাঠটির কোনো উৎস-নির্দেশ কবা হয় নি। এখানে ঐ পাঠটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হলো—

The Land of Mahuas

1

Sometimes the indolent sun
Paints on evening waters
Columns of light, bright as molten gold,
And fire spreads through the darkening foam.
The writhing breath of smoke
Hovers round that luminous stillness
Like a winter nightmare.

Far, far from here is the cloud-cool land of mahuas.
There the tall deodars
Shed all the time their mysteries on the roads.
The breath of the distant sea
Stirs the loneliness of the nights.
I wish the mahuas would fall on my weariness,
And their smell cover me.

2

Here in the deep, intolerable darkness
At times I hear

The ponderous sound of coal-mines.
Green and dew-wet is the morning
When I see
The disgrace of dust on the tired
Bodies of men.
What dim nightmare haunts their slepless eyes ?

New Year Resolution—'নানাকথা' কাব্যের 'নববর্ষের প্রস্তাব' কবিতার অনুবাদ। কবিতাটি 'সমর সেনের কবিতা'-য় '১৯৪০-১৯৪২' পর্বের অন্তর্গত।

মূল কবিতায় ছিল চারটি অংশ, অনুবাদে সেই বিভাগ মানা হয় নি। পঙ্‌ক্তিগুলিও গদ্যের মতো টানা সাজানো; দু-একটি জায়গায় মূল কবিতা থেকে ঈষৎ সরে যাওয়া হয়েছে অনুবাদে, এ-ছাড়া কবিতার দ্বিতীয়-অংশের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি অনুবাদে বাদ পড়েছে।

January 1937—এটি 'কয়েকটি কবিতা'র '১৯৩৭' শীর্ষক কবিতাগুচ্ছের প্রথম কবিতা '১৯৩৭'-এর অনুবাদ। এ-কবিতাটি 'সমর সেনের কবিতা'য় অন্তর্ভুক্ত হয় নি। মূল কবিতার এগারোটি পঙ্‌ক্তি অনুবাদে বারোটি পঙ্‌ক্তি হয়েছে।

এ-কবিতাটি পাওয়া গেছে পুলক চন্দ সম্পাদিত অনুষ্টুপ 'সমর সেন বিশেষ সংখ্যা'য়। ঐ-সংখ্যাতেই চিঠিপত্র বিভাগের প্রাসঙ্গিক নিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, বুদ্ধদেব বসুকে লেখা সমর সেনের ২৭ সংখ্যক চিঠির শেষে 'সঙ্গে আরেকটি অনুবাদ পাঠাচ্ছি' লাইনটি এই অনুবাদটির সম্পর্কেই লেখা; চিঠির পরে এই অনুবাদটি ছিল—এ-তথ্যও জানানো হয়েছে ঐ-চিঠিটির শেষে।

No Escape—'গ্রহণ' কাব্যের 'গ্রহণ' পর্বান্তর্গত 'পলাতক' কবিতার অনুবাদ। এটি 'সমর সেনের কবিতা'য় '১৯৩৭-১৯৪০' পর্বের অন্তর্গত। মূল কবিতার পনেরোটি পঙ্‌ক্তি অনুবাদে দাঁড়িয়েছে সতেরো পঙ্‌ক্তিতে, দুটি সম্পূর্ণ নতুন পঙ্‌ক্তি এসেছে অনুবাদে—Write my name on the waters (৮ম পঙ্‌ক্তি) ও Dusk falls, (১১শ পঙ্‌ক্তি)। এ-ছাড়া কোনো-কোনো পঙ্‌ক্তি বদলেও গেছে অনুবাদে।

কবিতা পত্রিকার ১৭ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৬০) প্রকাশিত হয়েছিল এই অনুবাদটি, এই সংখ্যাটিতে আধুনিক বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন দশজন কবি। সমর সেনের আরো দুটি কবিতা ছাপা হয়েছিল, সে-দুটির অনুবাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু।

সমর সেনের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ-প্রসঙ্গে আরেকটি ব্যাপার পাঠকদের কৌতূহল জাগাতে পারে। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬-এ লণ্ডনের Times Literary

Supplement-এ বেরিয়েছিল এডোয়ার্ড টমসনের অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ "A Land made for Poetry : New India's hopes and fears". এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকা ও সেই সূত্রে উল্লিখিত হয়েছিল সমর সেনের নাম। সেখানে ছিল ইংরেজি অনুবাদে Amor stands upon you (তুমি যেখানেই যাও)-এর সম্পূর্ণ অনুবাদ এবং 'মুক্তি' কবিতার প্রথম স্তবকের অনুবাদ। আবার বুদ্ধদেব বসুকে লেখা ৮ অক্টোবর ১৯৪২-এর চিঠিতে সমর সেন লিখছেন TLS-এর উল্লেখ করে "ওতে···'মুক্তি' নামের কবিতাটির প্রথম stanza-র অনুবাদ ছিল। 'মুক্তি'-র শেষ কয়েকটা লাইন অনুবাদ করে পাঠাচ্ছি। আপনার কাছে 'টাইম্‌স' থাকলে জুড়ে দিতে পারেন। নামটা ইংরেজিতে Escapist করেছি।" কৌতূহল জাগে TLS-এ প্রকাশিত অনুবাদটি কার করা, টমসন না সমর সেনের! একটি কবিতার দুটি স্তবক দু-জনের অনুবাদ, এবং তাই সমর সেন প্রকাশের জন্য বিবেচনা করতে বলছেন! এ-সংশয়ের নিরসন করা সম্ভব নয়। শুধ্‌ পাঠকের কৌতূহলকে একটু উস্‌কে দেওয়ার অভিপ্রায়েই এখানে টমসনের প্রবন্ধে উদ্ধৃত 'মুক্তি' কবিতার প্রথম স্তবক ও সমর সেনের চিঠির সঙ্গে লেখা দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদ পরপর সাজিয়ে দেওয়া হলো ; প্রসঙ্গত 'মুক্তি' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যাতেই (আশ্বিন ১৩৪২), পরে এটি 'কয়েকটি কবিতা'-র অন্তর্গত হয়, 'সমর সেনের কবিতা'-য় এই কবিতাটি '১৯৩৪-১৯৩৭' পর্বের অন্তর্গত।

Escapist

The Dark came like a beast of prey. The burning sky of the west reddened like and olender blossom. That darkness brought to the earth the scent of *Ketaki* flowers, and to the eyes of some the langurous dreams of night. That darkness lit the trembling flame of desire in a girl's soft body.

How can this darkness, wild with the scent of *Ketaki* flowers, touch me ? Like an island, I am distant and withdrawn in my own darkness, I have in me the peace of the grey silence of the rocks.

এডওয়ার্ড টমসনের প্রবন্ধ এবং সমর সেনের চিঠি দুটিই আছে অনুষ্টুপ 'সমর সেন বিশেষ সংখ্যায়'।

Review and Articles

Bengali Poems : Dhusar Pandulipi—জীবনানন্দ দাশের ধূসর পাণ্ডুলিপি কাব্যগ্রন্থের এই সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল The Sunday Amritabajar Patrika, July 4, 1937 সংখ্যায়, Books and Reviews বিভাগে। পুরো নামের বদলে লেখকের স্বাক্ষর ছিল S. S.। আলোচিত গ্রন্থের বিবরণ ছিল এইভাবে, উপরে Bengali Poems শিরোনাম, নিচে—

Dhusar Pandulipi (Bengali Poems) By Jibanananda Das, Published by D. M. Library, 49 Cornwallis Street, Price Rs. 2.

In Defence of the Decadants—১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় আশুতোষ কলেজ হলে নিখিল ভারত প্রগতি-লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্মেলন হয়েছিল—ঐ সম্মেলনে সমর সেন এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন। পরের বৎসর, ১৯৩৯-এ Indian Progressive Writers' Assoiation বা প্রগতি-লেখক সঙ্ঘের ইংরেজি মুখপত্র New Indian Literature-এর দ্বিতীয় সংকলনে লেখাটি মুদ্রিত হয়।

দীর্ঘকাল পর লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হয় অনুষ্টুপ 'সমর সেন বিশেষ সংখ্যা'য়—এখানে লেখাটি ছাপা হলো অনুষ্টুপের পাঠ-অনুসরণে।

Alien Corn—এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল The Statesman Puja Magazine, Sunday, September 30, 1951 সংখ্যায়। প্রবন্ধে লেখকের স্বাক্ষর ছিল S. S. লেখার শিরোনামের পর ডানদিকে বক্স করে লেখা ছিল "S. S. the author of this article finds the Muse in a sorry state in Bengal today."

পরিশিষ্ট ১

টুকরো কবিতাগান : অন্যভাষা থেকে—এই অংশের টুকরো লেখাগুলি সংগৃহীত হয়েছে নিম্নলিখিত বইগুলি থেকে—

কসাক। লেভ তলস্তয়। বিদেশি ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো।
বড়ো ও ছোটো গল্প। লেভ তলস্তয়। বিদেশি ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো।
ছায়াবীথি। ইভান বুনিন। প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।
অন্ধ সুরকার। ভ্লাদিমির করলেঙ্কো। বিদেশি ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো।
বুড়ো। মাক্সিম গোর্কি। বিদেশি ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো।
মরস্থমি লোক। মাক্সিম গোর্কি। বিদেশি ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো।
আএলিতা। আলেক্সেই তলস্তয়। বিদেশি ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো।
হরবোলা ২। মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত।
মানুষের মতো মানুষ। বরিস পলেভয়। রাদুগা প্রকাশন, তাশখন্দ।

আলেক্সেই তলস্তয়ের কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী আএলিতা থেকে নেওয়া গান দুটিতে (৩৪ ও ৩৫ সংখ্যক) উল্লিখিত 'চা' হলো মঙ্গলগ্রহের উপকথার 'অশুভ শক্তি বা দেবতা। তালৎসেৎল পৃথিবী, আর খাভ রা হলো পূত ধূপ, সর্বোচ্চ পরিষদের অনুমতি ছাড়া যার ঘ্রাণ নেওয়া নিষেধ।

পরিশিষ্ট ২

প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ—সমর সেন ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের যুগ্ম-রচনা এই সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল কবিতা, ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা (কার্তিক ১৩৪৭)-এর বিশেষ সংখ্যায়।

সমালোচনাটির প্রথম পাতার নিচে রুল দিয়ে পাদটীকায় লেখা ছিল—সম্রাট: প্রেমেন্দ্র মিত্র। ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৷৹। রচনার শেষে লেখকদের নাম ছিল; এখানে সে-ভাবেই ছাপা হলো লেখাটি।

পরিশিষ্ট ৩

অতি-আধুনিক বাংলা কবিতা—সরোজ দত্তর এই নিবন্ধটি যদিও সমর সেনের 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা'-র সমালোচনা হিশেবে লিখিত, এখানে 'In Defenece of the Decadants'-এর প্রসঙ্গও এসেছে। লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল অগ্রণী, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৪০-এ।

রচনাটির প্রথম অনুচ্ছেদ-এর (…রোমান্টিক হইবার ভয়ে ঐ-নির্দেশ বা ফরমাইস তাঁহারা পালন করিতে পরিতেছেন না।) পরই ছিল—

অতএব, গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা, সমর সেন, কবিতা ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ কলিকাতা, ১৩৪৬।

পররর্তীকালে পুনর্মুদ্রিত এই রচনাটি পড়ে সমর সেনের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন বর্তমানে সংকলনে ধৃত 'উড়ো খৈ' প্রবন্ধে ; কিন্তু সে-সময়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া কী ছিল তা জানা যাবে অনুষ্টুপ 'সমর সেন বিশেষ সংখ্যা'য় প্রকাশিত তাঁর একটি চিঠি থেকে। ১৬ মে ১৯৪০-এ বুদ্ধদেব বসুকে লেখা এই চিঠিতে সমর সেন বলেছেন "…'অগ্রণী'তে আমার প্রবন্ধ এবং কবিতা সম্বন্ধে একটি বিরাট বামপন্থী সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে 'নির্বোধ' 'প্রবঞ্চক' ইত্যাদি বামপন্থী বিশেষণ সমালোচক আমার সম্বন্ধে প্রয়োগ করেছেন। প্রবন্ধটি পড়লে বেশ মজা পাবেন।"

এ-লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হয় ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (৩য় খণ্ড) গ্রন্থে। এখানে ঐ-বই থেকেই লেখাটি নেওয়া হয়েছে।